প্রাচী পর্ব

# রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ.স

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭০০০৭৩

RAMYANI BEEKSHYA
Prachee Parva
*(A Bengali Travelogue)*
By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার,
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৬৭

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীসুধীর মৈত্র

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথনাথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

## উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী

শ্রদ্ধাস্পদাসু

বহু দিনের অনাদৃত এই প্রাচী অঞ্চলে নূতন প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যে প্রতি দিন উন্নতি হচ্ছে। আজকের দেখার সঙ্গে আগামী কালের দেখা হয়তো মিলবে না, কিন্তু দর্শনীয় স্থান ও বক্তব্য বিষয়ের বেশি পরিবর্তন কোন দিনই হবে না। এই গ্রন্থে বর্ণিত ভ্রমণের সময় ১৯২৮ সালের ১১ই থেকে ২৮শে নভেম্বর এবং গ্রন্থের রচনাকাল ১৯২৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৯ই মে।

রম্যাণি
বি. এফ. ৭৭, সল্টলেক সিটি
কলিকাতা-৭০০০৬৪

গ্রন্থকার

অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥

—ঋগ্‌বেদ, ৭.৮৯.৪

আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু
তৃষায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও
হৃদয় সুধায় ভরি॥

—রবীন্দ্রনাথ
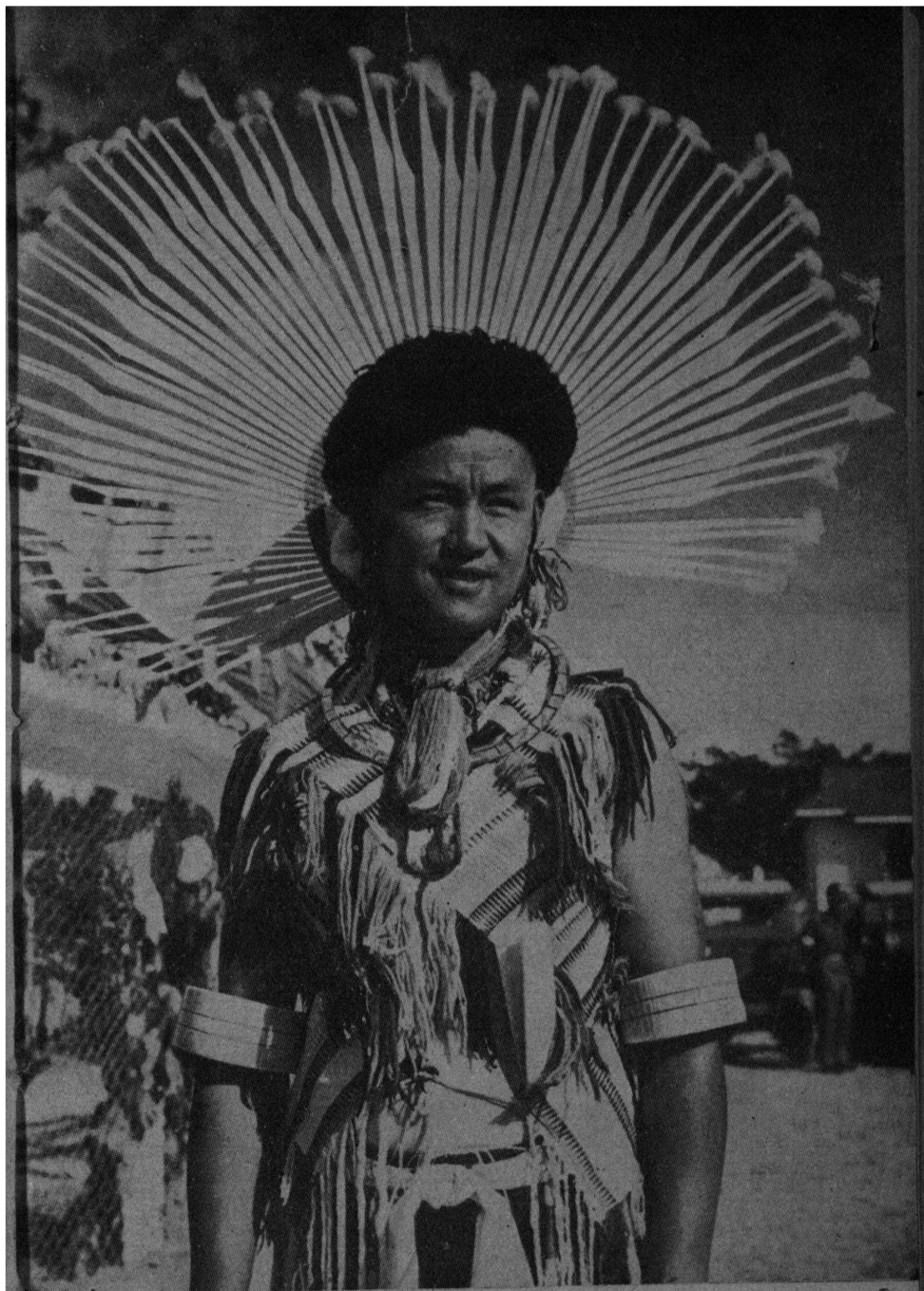
সুসজ্জিত নাগা পুরুষ ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র

( উপরে ) ডিমাপুরে কাছাড় রাজধানীর ভগ্নাবশেষ

( নিচে ) নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমা শহর ফটো—
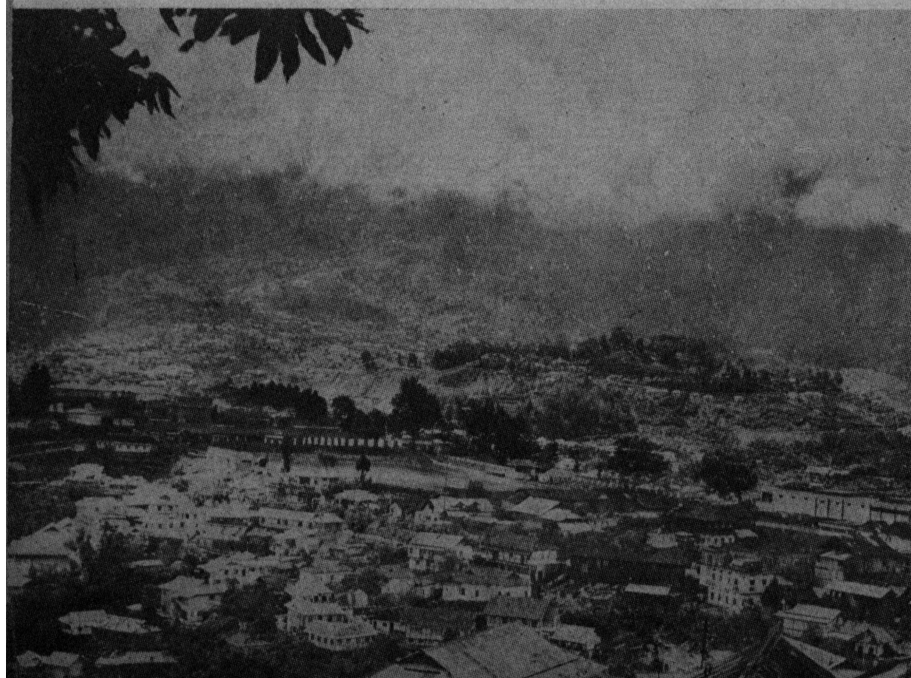
( উপরে ও নিচে ) নাগানৃত্য

ফটো—ডঃ শীতাংশু মিত্র

( উপরে ) নাগা যুবক যুবতী ফটো—ড

( নিচে ) মনিপুরের রাজধানী ইম্ফলে মেয়েদের বাজার
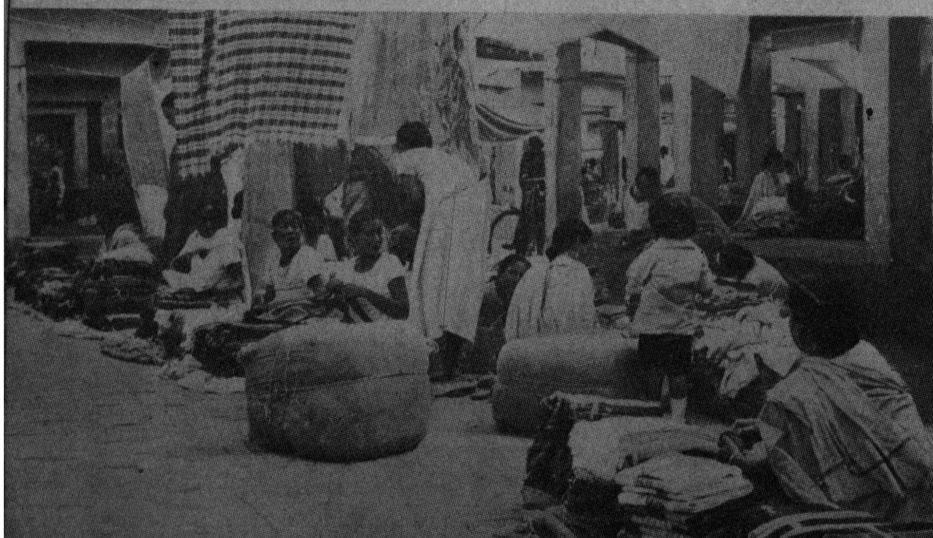
( উপরে ) মনিপুর রাজ্যের লোগতাক লেক
( নিচে ) মৈরাঙে নেতাজী মেমোরিয়াল

( উপরে ) মিজোরামের রাজধানী আইজলের রাজপথে

( নিচে ) মিজো নৃত্য [ আসাম সরকারের সৌজন্যে ]

( উপরে ) ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ
( নিচে ) ত্রিপুরা রাজ্যের সিপাহী জলায় নৌকাবিহার

## ১

মানুষ এখন চাঁদে যাতায়াত করছে। অদূর ভবিষ্যতে যে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে পারবে, তাতে আর সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারবে বলে বিশ্বাস হচ্ছে। কিন্তু নিজের জীবনটা কি সে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে? বৈজ্ঞানিকরা সে চেষ্টা করছেন, না করতে পারবেন না বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন?

কেন জানি না আমার মনে হয় যে সৃষ্টির সবচেয়ে বড় রহস্য হল মানুষের জীবন। মানুষ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের জীবনটা কখনও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। সে যা চায় তা হয় না, আর যা হয় তা হয়তো সে কোন দিন ভাবতেও পারে নি। আমার জীবনটা যে এ রকম হবে, তা কি আমি কখনও ভাবতে পেরেছিলুম! তাই আমি এক অদৃশ্য শক্তিকে মেনে নিয়েছি, তার নাম বিধাতা। আমি বিশ্বাস করি যে বিধাতা নামের সেই অদৃশ্য শক্তি আমার জীবনটা পরিচালনা করছেন। আমি যেন একটি পুতুল, আর আমার বিধাতা সরু সুতো দিয়ে আমাকে নাচাচ্ছেন। আমি স্বাধীন বলে যতই চেঁচামেচি করি না কেন, নিজের জীবনটা নিয়ন্ত্রণের অধিকার আমার হাতে নেই। আগে থেকে তিনি সব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন কিনা এখন শুধু সেই কথাই ভাবি। স্বামী বিবেকানন্দকে আমি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তাঁর মতো বিশ্বাস করতে পারি না যে আমি নিজেই আমার ভাগ্যনিয়ন্তা।

পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। বেশি দিনের পুরনো কথা তো নয়! কিছুই এখনও ভুলি নি। এত তাড়াতাড়ি কোন কথা

ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। জীবনের অনেকগুলো বছর বৈচিত্র্যহীন ভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ যেন একটা ঝড় উঠেছিল। তাতে সবই যেন ওলটপালট হয়ে গেল। এই তো বছর কয়েক আগে পূজোর ছুটিতে বেরিয়ে পড়েছিলুম দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে। আগে থেকে কিছুই তো ঠিক ছিল না। একেবারেই আকস্মিক ভাবে আমার বিধাতা আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন ভাগ্যের খেলায়। অন্ধ্র তামিলনাড়ু কেরালা ও কর্ণাটক রাজ্য দেখে ফিরে এলুম। সেই বছরই বসন্ত কালে আমাকে দিল্লী যেতে হয়েছিল। আর পূজোর সময়ে বেরোতে হয়েছিল পশ্চিম -ভারতে। রাজস্থান সৌরাষ্ট্র কোঙ্কণ উপকূল ও প্রাচীন অবন্তী অঞ্চল দেখে কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম। তারপর কলকাতায় স্বাতির বিয়ে হচ্ছে শুনে পালিয়ে গিয়েছিলুম উৎকলের পুরীতে। ভেবেছিলুম, কারও সঙ্গে কোন দুর্বলতার সম্পর্ক রাখব না। তাই একা বেরিয়েছিলুম মগধ ও কোশল ভ্রমণে। কিন্তু একা ভ্রমণ যে আমার কপালে লেখা ছিল না, তা কি সেদিন জানতুম! আমার বিধাতাই তো আবার আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন হিমাচল থেকে কাশ্মীরে। সে দিনও জানতুম না যে আমার উত্তরপাড়ার পাট উঠে যাবে, আর বিবাদী বাগের পুরনো কাঠের চেয়ারখানির মায়া আমাকে ত্যাগ করতে হবে। দিল্লী থেকেই চলে যেতে হল কামরূপে। সেখান থেকে গৌড় হয়ে ভাগীরথীর তীরে কলকাতায় ফিরে এলুম। তারপর আবার বেরোতে হয়েছিল। একবার হিমালয়ের টানে, আর একবার মরুভারতের মরীচিকার হাতছানিতে। ফিরে এসেই আমার বিধাতার কাছে হাতজোড় করে প্রার্থনা করেছিলুম, আর নয়, এবারে রেহাই দাও আমাকে, কিছুদিন স্থির হয়ে নতুন জীবনটা উপভোগ করতে দাও। কিন্তু আমার অন্তর্যামী বিধাতা যে এ কথা শুনেও হেসেছিলেন তা বুঝতে পারি নি।

মানুষের জীবনটাই এই রকম। সে যা চায় তা হয় না, আর যা হয় তা হয়তো অনেক সময়েই চায় না। কিন্তু আমি যা চেয়েছিলুম,

তা হয় নি বলে আমি একটুও মর্মাহত হই নি, বরং খুশী হয়েছিলুম অপরিমিত।

স্বাতি বলেছিল : এবারের পূজো কি আমরা ঘরে বসে কাটাব ?

আমি বলেছিলুম : কলকাতার পুজো আমরা অনেক দিন দেখিনি।

স্বাতি মেনে নিয়েছিল আমার কথা, আর পূজোর ছুটিতে বেরোবার কথাটা বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় আজকাল দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। শুধু মাটি দিয়ে নয়, নানা দ্রব্যে নির্মিত হয় প্রতিমা। সংবাদপত্রে ছবি বেরোয়, টেলিভিশনে ছবি দেখা যায়, ঠাকুর দেখবার জন্যে কলকাতাবাসীর পাগলামির কথাও শোনা যায়। দিনের বেলায় আলোর মালায় সাজানো হয় না বলে সন্ধ্যের সময় এমন ভিড় হয় যে সেই ভিড় এড়াবার জন্যে উৎসাহীরা দলে দলে বেরোয় রাতে। সারারাত ধরে ঠাকুর দেখে—উত্তর থেকে দক্ষিণে, কিংবা দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কটা ঠাকুর দেখেছি, এই নিয়েও প্রতিযোগিতা। গত কয়েক বছরে এই সব আরও বেড়েছে বলে শুনেছি, কিন্তু নিজের চোখে দেখা হয়নি। এইবারে তা দেখতে পাব বলে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

কিন্তু বিধাতা যে আবার হাসলেন তা বুঝতে পারি নি। দিন-কয়েক পরেই পরিচয় হল আছোবি সিং নামে মণিপুরের এক শিক্ষা-বিদের সঙ্গে। তাঁর কলেজের কাজে তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন, ফেরার পথে কলকাতায় কাটিয়েছিলেন কয়েক দিন। সেই সময়েই আকস্মিক ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। এক ঘরোয়া বৈঠকে মণিপুর সম্বন্ধে তিনি কিছু বললেন। সেইখানেই পরিচয়। ভারতের নানা স্থানে আমি গিয়েছি শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, মণিপুরে যান নি ?

বললুম : না, সে সুযোগ এখনও আসে নি।

যিনি বৈঠক ডেকেছিলেন তিনি বললেন : কামরূপেই কি ভারতের পূর্বাঞ্চলের কথা শেষ হয়ে যাবে ? অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড

মণিপুর মিজোরাম মেঘালয় ত্রিপুরা—এসব রাজ্যের কথা কি লিখবেন না?

সরাসরি না বলতে পারলুম না। তাই বললুম: বড় কঠিন কাজ।

আছৌবি সিং বললেন: মণিপুর যাত্রা একটুও কঠিন নয়। কলকাতা থেকে কামরূপ এক্সপ্রেসে উঠে বসবেন, নামবেন ডিমাপুরে। ডিমাপুর থেকে মণিপুর স্টেটের বাস এক দিনেই আপনাকে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে পৌঁছে দেবে।

আমার বন্ধু বললেন: কিন্তু আমরা যে অরুণাচল ও নাগাল্যাণ্ডের কথাও জানতে চাই!

আছৌবি সিং আমার দিকে চেয়ে বললেন: তাহলে আপনাকে পথে নামতে হবে। প্রথমে রঙ্গিয়া জংশনে নেমে তেজপুর ও নর্থ লখিমপুরের দিকে যেতে হবে। অরুণাচলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আদিবাসী জীবন আকর্ষণীয় বলে শুনেছি। কিন্তু তার রাজধানী ইটানগর নাকি এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। আর নাগাল্যাণ্ড তো মণিপুরের পথেই। নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমার ওপর দিয়েই আপনাকে ইম্ফলে পৌঁছতে হবে। ইচ্ছে করলে কোহিমায় দু-একদিন থেকে আপনি ইম্ফলে আসতে পারেন। কিন্তু সে ইচ্ছে থাকলে মণিপুরের বাসে না উঠে নাগাল্যাণ্ড স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে উঠবেন।

আমি কিছু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলুম: কেন বলুন তো!

আছৌবি সিং বললেন: মণিপুরের বাস কোহিমার বাস স্ট্যাণ্ডে আসে না, শহরের একটা প্রান্ত ছুঁয়ে ইম্ফলের পথ ধরে।

হেসে বললেন: হয়তো ভাবছেন, তাতে ক্ষতি কী। ক্ষতি নয়, প্রচণ্ড অসুবিধে। পাঁচ মাইল লম্বা শহর কোহিমা, অথচ কোন যানবাহন নেই। মালপত্র বইবার জন্যে সেখানে কোন কুলিও পাবেন না।

মণিপুরের শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে অনেক কথা হল। কিন্তু সে পরের কথা। আমাকে মণিপুর যাত্রায় প্রলুব্ধ করবার জন্যে আছোবি সিং বললেন: আপনারা আসুন, আপনাদের আমি আরও অনেক কথা বলব। মহাভারতের যুগের মণিপুর, এর অবস্থান নিয়ে তো কোন বিতর্ক নেই। নাগরাজ্যও মহাভারতের যুগের। কিন্তু এর অবস্থান নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে।

কী রকম?

বলে আমার বন্ধু তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

আছোবি সিং বললেন: কাশ্মীরকেও অনেকে নাগরাজ্য বলে থাকেন। বনবাসী অর্জুন যখন গঙ্গায় স্নান করছিলেন, তখন নাগ-কন্যা উলূপী তাঁকে আকর্ষণ করে পাতালে নাগভবনে নিয়ে যান। আবার এও দেখা যায় যে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের ঘোড়া মণিপুরে এসে পৌঁছলে মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন উলূপীর প্ররোচনাতেই সেই যজ্ঞাশ্ব হরণ করেন। তারপর বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন অচেতন হলে উলূপীই নাগলোক থেকে সঞ্জীবন মণি এনে অর্জুনের প্রাণরক্ষা করেন। মহাভারতের এই সব কাহিনী দেখে কেউ মনে করেন যে নাগরাজ্য ছিল গঙ্গার নিকটে হিমালয়ের কোন অঞ্চলে, আবার কেউ নাগাল্যাণ্ডকেই প্রাচীন নাগরাজ্য বলে মেনে নেন।

আমি বললুম: পণ্ডিতেরা কী বলেন?

আছোবি সিং হেসে বললেন: পণ্ডিতেরা এ সব কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন বলে মনে হয় না।

আমার বন্ধু বললেন: বেশ কৌতূহলের বিষয় বলে মনে হচ্ছে।

আর উৎসাহ পেয়ে আছোবি সিং বললেন: তাহলে আপনারা এক সঙ্গেই আসুন না।

এই প্রসঙ্গের এখানেই ইতি হবে বলে আমি ভেবেছিলুম। কিন্তু তা হল না। বাড়ি ফিরে একখানা চিঠি পেলুম—কলকাতার এক পাঠকের চিঠি। তাঁর নাম প্রকাশ করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু বাধা উপস্থিত হল একটা। এ রকম চিঠি আমি আগেও পেয়েছিলুম, কিন্তু তার গুরুত্ব দিই নি বলে একটা মামুলি ধরনের জবাব দিয়ে সে কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তাঁদের নাম মনে ছিল না। প্রসঙ্গটা একই—আমার কামরূপ পর্ব অসম্পূর্ণ, ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে নূতন জীবন এখন স্পন্দিত হচ্ছে তার পুরো পরিচয় এই পর্বে নেই। এই অঞ্চলের কথা অনুপস্থিত থাকার জন্য তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে। ভ্রমণ বিলাসীরা আর একখানি গ্রন্থের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন।

স্বাতি বলল: যোগাযোগটা একটু আশ্চর্য রকমের।

সত্যিই আশ্চর্য রকমের। মনটাকে আজ নাড়া দিয়েছে বেশ জোরে, আগের মতো ঝেড়ে ফেলতে পারছি না।

স্বাতি বলল: তোমার কামরূপ ভ্রমণের সময়ে আমি সঙ্গে ছিলাম না। ও দিকটা আমারও ভাল দেখা নেই।

বললুম: ওকে ভ্রমণ বোলো না, চাকরি করতে গিয়ে যা দেখেছি, তাই লিখেছি। অনেক কথাই অসম্পূর্ণ।

সত্যিই অসম্পূর্ণ। অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড মণিপুর মিজোরাম—এ সব জায়গায় তো যাই নি। আছে শুধু আসামের কিছু জায়গা আর মেঘালয়ের শিলঙের কথা। কিন্তু এই নিয়েই তো ভারতের পূর্বাঞ্চল নয়। যা দেখা হয় নি, তাই এখন রোমাঞ্চকর বলে মনে হতে লাগল।

স্বাতি বলল: এখন না হলেও একদিন তোমাকে এই অঞ্চলের কথাও লিখতে হবে।

একটু ভেবে বলল: প্রাচী নামটা তোমার কেমন লাগে?

বললুম: মন্দ না।

প্রাচী মানে তো পূর্ব দিক। তাই না? প্রাচী পর্বে থাকবে পূর্ব দিকের কথা। কামরূপেরও পূর্বে যে সব নতুন রাজ্য হয়েছে, তাদের কথা।

হেসে বললুম: এবারে তুমি লেখো।

কেন?

রম্যাণি বীক্ষ্য এবারে ফুরোনো দরকার। তা না হলে পাঠকেরাই মুড়িয়ে দেবে।

আজকের চিঠিখানা হাতে নিয়ে স্বাতি বলল: এই রকম পাঠক একজন থাকলেও তোমার নটে গাছটি মুড়োতে দেবে না।

বললুম: সেই আশাতেই তো লিখে যাচ্ছি।

রাতে আমরা পুরনো টাইম টেবল বার করে ইটিনেরারি তৈরি করতে বসে গেলুম। টাইম টেবলে সময়ের পরিবর্তন বড় একটা হয় না। যাত্রার আগে নতুন টাইম টেবল কিনে নিলেই চলবে।

স্বাতি বলল: অরুণাচলের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি। কাজেই এ যাত্রায় অরুণাচলের খবর সংগ্রহ করে আনতে হবে।

একটু ছুঁয়ে গেলে মন্দ হত না।

কী করে ছুঁয়ে যাবে?

বললুম: টুরিস্ট অফিসে কি কোন খবরই পাব না! ইটানগরে একটা চিঠি লিখলেও হয়তো উত্তর পেয়ে যাব।

স্বাতি বলল: তাহলে গৌহাটিতে আমাদের দুদিন বিরতি থাক। হয় ইটানগর, নয় কামাখ্যা আর শিলঙ। ছেলেবেলায় দেখেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখলে বোধ হয় ভাল লাগবে।

অল্প সময়ে আমাদের ব্যবস্থা হয়ে গেল। গৌহাটি থেকে ট্রেনে ডিমাপুর। তারপরে বাসে কোহিমা ও ইম্ফল। ইম্ফল থেকে একই পথে শিলচরে ফেরা হবে না, প্লেনে পাহাড় ডিঙোতে হবে। শিলচর থেকে বাসে আইজল, তারপর আগরতলা। দিন কুড়ি সময়

লাগবে। আর টাকা পয়সারও একটা মোটামুটি হিসেব হয়ে গেল।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম : এত পয়সা কি আমাদের—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : এই ভাবনা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও।

তারপরে ক্যালেণ্ডার দেখে এসে বলল : এবারে পনেরই অক্টোবর লক্ষ্মী-পূজো। সেই দিনই যাত্রা করা যাক।

শুভদিনে যাত্রা আমরা শুভ মনে করি, পঞ্জিকার শুভাশুভের বিচার করি না। বুঝতে পারলুম যে স্বাতি আমার কলকাতার দুর্গাপূজা দেখার শখটাও মেনে নিয়েছে।

কিন্তু এবারেও যে বিধাতা হাসলেন, তা বুঝতে পারলাম ট্রেনের টিকিট কাটবার কিছু পরে। পূজার আগেই অবিশ্রান্ত বর্ষা নামল। তিন-চার দিনের বর্ষাতেই কলকাতা শহর ডুবে গেল জলের তলায়। ডুবল পশ্চিম বঙ্গের অনেকগুলি জেলা। একশো বছরের মধ্যে নাকি এ রকম ঘটনা ঘটে নি। এ এক মর্মান্তিক ব্যাপার। বাঙলার ঘরে ঘরে হাহাকার। ঘর নেই, খাদ্য নেই, অর্থ নেই। আছে শুধু বাঁচবার চেষ্টা। এই চেষ্টার মূলধন নিয়েই মানুষ বাঁচে। বাঙালীও বাঁচবে।

জানা গেল যে রেল লাইনও ভেসে গেছে। ট্রেন চলছে না, কবে আবার চলবে তার ঠিক নেই। যাত্রীরা আগাম টিকিট ফেরত দিয়ে টাকা ফেরত নিয়ে আসছে। আমরাও টিকিট ফেরত দিয়ে এসে ভাবলুম যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

কিন্তু মনে যেন খানিকটা ক্ষোভ রয়ে গেল। নতুন দেশ দেখার জন্যে মন যে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তা বুঝতে পারলুম টাকা ফেরত আনবার পরেই। স্বাতি বলল : এখনই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না।

আমি বললুম : একটা বাধা পড়েছে যখন, তখন তা মেনে নেওয়াই উচিত।

স্বাতি বলল: এ তো সংস্কারের কথা। এ যুগেও কি আমরা সংস্কার মেনে চলব! বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা করব না!

এই অভিযোগের উত্তর আমি দিলুম না।

নিরানন্দ বাঙলায় দুর্গাপূজা হল, কিন্তু প্রতি বছরের মতো উৎসব হল না। চাঁদার টাকার একটা অংশ দেওয়া হল দুর্গতদের সাহায্যের জন্য। কেউ প্রাণের তাগিদে কেউ বা লোকলজ্জার ভয়ে অত্যন্ত সংযত ভাবে পূজার অনুষ্ঠান করলেন।

এক সময়ে ট্রেন চলাচলও শুরু হল। কিছু দিন ভিন্ন পথে চলল, তারপর নিজের পথে। কাগজে সেই সংবাদ পড়ে স্বাতি বলল: চল, বেরিয়ে পড়ি।

হেসে বললুম: চল।

আবার টিকিট কাটা হল। এবারে আর নিজেদের স্থির করা দিনে হল না। কোন দিন একখানা বার্থ আছে, কোন দিন দুখানাই উপরের বাঙ্ক। একখানা কুপে পাওয়া গেল নভেম্বরের এগার তারিখে। ভাবলুম, যাত্রা নিশ্চয়ই এই দিনেই শুভ। যাত্রার দিনটি আমাদের বিধাতাই স্থির করে দিয়েছেন।

## ২

প্রথম বারে টিকিট কাটবার পরেই বিভিন্ন রাজ্যের টুরিস্ট অফিসে চিঠি লিখেছিলুম। অরুণাচলের সংক্ষিপ্ত জবাব এল, তারা এখনও কোন টুরিস্ট লিটারেচার প্রকাশ করে নি। একে একে আসাম মেঘালয় নাগাল্যাণ্ড মণিপুর ও মিজোরামের জবাবও এল। তার সঙ্গে সচিত্র এক একটি ফোল্ডারের সঙ্গে সাইক্লোস্টাইল করা কিছু কাগজ। ত্রিপুরার কাগজপত্র এল সবার পরে, কিন্তু তাদের কোন সচিত্র ফোল্ডার নেই। এই সবে কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে ঠিকই, অপ্রয়োজনীয় কথাই বেশি। অনেক নতুন জায়গার নাম ও বর্ণনা আছে, রাজধানী শহর থেকে তাদের দূরত্বও দেওয়া আছে। কিন্তু পারস্পরিক দূরত্ব দেওয়া নেই বলে সে জায়গাগুলোর অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয় না। একখানা মানচিত্রে এ সব দেখানো থাকলে যে যাত্রীদের সুবিধা হত, তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাতি বলে: টুরিস্ট লিটারেচার প্রকাশের যে নির্দিষ্ট রীতি আছে, তাতে সাধারণ যাত্রীর সুবিধা-অসুবিধার কথা বিচারের সুযোগ নেই। ভারত সরকার তো বিদেশীদের জন্যেই এ সব প্রকাশ করে, রাজ্য সরকারগুলিও তা অনুসরণ করে অন্ধ ভাবে। যে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ ছুটি পেলেই দেশ দেখতে বেরোয়, তাদের কথা কেউ ভাবেন বলে মনে হয় না।

ভাল করে সব না জেনে শুনে কিছু মন্তব্য করা উচিত নয়। আমি তাই চুপ করেই থাকি। ভাবি যে নিজে যদি কিছু লিখি তো এই অসম্পূর্ণতা পূরণ করে দেব। কিন্তু কাজের সময়ে তা পারি না।

যে খবরটি দরকার, সেটি সংগ্রহ করাই সম্ভব হয় না স্বল্প সময়ে। কাজেই নিজের লেখাও অসম্পূর্ণ থেকে যায় অনেক স্থানে।

যাত্রার পূর্বে কিছু পড়াশোনাও করে নিলুম। ভারত স্বাধীন হবার আগে সমগ্র পূর্বাঞ্চল জুড়ে একটি প্রদেশ ছিল। তার নাম ছিল আসাম। বিরাট প্রদেশ। তখন কুচবিহার ও ত্রিপুরা এই দুটি দেশীয় রাজ্য বাঙলার সঙ্গে এবং মণিপুর আসামের সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পরে কুচবিহার হল পশ্চিম বঙ্গের একটি জেলা, কিন্তু ত্রিপুরা ও মণিপুর কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে পরিণত হল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে নাগাল্যাণ্ড ট্রানজিসনাল প্রভিসন্স রেগুলেশনে নাগাহিল-তুয়েনসাঙ অঞ্চল একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। এই তুয়েনসাঙ ফ্রন্টিয়ার ডিভিসনটি ১৯৫৭ সালের ১লা ডিসেম্বরের পূর্বে নেফা বা নর্থ-ঈস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সির অন্তর্গত ছিল। কামেং, লোহিত, সিয়াং, সুবণসিরি ও সিয়াং নামের আর পাঁচটি ফ্রন্টিয়ার ডিভিসন নেফার অন্তর্গতই থেকে যায়। সে সময়ে আসামে ছিল এগারটি জেলা। তাদের নাম কাছাড়, দরং, গারো হিল্‌স্, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, লখিমপুর, মিজো বা লুসাই হিল্‌স্, নওগাঁ, শিবসাগর, ইউনাইটেড খাসি ও জয়ন্তিয়া হিল্‌স্ এবং ইউনাইটেড নর্থ কাছাড় ও মিকির হিল্‌স্। এর পরে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের লোকসভায় পাস হল নর্থ-ঈস্টার্ণ এরিয়াস রি-অর্গানাইজেসন বিল। তারই ফলে নেফার পাঁচটি জেলা নিয়ে তার নতুন নাম হল অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজো বা লুসাই হিল্‌সের নাম মিজোরাম হল। এ দুটিই ইউনিয়ন টেরিটরি। এই আইনের বলেই মণিপুর ও ত্রিপুরা নাগাল্যাণ্ডের মতো স্বয়ং-শাসিত রাজ্যের মর্যাদা পেল। মেঘালয় নামে আরও একটি নতুন রাজ্য হল গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া হিল্‌স্ ও শিলঙ নিয়ে। ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী এই রাজ্যের জন্ম। আর এই ভাবে খণ্ডিত হবার পরে আসামে রয়ে গেল ব্রহ্মপুত্র ও বরাকনদীর উপত্যকায় নটি জেলা। মিকির হিল্‌স্ ও নর্থ কাছাড় এখন দুটি জেলা হয়েছে।

কামরূপ এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়ে সন্ধ্যে ছটা পঞ্চান্ন মিনিটে। কিন্তু বন্যায় রেল লাইনের ক্ষয়ক্ষতির জন্যে এখন বিকেল চারটেয় ছাড়ছে। আধ ঘণ্টা আগেই আমরা স্টেশনে এসে গেলুম। নিজেদের জায়গা খুঁজে নিতে সময় লাগল না। কিন্তু একজন যাত্রী ভয় দেখিয়ে বললেন: এ জায়গা নিজের কব্জায় কতক্ষণ রাখতে পারবেন জানি নে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এ তো রিজার্ভ করা জায়গা!

ভদ্রলোক বললেন: বন্যার্তরা যখন হুড়মুড় করে উঠবে তখন আর এ কথা বলতে পারবেন না।

কিন্তু বন্যার্তরা কেন হাওড়া থেকে এই গাড়িতে উঠবেন তা বলতে পারলেন না।

পরে দেখলুম যে হাওড়া থেকে যাঁরা উঠলেন তাঁরা বন্যার্ত নন, এই লাইনের দূরের স্টেশন থেকে কলকাতায় যাঁরা কাজ করতে এসেছিলেন তাঁরাই উঠেছেন এবং গাড়ির করিডরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। কী একটা গোলমালের জন্যে তাঁদের লোকাল ট্রেন চলে নি। তাই এই এক্সপ্রেসে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। কামরূপ এক্সপ্রেসই অনেক ছোট ছোট স্টেশনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যাবে। যাত্রীরা সবাই ভদ্র, কেউই আমাদের রিজার্ভ-করা জায়গা দখলের কোন চেষ্টা করলেন না। সময় মতো বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে আমরা শোবার জন্যে বিছানা পাতলুম।

আমার বিছানাটা গুছিয়ে দেবার সময় স্বাতি হেসে ফেলল। তার হাসি দেখতে পেয়ে আমি বললুম: হাসলে যে!

স্বাতি বলল: কিছু দিন আগের একটা কথা মনে পড়ছে।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বলল: তোমার মনে নেই।

কী কথা তা না বললে মনে আছে কিনা বুঝব কী করে।

ঠিক এই রকমের কোন ঘটনা মনে পড়ছে না?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে রইল।

মনে পড়ে গেল একটি ছোট ঘটনা। দার্জিলিঙ থেকে কলকাতায় ফেরার পথে স্টিমারে গঙ্গা পার হয়ে আমরা ট্রেনে উঠেছিলুম রাতে। বাঁ হাতটা আমার বাঁধা ছিল। অপরিসীম যত্নে আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে স্বাতি বলেছিল, তুমি চুপটি করে বসে থাক, আমি উঠে তোমাকে শুইয়ে দেব।

ছুজনের জন্য একটি কুপে কম্পার্টমেণ্ট। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে ঢুকতে পারবে না। সারারাত আমরা একা এই গাড়িতে থাকব, আর কেউ থাকবে না। এই ভাবনায় আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলুম। মাথার উপর ছুখানা পাখা ঘুরছিল। তবু আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল, গরম হল কান ছুটো, আর একটা গভীর অস্বস্তিতে আমি বিব্রত বোধ করলুম। কিন্তু স্বাতি মুখ বাড়িয়ে বলল, নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে আর কোন ভয় নেই।

আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম স্বাতির এই কথা শুনে, আর সে আশ্চর্য হয়েছিল আমার মুখের দিকে চেয়ে। চমকে উঠে বলেছিল, তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?

সহসা এই কষ্টের কথা আমি বলতে পারি নি। তারপরে তার উদ্বেগ দেখে বলেছিলুম, এই কামরাটা খুবই ছোট, একটা বড় কামরায় গেলে বোধ হয় ভাল হত।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল, ভয়!

লজ্জা পেয়ে আমি বলেছিলুম, তোমাকে আমি ভয় পাব কেন!

তবে কি আমি তোমাকে ভয় পাব!

এইবারে স্বাতি একটু হেসে বলল: এতক্ষণে মনে পড়েছে বুঝি!

বললুম: তোমার সে দিনের কথা আমি ভুলতে পারি নি। তুমি

বলেছিলে, মানুষ মানুষকে ভয় পাবে কেন! মানুষ শয়তানকে ভয় পায়, কিন্তু দেবতাকে ভয় পায় না তো! আমরা তো সে সব কিছু নই, আমরা সাধারণ মানুষ। মনুষ্যত্বে কি তোমার বিশ্বাস নেই, না সে বিশ্বাস আজকাল হারিয়ে ফেলেছ!

তারপর?

আমার মাথার চুলে তুমি তোমার হাত চালিয়ে দিয়েছিলে, আর আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। আমার শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল বলে আমার মনে হয়েছিল।

স্বাতি বলল: তোমার এই ভাবান্তরও আমি বুঝতে পেরে-ছিলাম।

তাই আমাকে ছেলেমানুষ বলেছিলে!

কিন্তু আমার বন্ধুরা অন্য কথা বলে।

কী বলে তা বলল না দেখে আমি বললুম: কী বলে তা বলবে না?

স্বাতি বলল: তোমাকে কাপুরুষ বলে। লাজুক বা ভীরু ভাবতেও তারা রাজী নয়।

বললুম: কথাটা মিথ্যে নয়।

স্বাতি তখনই বলল: এ কালে এটা গুণের কথা নয়, এ তোমার দুর্বলতার পরিচয়।

সংস্কারও বলতে পার।

এর থেকে তোমাকে মুক্তি পেতে হবে।

তারপরেই বলল: আমি তোমাকে হ্যাংলা হতে বলছি না, বেহায়াপনা করতেও বলব না। মেয়েদের তুমি যে অন্য চোখে দেখ, তারই পরিবর্তনের কথা বলছি। মেয়েরা তো আর অন্তঃপুরবাসী নয়, তারাও পুরুষদের সঙ্গে একই রকমের কাজ করছে। এখন তাদের মেয়ে ভাবলে চলবে না, বন্ধু ভাবতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের কথা আমার মনে পড়ে গেল। 'দুই বোন' উপন্যাসে

তিনি লিখেছিলেন, 'মেয়েরা দুই জাতের, কোন কোন পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ। ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব। আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায় থাকে, যে-ঝঙ্কারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।'

বললুম: রবীন্দ্রনাথও কিন্তু মেয়েদের দুটি জাত জানতেন—মায়ের ও প্রিয়ার জাত।

স্বাতি বলল: সে বিয়ের পরে, বিয়ের আগে নয়। বিয়ের আগে তাদের একটাই জাত, সে বন্ধুর জাত। মেয়েদের বন্ধু ভাবলে তাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে কোন জড়তা বা সঙ্কোচ থাকবে না। দেখতে পাও না, তোমার কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এখন কত সহজে মেলামেশা করে। ঠিক ভাইবোনের মতো নয়!

এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারলুম না।

শুয়ে পড়বার আগে আরও কিছুক্ষণ আমরা গল্প করলুম। এবারের যাত্রায় আমাদের আর ট্রেন থেকে নেমে স্টিমারে গঙ্গা পার হতে হবে না। সেই অন্ধকারে মাটি আর বালির উপর দিয়ে কুলিদের সঙ্গে ছুটে চলা, স্টিমারে উঠে একটুখানি জায়গা খুঁজে নেওয়া, তারপরে রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে নিয়ে ওপারে নামবার অপেক্ষা। স্টিমার থেকে নেমে অন্ধকারে কখনও অনেকটা পথ হাঁটতে হত, নিজেদের রিজার্ভ করা গাড়ি খুঁজতে বেগ পেতে হত যাত্রীদের। কখনও বৃষ্টি নামত, ভিজতে হত সবাইকে। চালাঘরের নিচের চায়ের

দোকানে গরম চা খেয়ে দেহের কাঁপুনি বন্ধ হত। কিন্তু আর আমাদের স্টিমারে চেপে গঙ্গা পার হতে হবে না। এই কামরূপ এক্সপ্রেস ফরাক্কার বাঁধের উপর দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে যাবে। কখন

হচ্ছিল।

স্বাতি বলল: এবারে ফেরার পথে সেবারের দৃশ্য আর দেখতে পাব না।

সেবারের মানে গৌড় দেখে ফেরার সময়ের কথা। ঘন অন্ধকারে পৃথিবী তখন আবৃত ছিল। দিগন্তের সীমানা দেখা যাচ্ছিল না। জলে আর আকাশে ছিল না কোন পার্থক্য। আকাশের তারার ছায়া জলের উপরে প্রতিফলিত হয়ে জলকেও আকাশ বলে মনে হচ্ছিল। স্বাতি লাফিয়ে গেল রেলিঙের ধারে, আমিও তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

গঙ্গার জল স্টিমারের গায়ে লেগে কলকল করছে, তারার আলোয় ছলছল হয়েছে জলের ধারা। কোন কথা নেই, কোন গান নেই, নেই কোন গভীর গম্ভীর ভাবনা। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, আর আমি তাকালুম স্বাতির চোখের দিকে। মুখে কোন কথা এল না।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পরে স্বাতি অস্পষ্ট ভাবে বলল: কী ভাবছ?

তোমার ব্রাউনিঙের কথা এখন মনে পড়ছে।—

Let us be unashamed of soul,
As earth lies bare to heaven above.

উপরের আকাশের কাছে পৃথিবী যেমন নগ্ন, তেমনি মনের জন্তে আমাদের লজ্জা কেন।

স্বাতি বলল, লজ্জার কথা নয়, আমি ভাবছি অন্য কথা। যে মুহূর্তটি জীবনে চিরন্তন করতে চাই, তাকে তো ধরে রাখতে পারি নে —

Just when I seemed about to learn !
Where is the thread now ? Off again !
The old trick !

স্বাতির এই উত্তর আমার ভাল লাগল। নিজের বাসনার কথা বুঝি এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলা যায় না। আমি আকাশের চাঁদ একবার দেখলুম, তারপর স্বাতির দিকে চেয়ে বললুম. খুব সত্যি কথা।—

Only I discern—
Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearn.

বাসনা অসীম। আর তার জন্যে বুকের যন্ত্রণারও যেন শেষ নেই।

অনেক দিন পরে আবার আমরা এই পথে চলেছি। এবারে আমরা স্টিমারে গঙ্গা পার হব না। এবারে আমাদের সমস্ত ভাবনা যেন রেলের চাকার নিচে পিষে যাচ্ছে। তাই স্বাতির কথার উত্তরে বললুম: সে মন কি আমাদের এখনও আছে ?

স্বাতি চমকে উঠে বলল: না না, এমন কথা মনে এনো না। সে মন হারালে আমাদের চলবে না। মনই তো জীবনকে মধুর করে, মনই করে বিষময়। সেদিনের সেই মনকে যেন আমরা চির দিন শ্রদ্ধা করতে পারি।

অন্ধকারের বুক চিরে আমাদের ট্রেন ছুটেছে প্রাচীর দিকে। স্বাতির এই কথায় আমি যেন সূর্যোদয়ের সঙ্কেত পেলুম। বললুম: বিধাতার কাছে আমরা সেই প্রার্থনাই করব।

## ৩

সকাল সাতটা নাগাদ আমাদের নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবার কথা। কিন্তু তার অনেক আগেই ঘুম ভেঙে গেল। দেখলুম যে অন্ধকার আর নেই। আর আশ্চর্য হলুম স্বাতির কাণ্ড দেখে। জানালা খুলে প্ল্যাটফর্মের চা-ওয়ালার কাছ থেকে এক ভাঁড় চা সংগ্রহ করেছে। সেই চায়ের ভাঁড়টি আমার হাতে দিয়ে বলল : নাও।

বাঙ্কের উপরেই উঠে বসে সেই ভাঁড়টি হাতে নিয়ে বললুম : তোমার কই ?

স্বাতি হেসে বলল : তোমার মতো বাসি মুখে চা খাবার অভ্যেস আমার নেই।

তবে আমার জন্যে কেন নিলে ?

মেজাজটা প্রসন্ন হবে বলে।

সত্যিই এ আমার অনেক দিনের অভ্যাস। উত্তরপাড়ার এঁদো ঘরে যখন একা থাকতুম, তখনও হারানিধির চায়ের দোকানের একটা ছোকরা জানালা দিয়ে এক ভাঁড় গরম চা দিয়ে যেত। স্বাতি কবে কেমন করে এ কথা জানতে পেরেছে তা জানি নে। এখনও সেই চা পাচ্ছি। কিন্তু নিজে মুখ হাত না ধুয়ে সে চা খায় না। আড়ালে ঠাকুর দেবতার নামও করে বলে আমার সন্দেহ। কিন্তু কিছুতেই ধরা দেয় না।

চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : কত দূর এসেছি আমরা ?

স্বাতি সংক্ষেপে বলল : কিষণগঞ্জ।

তাহলে কি অনেক লেট যাচ্ছে ট্রেন ?

বোধহয় না। এর পরেই নিউ জলপাইগুড়িতে গিয়ে থামবে।

বলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবার আগেই আমরা মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলুম। সেখানে চা পাওয়া যাবে। পাঁউরুটি মাখন আমাদের সঙ্গে আছে। ডিম আর কলা নাকি অযাত্রা। তাই কলা আর আপেল কেনা হয়েছে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে ওঠবার পরে। সঙ্গে খাবার জলও আছে। এই দিয়েই আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলুম। তারপর বোতলে জল ভরে নিলুম। কমলা লেবু নতুন উঠেছে দেখে স্বাতি কয়েকটা কিনল। এখনও সবুজ রঙ পুরোপুরি কমলা রঙ হয় নি। কিন্তু মিষ্টি নাকি হয়েছে।

ট্রেন কিছু লেট এসেছিল। আরও লেট হতে লাগল। কিছুতেই যেন ছাড়ছে না। পরে যাত্রীদের উদ্বেগ দেখে প্রশ্ন করে জানলুম যে সামনের দিকে গাড়িতে জল নেই, জল ভরা সম্ভব হয় নি। তাই সেই গাড়ির যাত্রীরা ট্রেন ছাড়তে দিচ্ছে না। তারা সেনাদলে কাজ করে। বলছে, জলের জন্যে আমরা অনেক আগেই বলেছি, কিন্তু কেউ গা করছে না। শেষ পর্যন্ত পুরো গাড়িটা পিছিয়ে জল ভরে ছাড়তে হল। তাতে আরও লেট হল ট্রেন। সময় মতো এ কাজ করলে এত বিলম্ব হত না।

ট্রেনে উঠলে আমাদের ক্ষুধা যেন সারাক্ষণ জেগে থাকে। একবার খেয়েই পরের বারের কথা ভাবতে শুরু করি। ট্রেন ছাড়বার আগেই স্বাতি বলল: বেলা সাড়ে বারোটায় তো আমাদের গাড়ি বদল করতে হবে নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ।

আমি বললুম: তার জন্যে ভাবনা কী?

স্বাতি বলল: ঘণ্টাখানেক লেট দু ঘণ্টাতেও দাঁড়াতে পারে।

এইবারে বুঝতে পেরে বললুম: দুপুরের খাবার অর্ডার তাহলে এখানেই দেওয়া যাক। ট্রেনে তো বুফে কার আছে!

স্বাতি বলল: বঙ্গাইগাঁও-এ নেমে খাবার সময় নিশ্চয়ই হবে না।

কিন্তু আমাদের কোন উদ্যোগ করতে হল না। ট্রেন ছাড়বার আগেই বুফে কারের বেয়ারা এসে খাবার অর্ডার নিয়ে গেল। স্বাতি বলল: আমরা নিরামিষ খাব।

বেয়ারা চলে যাবার পরে আমি প্রশ্ন করলুম: আজ নিরামিষ খাবারের অর্ডার কেন দিলে?

স্বাতি বলল: দিনের বেলায় আমরা তো মাছ খাই। ট্রেনে মাছ খেতে চাইলে আড় কিংবা বোয়াল মাছ দেবে রুই মাছ বলে। তার চেয়ে নিরামিষই ভাল।

একটু থেমে বলল: নিজেদের কথা অনেক হয়েছে। এই বারে এই যাত্রার পথঘাট একটু বুঝে নেওয়া যাক।

বলে রেলের টাইম টেবলটা বার করে আমার হাতে দিল। কয়েকটা পাতা উল্টেই দেখলাম যে বইএর পিছনের দিকে একটা মানচিত্র আছে। তার সঙ্গে সময় সূচী মিলিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে বেশি সময় লাগল না।

এক নজরেই একটা অসঙ্গতি চোখে পড়ল। বড় লাইন দেখানো হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের ধারে যোগীঘোপা পর্যন্ত। কিন্তু সূচীপত্রে যোগীঘোপা নামে কোন স্টেশন নেই। নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে যোগীঘোপা পর্যন্ত রেল লাইন পাতার কথা সংবাদ পত্রে পড়েছিলুম, কিন্তু রেল লাইন পাতা হয়েছে বলে শুনি নি। আমাদের এই ট্রেন নিউ বঙ্গাইগাঁও পর্যন্তই যায়, তার পরে ছোট লাইনের ট্রেনে পুলের উপর দিয়ে গৌহাটি পৌঁছতে হয়। গৌহাটিতেই যাত্রা শেষ হয় না, ডিব্রুগড় বা তিনসুকিয়া পর্যন্ত একই ট্রেনে যাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে তেজপুর বা নর্থ লখিমপুরে যেতে হলে। বঙ্গাইগাঁও-এর পরে রঙ্গিয়া জংসনে গাড়ি বদল করতে হয়। আর শিলচর বা ধর্মনগরে যেতে হলে গৌহাটিতে নেমে অন্য ট্রেন ধরতে হয়, কিংবা লামডিং পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে নামতে হয়।

আগে আমরা ব্রড গেজ মিটার গেজ বা ন্যারো গেজ বলতুম।

এখন দেখছি এ সব কথা উঠে গিয়ে ব্রড গেজকে ১'৬৭৬ মিটার গেজ, মিটার গেজকে ১ মিটার গেজ ও ন্যারো গেজকে '৬০৯ মিটার গেজ বলা হচ্ছে। ব্যাপারটা একই। মিটার গেজ এক মিটার গেজই আছে। অন্য দুটোর মাপও বদলায় নি।

বড় লাইন কাটিহার পর্যন্ত গেছে। আর বড় লাইনের পাশা-পাশি চলেছে পুরনো মিটার গেজ। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন শিলিগুড়ির কাছেই। কিন্তু জলপাইগুড়ি ছত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে। নিউ জলপাইগুড়ির নাম নিউ শিলিগুড়ি হলেই মানানসই হত। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি টাউন পাঁচ ও শিলিগুড়ি জংসন সাত কিলোমিটার উত্তরে। নিউ জলপাইগুড়িতেই দার্জিলিঙের ছোট গাড়ি ধরতে হয়। এই ট্রেন শিলিগুড়ি জংসনের উপর দিয়ে যায়। মিটার গেজ রেলপথ শিলিগুড়ি জংসন থেকে বড় লাইনের উত্তর দিয়ে সমান্তরাল পথে এসেছে নিউ বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত, তার পরে বড় লাইনের ট্রেন কত দিনে চলবে তা জানা নেই। ব্রহ্মপুত্রের পুলের উপর দিয়ে বড় লাইনের ট্রেন চলতে পারবে কিনা তাও জানি না।

বড় লাইনের উপরে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে চৌত্রিশ কিলোমিটার দূরে জলপাইগুড়ি রোড নামেও একটি ছোট স্টেশন আছে। তার পরে আরও অনেকগুলি নতুন স্টেশন। নিউ কুচবিহার ও নিউ আলিপুরদুয়ারও আছে। নিউ কুচবিহার থেকে কুচবিহার শহরের দূরত্ব মাইল পাঁচেক। বাস আছে, সাইকেল রিক্সাও পাওয়া যায়। কিন্তু জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে কোন যানবাহন দেখতে পাই নি।

এক সময়ে স্বাতি বলল : টাইম টেবলটা তুমি গুলে খাবে বলে মনে হচ্ছে!

আমি লজ্জা পেলুম তার এই মন্তব্য শুনে। বললুম : থাক এখন, বাকিটা পরেই দেখব।

বলে টাইম টেবলটা স্বাতিকে ফিরিয়ে দিলুম। সে তা রেখে দিল ছোট টেবিলটার উপরে।

আমি বুঝতে পেরেছি যে স্বাতি এবারে কিছু জানতে চাইবে। তাই প্রশ্ন করলুম : কিছু বলতে হবে ?

স্বাতি হেসে বলল : ইতিহাস বা ভূগোলের কথা নয়। নিতান্তই ব্যক্তিগত কথা।

বললুম : বল।

স্বাতি বলল : কলেজে কাজ পেয়েই তো তুমি আসামের চাকরিটা ছেড়ে দিলে, কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলে কলকাতার অফিসে। গৌহাটির অফিসে কি তোমার একবার যেতে ইচ্ছে হবে না ?

না। অফিসের ম্যানেজার মিস্টার বড়ুয়া আমার উপস্থিতি মোটেই পছন্দ করবেন না।

কিন্তু আর সবাই তো তোমাকে ভালবাসেন বলে শুনেছি !

বললুম : কয়েকজন সত্যিই ভালবাসে।

তবে ?

তোমাকে কিছু বলি নি বুঝি ?

স্বাতি বলল : না তো !

বললুম : এবারে টিকিট পাবার পরে পৌঁছনোর দিন জানিয়ে কাকতিকে একখানা চিঠি লিখে দিয়েছি। অরুণাচলের সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর সংগ্রহ করতে বলেছি তাকে।

ইভাকে লিখলে না কেন ?

শিলঙের মেয়ে এত দিন কি আর গৌহাটি অফিসে আছে !

স্বাতি বলল : সবার সঙ্গে দেখা হলে তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে !

আমার স্বল্পকালের অভিজ্ঞতা আমি ভুলতে পারি নি। ঐ প্রতিষ্ঠানে আমি আর কত দিন কাজ করেছি। কিন্তু অফিসের কয়েকজনের আন্তরিকতা আমি কোন দিন ভুলব না। তাই সংক্ষেপে বললুম : ভাল লাগবে বৈ কি !

প্রথম দিনের কথা আমার মনে পড়ছে। রাত্রির শেষ প্রহরে আমি গৌহাটি পৌঁছেছিলুম। ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছিল। অন্ধকার কিছু স্বচ্ছ হলেও তাকে প্রত্যূষ বলা চলে না। ভেবেছিলুম যে স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে নেব। তারপর বেলা হলে অফিসের দিকে পা বাড়াব। কিন্তু একজন অপরিচিত লোককে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালুম। ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে আমাদের ফার্মের একখানা কার্ড আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

নিজের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে সে বলল, আজ্ঞে, আমার নাম কাকতি।

ফার্মের গাড়ি এসেছিল। সেই গাড়িতেই কাকতি আমাকে একটা হোটেলে পৌঁছে দিল। তারপর বিদায় নেবার সময়ে বলল, একটা নিবেদন আছে সার!

বললুম, অসঙ্কোচে বলুন।

সে বলল, আমার কথা কাউকে বলবেন না।

আমি হেসে বললুম, আচ্ছা।

কাকতি আবার মিনতি করে বলল, আমার সঙ্গে যে আপনার পরিচয় হয়েছে, কেউ যেন তা টের না পায়। আমাদের ড্রাইভার খুব বিশ্বস্ত, সে কাউকে বলবে না।

আমি আবার হেসে বললুম, আমিও কাউকে বলব না।

কাকতি অফিসের একজন সাধারণ কেরানী। অফিসে তার আচরণ আমি লক্ষ্য করেছিলুম। সকলের সঙ্গে এমন ভালোমানুষের মতো আমার কাছে এসেছিল যে কারও মনেই কোন সন্দেহ জাগতে পারে নি। পরিচয় হবার পরে ফিরে গিয়েছিল নিজের জায়গায়। কিন্তু অফিস ছুটির পরে আবার আমার কাছে এসেছিল সবার অলক্ষ্যে।

ইভা নামের একটি মেয়ের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল

অন্তরঙ্গ। শিলঙের ওয়ার্ড'লেকের ধারে বসে আমি আমার দুর্বলতার কথা তাকে অসঙ্কোচে বলেছিলুম। সেও :তার জীবনের অত্যন্ত গোপন কথা আমাকে জানিয়েছিল। আমাকে পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করেই সব বলেছিল, আমাকে বলবার:সময় সে একটুও ভয় পায় নি।

এদের কাছে বিদায় নেবার ক্ষণটিও আমার স্পষ্ট মনে আছে। টুর থেকে ফিরে আমার হোটেলের'দরজায় নেমে দেখি, ইভা আমাকে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তার প্রসন্ন হাসি।

ইভাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম, কিন্তু আমার জন্যে যে আরও অনেক বিস্ময় সঞ্চিত হয়ে ছিল তখনও তা:জানতে পারি নি। ইভাকে কিছু বলবার আগেই দেখলুম যে অন্ধকারে একখানা রিক্সা এসে দাঁড়াল। আমাদের অফিসের খাজাঞ্চি বুড়ো মেধিবাবুকে ধরে এনেছে কাকতি।

চায়ের টেবিলে বসে সব কথা শুনলুম। কাকতি বলল, ইভা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেই সমস্ত ব্যাপারটা আমরা জানতে পারলাম।

ইভার মুখের হাসি আরও মিষ্টি দেখাচ্ছিল।

কাকতি বলল, কালকের ডাকে আমাদের সমস্ত স্টাফের কনফার্মেশন এসেছে, এখন আমাদের সকলেরই পাকা চাকরি। কিন্তু বড়ুয়া সাহেব ক্ষেপে গিয়ে সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তা দিন, তাতে আমাদের ক্ষতি হবে না। কিন্তু ঐ শকুন আপনার ক্ষতি করতে চেয়েছিল। কাল কুচবিহারে একটা কনফারেন্সে আপনার যাবার কথা, কাউকে না জানিয়ে টেলিগ্রাম করে দিয়েছে যে আপনি যেতে পারবেন না।

আমার স্টেনোগ্রাফার শর্মা ছিলেন সেখানে, তিনি বললেন, এ কথা তোমরা জানলে কী করে?

ইভা হাসছিল। আর কাকতি বলল, কাল রাতে ইভা শুনে

এসেছে, বড়ুয়া সাহেব গৌরব করে তাঁর মেমসাহেবকে এই কথা বলছিলেন।

হাসতে হাসতেই ইভা বলল, কাকতির সাহস দেখে আমরা সবাই আশ্চর্য হচ্ছি। ও টেলিফোন করে আপনার খবর নিয়েছে, মেধিবাবুকে ধরে এনেছে টাকার জন্যে।

কাকতি ইশারা করতেই মেধিবাবু এক তাড়া নোট বার করে দিলেন, আর একটা রসিদে আমার সই করিয়ে নিলেন। কাকতি নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, রাত সাড়ে দশটার পরে এ টি. মেল ছাড়বে, আপনার জন্যে একখানা বার্থ আমি বুক করে এসেছি। সকাল সাতটার পর আলিপুর জংসনে গাড়ি বদল করে দশটার পরেই কুচবিহারে পৌছবেন। টেলিফোনে আমি ওদের খবর দিয়ে দিয়েছি, স্টেশন থেকে ওরা আপনাকে নিয়ে যাবে।

এদের আন্তরিকতায় আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। কোন কথাই বলতে পারি নি। এবারে যদি দেখা হয়, তবে তাদের ধন্যবাদ জানাব। এই কথা ভেবেই কাকতিকে আমি চিঠি লিখেছি। ইভা এখনও গৌহাটির অফিসে থাকলে সেও কাকতির কাছে খবর পাবে। আর সেই গম্ভীর মানুষ শর্মা। এরা আমাকে ভালবেসেছিল। তাদের সবার কাছে আমার ঋণ রয়ে গেছে।

স্বাতি সহসা প্রশ্ন করল: তুমি কি তাদের কারও কাছে কোন সাহায্য চেয়েছ?

বললুম: না। আমরা যে যাচ্ছি, সেই খবরটাই শুধু দিয়েছি। আর খবর চেয়েছি অরুণাচলের। আশা করছি তারা নিজেরাই সব রকম সাহায্য করবার জন্যে ছুটে আসবে।

কিন্তু তোমার সঙ্গে তো তাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল!

যদি কেউ না আসে তবে ভাবব যে আমার আচরণে কোন গলদ ছিল, আমি আমার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিলুম।

স্বাতি বলল: প্রভুর দায়িত্ব যথাযথ পালন করলে ভৃত্যরা কি সব সময় সন্তুষ্ট হয়!

বললুম : এই ধারণাই আমাদের সর্বনাশের মূলে। এই ধারণার জন্যেই আমাদের মালিক ও মজুর সম্পর্ক দিনে দিনে বিষাক্ত হচ্ছে। যাকে আশ্রয় করে আমরা বাঁচব, তাকে আমরা নিজের প্রতিষ্ঠান বলে কেন ভাবতে পারব না! তা ভাবতে পারলে প্রভু-ভৃত্যের মনান্তর তো থাকতে পারবে না! আমাদের ফার্ম, আমাদের কারখানা, আমাদের দেশ—এই কথা ভাবতে পারলে মতান্তর কিসের! নিজেদেরই তো সব মতান্তর দূর করতে হবে!

একটু থেমে বললুম : শুনেছি, জাপানেও ধর্মঘট হয়। কিন্তু তার রূপ অন্য রকম। কারখানায় কাজ হয় পুরো দমে, কিন্তু মাল তৈরি হবার পরে তা বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। ধর্মঘট মেটবার পরেই সেই মাল বাইরে যায়। অর্থাৎ আমাদের মতো কাজে ফাঁকি দেবার ধর্মঘট নয়, কাজই তাদের জীবন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : আমি এ কথা শুনি নি তো!

বললুম : এ আমার পড়া কথা নয়, শোনা কথা। শোনা কথা সব সময় ঠিক হয় না। কিন্তু আমার আদর্শের সঙ্গে মিলে গেছে বলে এ কথা বিশ্বাস করেছি। এ কালে যার সব চেয়ে বেশি দরকার সে হল দেশটা নিজেদের ভাবা। নিজেদের কাজে দেশের ক্ষতি হবে না উন্নতি এই ভাবনাই আমাদের সব কাজের প্রেরণা যোগাবে।

স্বাতি বলল : এ হল আদর্শের কথা। এ কথা তো কেউ গ্রহণ করবে না।

বললুম : আদর্শ প্রচার করলে কেউ তা গ্রহণ করে না। আদর্শ হল নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবার। তার সাফল্য দেখেই অপরে তা গ্রহণ করবে। আমাদের ফার্মের কর্মীরা এই আদর্শ গ্রহণ করেছিল বলেই ম্যানেজারের স্বার্থপর কাজে হস্তক্ষেপ করেছিল।

স্বাতি আর প্রতিবাদ করল না।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পরে বললুম : খবর পেলে ইভাও চলে আসবে। সে আমাকে বুঝতে পেরেছিল।

জানি।

হ্যাঁ, তোমাকে বলেছি তার কথা। তাকেও তোমার কথা বলেছিলুম। সে তোমাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

স্বাতি বিস্মিত হয়ে বলল : কী করে চিনবে! তোমার কাছে তো আমার কোন ছবি ছিল না!

ছবি তো চোখের জন্যে। মনের জন্যে তো কোন ছবির দরকার নেই! মন তার নিজের ক্যামেরায় ছবি তুলে নেয়। চোখ যা দেখে নি তারও ছবি তুলতে পারে মন। এই রাজ্যের রাজা বাণাসুরের কন্যা উষার কথা মনে নেই?

স্বাতি বলল : ভুলে গেছি।

বললুম : এক দিন পার্বতীকে শিবের সঙ্গে ক্রীড়া করতে দেখে উষারও সেই ইচ্ছা হয়। এ কথা জেনে পার্বতী বললেন, যে পুরুষ স্বপ্নে তোমায় সম্ভোগ করবে, সেই হবে তোমার স্বামী। এক দিন তাই হল। উষার সখী শিল্পী চিত্রলেখা নানা জনের ছবি এঁকে দেখাতে লাগল। উষা চিনতে পেরেছিল তার স্বপ্নের স্বামীকে, সে হল কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধর সঙ্গেই উষার বিয়ে হয়েছিল।

সহাস্যে স্বাতি বলল : এ রকম ঘটনা পুরাণেই সম্ভব হয়।

এ জগতেও ঘটে। ইভা তোমার হাতের লেখা চিনতে পেরেছিল।

সত্যি!

সত্যি বলেই তো আমি বিশ্বাস করি।

কিন্তু আমাকে তো এ কথা বলো নি!

বলি নি কি! তা হবে। এ হল গৌহাটিতে আমার শেষ দিনের কথা। হোটেল থেকে ফিরে যাবার আগে ইভা আমাকে তোমার চিঠিখানা দিয়ে বলেছিল, আপনার পার্সোনাল চিঠি বলে অফিস থেকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু চিঠিখানা হাতে দিয়ে সে আমার মুখের

দিকে চেয়েই রইল। কাশ্মীর থেকে চলে আসার পরে এই তোমার প্রথম চিঠি। আমার মুখে ইভা কী দেখেছিল সেই জানে, প্রসন্ন হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে সে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে সে তোমার হাতের লেখা চিনতে পেরেছিল বলেই চিঠিখানা আমাকে দিতে এসেছিল। আর—

আমি থামতেই স্বাতি বলল: বল।

বললুম: সেই চিঠিখানা আমার পকেটে ছিল বলেই তোমাকে পেলাম। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দিল্লী থেকে তুমি ছুটে এলে। কিন্তু সেদিন তুমি আমাকে ভুল কথা লিখেছিলে।

ভুল কথা!

হ্যাঁ। তুমি লিখেছিলে, মা তোমাকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি বাধা দিয়েছি। সুখের দিনে যখন আমরা তোমার কথা ভাবব, তখনই আমাদের দুঃখের দিনে তোমাকে ডাকবার অধিকার জন্মাবে।

স্বাতি বলল: এ তো ভুল কথা নয়!

বললুম: ভুল যদি নয় তো আমার দুর্ঘটনার কথা জেনে তুমি নিজে ছুটে এসেছিলে কেন। কোন দ্বিধা তো তোমার আসে নি!

দ্বিধা কিসের! তোমার মতো দ্বিধা তো আমার কোন দিনই ছিল না।

দ্বিধা নয়, সে আমার দুর্বলতা।

স্বাতি একটা কমলালেবু আমার হাতে দিয়ে বলল: একটা কমলালেবু খাও, গায়ে জোর পাবে।

বলে হাসতে লাগল।

## ৪

নিউ বঙ্গাইগাঁও পৌঁছবার আগেই আমরা দুপুরের আহার সেরে নিলুম। ঘণ্টা খানেক লেট ছিল ট্রেন। সাড়ে বারোটার বদলে পৌঁছলুম দেড়টার পরে। মিটার গেজ ট্রেন প্ল্যাটফর্মের অন্য ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সরাসরি না উঠে আমরা আমাদের জায়গা রিজার্ভ করিয়ে নিয়ে উঠলুম।

স্বাতি বলল: এই ট্রেন তো ডিমাপুরের ওপর দিয়ে ডিব্রুগড় যাবে, ইচ্ছা করলে আমরা এই ট্রেনেই ডিমাপুরে যেতে পারি।

বললুম: তাতে সুবিধা যেমন, অসুবিধেও তেমনি। গৌহাটিতে গাড়ি বদল করতে হবে না ঠিকই, কিন্তু ডিমাপুরে পৌঁছয় রাত একটার পরে। আজ কখন পৌঁছবে তার ঠিক নেই। অত রাতে পৌঁছলে স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই রাত কাটাতে হবে। রিটায়ারিং রুম থাকলেও তা খালি পাওয়া যাবে না।

তবে আমরা সকালের ট্রেনেই যাব।

বললুম: তাতেও বিপদ আছে।

কেন?

সকাল দশটায় একটা ট্রেন ছিল, তাতে গেলে সন্ধ্যেবেলায় পৌঁছনো যেত। এবারের টাইম টেবলে দেখেছি, সকাল পাঁচটা পঁচিশের পরে আর কোন ট্রেন নেই। গৌহাটি স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে জায়গা না পেলে বাইরে থেকে এসে ট্রেন ধরতে রীতি মতো বেগ পেতে হবে। তবে দুপুর বারোটার পরেই ডিমাপুরে পৌঁছনো যাবে।

স্বাতি বলল: বেড়াতে বেরিয়ে অত ভাবলে চলে না। ব্যবস্থা একটা হবেই, আর ভাল ব্যবস্থাই হবে।

কামরূপ এক্সপ্রেস বিকেল পাঁচটা কুড়ি মিনিটে গৌহাটি পৌঁছয়।

মাঝে বরপেটা রোড ও রঙ্গিয়া জংসনে দাঁড়ায়। গৌহাটির আগের স্টেশন কামাখ্যাতেও দাঁড়ায় দু মিনিটের জন্যে।

রঙ্গিয়া জংসন বেশ বড় স্টেশন। সেখান থেকে তেজপুর একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। এক্সপ্রেস ট্রেন রাত পৌনে বারোটায় ছেড়ে ভোর পৌনে ছটায় পৌঁছয়। প্যাসেঞ্জার ট্রেন দিনের বেলায়। কামরূপ এক্সপ্রেস বিকেল চারটেয় পৌঁছবার ঘণ্টা দুই পরে রঙ্গিয়া জংসন থেকে অরুণাচল এক্সপ্রেস ছাড়ে। এ ট্রেন তেজপুর পৌঁছবার কিছু আগেই রাঙ্গাপাড়া নর্থ থেকে নর্থ লখিমপুরের উপর দিয়ে মুরকঙ সেলেক পর্যন্ত যায়। দূরত্ব সাড়ে চারশো কিলোমিটারের কিছু বেশি। দিনের বেলায় একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেনও চলে। এই লাইনের শেষ স্টেশনটি ব্রহ্মপুত্রের পরপারে ডিব্রুগড় ছাড়িয়ে আরও অনেকটা উত্তর-পূর্বে। শুনেছি যে তেজপুর আর নর্থ লখিমপুরের মাঝে কোন একটি স্থান থেকে অরুণাচলের নূতন রাজধানী ইটানগরে যেতে হয়। রেলের কোন স্টেশন থেকে মোটর বাসে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না।

ট্রেন রঙ্গিয়া জংসন ছেড়ে যাবার পরে আমি বললুম: এ যাত্রায় তাহলে অরুণাচল দেখা হল না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কেন?

বললুম: অরুণাচল যেতে হলে রঙ্গিয়ায় নেমে আমাদের অরুণাচল এক্সপ্রেস ধরতে হত।

গৌহাটি থেকে কি যাবার কোন পথ নেই?

বললুম: সড়ক পথ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের এপারে আবার আসতে হবে।

কিন্তু আমরা তো ব্রহ্মপুত্র এখনও পেরোই নি।

গৌহাটি পৌঁছবার আগে সেই বিরাট পুলটা পেরোতে হবে।

রেলের এই পুল খুব বেশি পুরনো নয়। এই পুল তৈরি হবার আগে স্টিমারে ব্রহ্মপুত্র পার হতে হত। ট্রেন এসে দাঁড়াত আমিনগাঁও

নামের একটা স্টেশনে, ওপারে পাণ্ডু স্টেশন। পাণ্ডু থেকে ট্রেন গৌহাটি যেত। লোকে জানত যে ব্রহ্মপুত্র নদী এমন প্রশস্ত যে এর ওপরে পুল তৈরি করা এক রকম অসম্ভব। কিন্তু দেশ রক্ষার প্রয়োজনে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হয়েছে। ভারত বিভক্ত হবার পরে আসামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে আসাম মেল আসত সারা পুলের উপর দিয়ে পদ্মা পেরিয়ে পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করে। সে পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নতুন পথ তৈরি হল উত্তরবঙ্গ দিয়ে। এই নতুন পথেরই উন্নতি হচ্ছে।

স্বাতি বলল : অরুণাচলের সম্বন্ধে কি তুমি কিছুই জানো না ?

বললুম : কিছু জানি নে তা নয়, কিন্তু সে সবই বই-পড়া কথা। সে সব কথা কি এখন ভাল লাগবে ?

স্বাতি বলল : প্রশ্নটা ভাল লাগার নয়, ভাল লাগাবার। প্রথমে পড়া কথা এমন ভাবে বল যাতে ভাল লাগে।

বললুম : প্রথমেই একটা প্রশ্ন মনে জাগে। সেটা হল এই নতুন রাজ্যটির নাম অরুণাচল হল কেন ? কে বা কারা এই নাম রাখল ? এখানকার আদিবাসীরা, না কেন্দ্রীয় সরকার ? কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে সম্পূর্ণ উত্তরটা এখন আর জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানি যে আমাদের পুরাণে অরুণাচল নামে একটি পাহাড় আছে।

স্বাতি বলল : দক্ষিণ ভারতে শুনেছি তিরুবন্নামালাই পাহাড়কে অরুণাচল বলে। আগুনের পাহাড়, শিবের মন্দির আছে সেখানে। আর আছে মহর্ষি রমণের আশ্রম।

বললুম : খুব ঠিক কথা। তারা দাবী করে যে স্কন্দপুরাণে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। অরুণাচল পূর্বার্ধের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন দাভে সাহেব। স্কন্দপুরাণের অরুণাচল নাকি দক্ষিণ ভারতেই। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অরুণাচল উত্তরে, কৈলাস পর্বতের পশ্চিমে।

স্বাতি বলল : এই অরুণাচল তো পশ্চিমে নয়, পূর্বে !

বললুম : তাহলে একখানি লিঙ্গপুরাণ সংগ্রহ করে অরুণাচল স্তোত্র পড়ে দেখতে হয়। তাতে এই পাহাড়ের সম্পূর্ণ বিবরণ আছে। যতদূর মনে হয়, লোকে বিশ্বাস করে যে হিমালয়ের এই অংশেরই নাম অরুণাচল। আর তাই হওয়াই উচিত।

কেন ?

অরুণ মানে প্রত্যূষের সূর্য, আর এই পাহাড়েই সূর্যোদয় হয়।

স্বাতি আমার যুক্তি নিঃশব্দে মেনে নিল দেখে বললুম : অরুণাচল নামটা এ দিকে প্রচলিত ছিল কিনা জানি না। আর নতুন রাজ্যের নামকরণ কী ভাবে হল তাও আমার জানা নেই।

স্বাতি বলল : তারপর বল।

বললুম : এই রাজ্যটিকে পুরোপুরি পার্বত্য রাজ্য বললে ভুল হবে না। তার ওপর অরণ্যময়। আসামের চেয়ে বড়, আর পশ্চিমবঙ্গের কিছু ছোট। কিন্তু এর ষাট শতাংশের বেশি বনভূমি এবং কাঠের কারবারই এখানে প্রধান শিল্প। এই রাজ্যের লোক-সংখ্যা জেনে আশ্চর্য হতে হয়। সমস্ত রাজ্যে পাঁচ লক্ষ অধিবাসীও নেই। গড়ে এক বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ছ জনের বাস। বাঙলায় বাস পাঁচশো চারজনের, আর আসামে এই সংখ্যা হল একশো ছিয়াশি। অরুণাচলের প্রায় অর্ধেক লোক কৃষিজীবী। অথচ আধুনিক প্রথায় চাষবাস এরা সবে শিখতে শুরু করেছে। এত দিন ঝুম প্রথায় চাষ হত। ঝুম প্রথা বোঝ তো ?

স্বাতি বলল : আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

বললুম : এক জায়গায় এরা এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত চাষবাস করে। ফসল কমে আসছে দেখলেই সেখান থেকে নতুন জায়গায় গিয়ে বনজঙ্গল পুড়িয়ে ফসল ফলায়। এখন সবাই লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতে শিখছে, ঝুম প্রথায় চাষ তাই কমে আসছে।

পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে কেটে যে চাষ হয়, তাকে কী বলে ?

বললুম : টেরাস কাল্টিভেসন। এই জমিতে প্রত্যেকের

নিজের স্বত্ব থাকে। কিন্তু ঝুম চাষে গ্রামের সকলের সমান অধিকার। এ রাজ্যেরও অনেক জায়গায় টেরাস চাষ আছে।

তারপরে বললুম : অরুণাচলের অবস্থান ভারি সুন্দর। পশ্চিমে ভুটান, উত্তরে চীন, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে ভারতের আসাম রাজ্য ও একেবারে পূর্ব দিক ঘেঁষে নাগাল্যাণ্ড। পাঁচটি জেলা আছে এ রাজ্যে। ভুটানের দিক থেকে প্রথমে কামেং জেলা, তার প্রধান শহর বমডিলা।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : এই নামটি আমার শোনা মনে হচ্ছে।

বললুম : ১৯৬১তে চীন যখন ভারত আক্রমণ করেছিল, তখনই আমরা এই নাম শুনেছিলুম। বমডিলার পতন হয়েছিল এবং আসামের তেজপুর থেকে লোক সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভয়ে।

তারপর ?

কামেং-এর পূর্বে সুবনশিরি জেলা, প্রধান শহর জিরো। এই জেলারই আসাম সীমান্তে ইটানগরে অরুণাচলের নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়েছে। তেজপুর থেকে নর্থ লখিমপুরের দিকে সড়ক পথে যাবার সময় বাঁ হাতে ইটানগরের পথ উত্তরে গেছে। রেল স্টেশনের নাম বোধহয় হারমূতি। এর পরে সিয়াং জেলা, প্রধান শহর অ্যালঙ। এই দুই জেলার সীমানায় প্রবাহিত হচ্ছে সুবনশিরি নদী। অরুণাচলে প্রবেশ করে তিব্বতের সাংপো নদীর নাম হয়েছে ডিহং, লোহিত জেলা দিয়ে ডিবং নামে আর একটি নদী বয়ে এসে ডিহং-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে আসামে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নামে প্রবাহিত হয়েছে। লোহিত জেলায় লোহিত বা লুহিত নামে আরও একটি নদী প্রবাহিত হয়ে ডিবংএর সঙ্গে মিলেছে। তেজু এই জেলার প্রধান শহর। আর পঞ্চম জেলাটির নাম তিরাপ, তার প্রধান শহর খোন্‌সা।

স্বাতি বলল : এত সব মনে রাখলে কী করে ?

গত কয়েক দিন যে এ অঞ্চলের ম্যাপ ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখেছিলুম, তা দেখতে পাও নি।

স্বাতি বলল : দেখতে পেলে আমিও বুঝে নিতাম।

বললুম : সুবনশিরি জেলায় হাপোলি নামে একটি শহর আছে। নর্থ লখিমপুর থেকে কিমিন ও হাপোলির ওপর দিয়ে জিরো যেতে হয়। আর সিয়াঙ্ জেলার পাসিঘাটে আছে ছোট, একটি এয়ারোড্রোম।

স্বাতি বলল : এই সব শহরেও কি আদিবাসীরা আছে ?

হেসে বললুম : শুধু শহরে নয়, এ রাজ্যের তিন হাজার গ্রামে সবাই আদিবাসী বা উপজাতি। শুনে আরও আশ্চর্য হবে যে একটা দুটো নয়, প্রায় পঞ্চাশটি উপজাতির লোক এই রাজ্যে বাস করছে তাদের নিজের নিজের স্বতন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান ধর্মবিশ্বাস ও ভাষা নিয়ে। এদের ভাষা তিব্বতী বর্মী গোষ্ঠীয়, উপভাষাও আছে। আর ধর্ম ! লামাপন্থী বৌদ্ধধর্মই প্রধান, কিছু খ্রীষ্টানও আছে, কিন্তু তারাও তাদের পুরনো আচার-অনুষ্ঠান পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারে নি। কিছু বৈষ্ণবও আছে।

স্বাতি বলল : এরা কি সবাই মিলেমিশে আছে, না প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এলাকা ?

বললুম : প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এলাকা বলে মনে হয় না। তবে এই রাজ্যে অনেকগুলি প্রাকৃতিক বিভাগ আছে। পাহাড় আর নদী দিয়ে এই সব বিভাগ। সুবনশিরি ডিহং ডিবং ও লোহিতের নাম আগেই বলেছি, এ ছাড়াও আছে মানস ভরেলি বরনদী প্রভৃতি নদী। আর পাহাড়ের নাম হল মিকির মিশমি দফ্লা আবর প্রভৃতি।

স্বাতি বলল : এই সব পাহাড়ের নামেই কি আদিবাসীদের নাম ?

বললুম : এ সব নামের আদিবাসী আছে। আরও যারা আছে, তাদের নাম কী ভাবে এসেছে তা জানি না। একখানা বইএ পড়েছি যে সব চেয়ে পশ্চিমে কামেং জেলায় যারা আছে, তাদের

নাম মন্‌পা সেরডুকপেন আকা দফ্‌লা সিজি ও বুগন। দফ্‌লারা সুবনশিরি জেলাতেও আছে। আর যারা আছে তাদের নাম মিরি, আপতানি তাগিন ও গালং। সিয়াং জেলায় আদি বা আবর জাতির বাস, মিশমিরা থাকে লোহিত অঞ্চলে। নাগাল্যাণ্ডের উত্তরে তিরাপ অঞ্চলে ওয়াংচু টাঙ্গ ও নোকটেরাই প্রধান। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে তিরাপের নোকটেরা বৈষ্ণব। এত পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম সেখানে পৌঁছল কেমন করে তা ভেবে দেখবার বিষয়।

স্বাতি বলল: কোন বৈষ্ণব হয়তে এই ধর্ম প্রচার করেছেন।

বললুম: হয়তো তাই। কিন্তু কখন কেমন করে, আর কেনই বা শুধু এই একটি আদিবাসী জাতের মধ্যে! তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করলে এর উত্তর পাওয়া যাবে না।

ঠিক এই সময়ে আমার কমলাকান্ত বাবুর কথা মনে পড়ে গেল। শিলঙের হোটেলে তিনি আমাকে এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা বলেছিলেন। অরুণাচলের আদিবাসীদের কথা। কিন্তু সে সব আলোচনার আর সময় পেলুম না। মনে হল যে আমাদের ট্রেন এবারে ব্রহ্মপুত্রের পুলের উপরে উঠে পড়েছে। দূর থেকে তারই শব্দ পাচ্ছি। দেখতে না দেখতেই আমাদের কম্পার্টমেণ্টও পুলের উপরে এসে পড়ল। আকাশ থেকে তখন অন্ধকার নামছে অল্প অল্প করে। এই আলোয় আমি ব্রহ্মপুত্রের এক অপরূপ রূপ দেখলুম। ভুলে গেলুম অরুণাচলের না দেখা কথা।

## ৫

আসাম রাজ্যে আমরা অনেক আগেই প্রবেশ করেছিলুম। এইবারে গৌহাটির দিকে অগ্রসর হলুম। বিকেল পাঁচটা দশ মিনিটে [illegible]

[illegible]

তবে ?

স্বাতি বলল : নাগাল্যাণ্ড মণিপুর মিজোরাম এই সব দুর্গম রাজ্যে বেড়াবার কথা আগে কখনও ভাবি নি। নাগাদের সঙ্গে থাকতে হবে, থাকতে হবে মিজোদের সঙ্গে কোথায় উঠব তার ঠিক নেই, কী খেতে পাব তাও জানা নেই। মনে কোন দুর্ভাবনাও নেই। নিজেদের হিপি বলে ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভারতীয় হিপি।

হেসে বললুম : আমরা তো তাই।

স্বাতি বলল : গৌহাটিতে কোথায় উঠবে, তা কি ভেবেছ ?

বললুম : না। কিন্তু বাসস্থান সম্বন্ধে আমার একটা মত গড়ে উঠেছে।

কী রকম ?

প্রথমে স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে চেষ্টা করব, তারপর টুরিস্ট বাংলোয়। সেটা কাছাকাছি না হলে কোন হোটেলে।

স্বাতি বলল : ডাকবাংলো বা সার্কিট হাউসে উঠবে না ?

তার জন্যে সরকারী অনুমতির দরকার হয়। কোন ঝঞ্ঝাট মেনে নেবার ইচ্ছে নেই।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করল: তোমার পরিচিত কেউ স্টেশনে আসবে কি?

বললুম: কাকতি নিশ্চয়ই আসবে।

নিশ্চয় বলছ কেন?

যে লোক শেষ রাতে স্টেশনে আসতে পারে প্রচুর ভয় নিয়ে, সে যে দিনের বেলায় নির্ভয়ে আসবে তাতে আমার সন্দেহ নেই।

স্বাতি বলল: তখন তুমি তাদের 'বস্' ছিলে।

বললুম: এবারে কেউ না এলে ভাবব যে মানুষ চিনতে আমি শিখি নি, মিথ্যা আমার জীবনবোধ।

অহঙ্কার ভেঙে যাবে তো।

তার চেয়ে দুঃখ পাব বেশি। কেউ এল না বলে নয়, মানুষের আন্তরিকতায় বিশ্বাস হারাবার জন্যই দুঃখ।

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না। আমিও কোন উত্তর আশা করি না।

এক সময় আমাদের ট্রেন কামাখ্যা নামের একটা ছোট স্টেশনে দাঁড়াল। তারপরে আবার চলতে শুরু করল। এর পরেই গৌহাটি স্টেশনে এসে দাঁড়াবে।

এই ট্রেনে কোন যাত্রীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় নি। কামরাটি ছোট বলে কেউ এ কামরায় এসে বসে নি। গাড়ির গতি কিছু মন্থর হতেই যাত্রীদের ব্যস্ততার শব্দ শুনতে পেলুম। বললুম: আমি দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। কেউ এসে থাকলে দেখতে পাব।

বলে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে হাতল ধরে দাঁড়ালুম। ট্রেন খুব ধীরে ধীরে চলছে, একটু পরেই থামবে। প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ। তার মধ্যে পরিচিত কোন মুখ দেখবার আগেই একটা

উল্লাসের শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। হ্যাঁ, কাকতিই দু হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। আর ট্রেনের সঙ্গেই খানিকটা ছুটে এল।

ট্রেন থামতেই আমি নেমে পড়লুম। আজ প্রথম কাকতি আমার পায়ের ধুলো নিল। আর পরক্ষণেই ঢুকে গেল গাড়ির মধ্যে।

শর্মার সঙ্গে ইভাকেও আমি দেখতে পেলুম। ভিড়ের ভিতর থেকে তাঁরা এগিয়ে এলেন। ইভার মুখের হাসি আজ যেন আগের চেয়েও প্রসন্ন দেখাচ্ছে। আমার বিস্ময় দেখে সে বলল: অমন আশ্চর্য হচ্ছেন কেন, কাকতি যে এখন আমাদের দলপতি!

মানে!

সবই শুনতে পাবেন।

বলে সেও গাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আমার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন শর্মা। এই ভদ্রলোক আমার স্টেনোগ্রাফারের কাজ করতেন। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, বেশ নির্ভরযোগ্য। সেবারে তাঁর পরিচয় আমি পেয়েছি, আর শ্রদ্ধা করেছি তাঁকে। কথা না বললে তিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না। তাই আমি তাঁকে প্রশ্ন করলুম: আপনারা কষ্ট করলেন কেন?

শর্মা প্রসন্ন মুখে বললেন: কষ্ট কিসের!

কিন্তু ইভা আমার কথা শুনতে পেয়ে বলল: এ তো আমাদের কাছে আনন্দের ব্যাপার।

কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলার সুযোগ সে পেল না। কাকতি আমাদের সুটকেশ আর বড় ব্যাগটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। তারপরেই স্বাতিকে এগিয়ে দিয়ে আমাদের হোল্ডলটা আনতে গেল।

অনেকগুলো কুলি ঢুকেছিল গাড়িতে। আমি ভেবেছিলুম যে স্বাতি তাদেরই একজনকে ধরে মালপত্র নামাবে। তাই নিশ্চিন্ত ছিলুম। এইবারে বলে উঠলুম: ও কী করছে কাকতি?

বলে চারি ধারে চেয়ে একজন কুলি ধরবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু

সবিস্ময়ে দেখলুম যে স্বাতি তখন অত্যন্ত পরিচিতের মতো ইভার সঙ্গে কথা বলছে: দেখুন তো, কী জবরদস্তি ভদ্রলোকের। কুলিটাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই মালপত্র টেনে নামাচ্ছেন! আর আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আপনার হাতে এ সব ধরিয়ে দিয়েছেন!

কাঁধে হোল্ডল নিয়ে কাকতি বেরিয়ে এসেছিল, বলল: আপনিও দেখছি একই রকম। আপনাদের জন্যে কিছু করলে কি আমাদের হাত ক্ষয়ে যাবে!

কাকতি ঠিক এ রকম ছিল না। তাকে অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তার ভয় ও জড়তা যে কেটে গিয়েছিল তা বুঝতে পেরেছিলুম বিদায়ের দিনে। যথেষ্ট দুঃসাহস নিয়ে সে আমার কন্‌ফারেন্সে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেছিল তার ওপরওয়ালাকে অগ্রাহ্য করে। তার জন্যে তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল কিনা আমি জানি না। এই ফার্মের চাকরিতে আমি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছি কলকাতার বড় অফিসে। যথা সময়ে সবাই জানতে পেরেছে যে আমি আর এখানে ফিরব না। কাজেই তার শাস্তি হয়ে থাকলেও আমি বিস্মিত হব না। হোল্ডলটা প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে কাকতি আমার কাছে এসে বলল: অনুমতি না নিয়েই আপনাদের থাকবার একটা ব্যবস্থা করেছি।

বললুম: কারও বাড়িতে না হলে আমাদের আপত্তি নেই।

কাকতি বলল: তা জানি বলেই আসাম সরকারের টুরিস্ট বাংলোয় একখানা ঘর বুক করে রেখেছি।

বললুম: স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে হলেও আমাদের আপত্তি ছিল না।

শর্মা বললেন: তাহলেই বোধহয় বেশি সুবিধা হবে। একবার দেখে এসো না।

কাকতি বোধহয় এ কথা ভাবতে পারে নি এবং শর্মার পরামর্শটা

মেনে নিয়ে তখনই ছুটে গেল। খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এল বিমর্ষ ভাবে। বলল: অনেকগুলো ঘর আছে, কিন্তু খালি নেই একটাও। খালি হবার সম্ভাবনাও নেই।

স্বাতি বলল: টুরিস্ট বাংলোর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আরও ভাল হবে।

বলেই একটা কুলিকে ধরে বলল: এগুলো মাথায় তুলে নাও তো!

কাকতি আর আপত্তি করল না। সুটকেশ আর হোল্ডলটা কুলির মাথায় তুলে দিয়ে ব্যাগটা নিজের হাতে রেখে বলল: স্টেশন থেকে বেরোলেই টুরিস্ট বাংলো, কোন যানবাহনের দরকার হবে না।

শর্মা বলল: এই মালপত্র একটা রিক্সায় তুলে দিয়ে আমরা হেঁটেই যেতে পারব।

বললুম: হাঁটতে আমাদের ভাল লাগে।

স্বাতি ইভার সঙ্গে কথা বলছিল: আপনাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। আপনাদের সান্নিধ্যে ও খুব সুখে ছিল জানি।

ইভা বলল: আপনাকেও আমি কল্পনা করে নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে এমন তাড়াতাড়ি সম্পর্ক ছেদ করবেন তা ভাবতে পারি নি।

শর্মা ইভার পাশে চলতে চলতে বললেন: খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের জীবনটা পাল্টে দিয়ে গেছেন।

কী রকম?

বলে স্বাতি শর্মার দিকে তাকাল।

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিল ইভা, বলল: ভয় আর দুর্ভাবনায় আমাদের দিন কাটত। এটাই আমরা চাকরির নিয়ম ভাবতাম। কিন্তু এই কাজে যে আনন্দও আছে, তা প্রথম বুঝলাম এঁর সঙ্গে কাজ করে।

স্টেশনের বাহিরে এসে কাকতি একটা রিক্সার উপরে আমাদের মালপত্র তুলে দিল। কিন্তু পকেটে হাত দেবার আগেই স্বাতি একটা টাকা কুলির হাতে দিয়ে বিদায় দিল।

কাকতি বলল : আপনারা ধীরে ধীরে আসুন, আমি এর সঙ্গে আছি।

বলে রিক্সাওয়ালাকে বলল : ধীরে চল।

স্টেশনের সামনেই প্রশস্ত রাজপথ পরিচ্ছন্ন আলোয় ঝলমল করছে। কিন্তু ইভাকে দেখতে না পেয়ে আমি শর্মার দিকে তাকালুম। শর্মা আমার নিঃশব্দ প্রশ্ন বুঝতে পেরে বলল : ইভা এখুনি এসে পড়বে।

তারপরে স্বাতির দিকে চেয়ে বলল : আপনারা এখানে দিন কয়েক থাকবেন তো ?

স্বাতি হেসে বলল : একটা গোটা দিন থাকব।

শর্মা সবিস্ময়ে বললেন : মাত্র এক দিন!

স্বাতি বলল : বন্যার জন্যে বেরোতে আমাদের দেরি হয়ে গেল, তাই ফেরার তাড়া আছে।

শর্মা এর পরেও কিছু শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছেন দেখে বলল : ছুটি ফুরিয়ে যাবে জেনেও আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও আমরা কোথাও থাকব না।

শর্মা বললেন : এখানে কি আপনাদের কোন প্রয়োজন আছে ?

এ প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিলুম : আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাবার ইচ্ছা ছিল।

স্বাতি বলল : আর আমার ইচ্ছা কামাখ্যা মায়ের দর্শনের। অনেক দিন আগে বাবা-মার সঙ্গে এসেছিলাম। সেদিনের কথা এখন ভাল মনে নেই।

ততক্ষণে আমরা টুরিস্ট বাংলোয় পৌঁছে গিয়েছিলুম। বীর বিক্রমে কাকতি রিক্সা নিয়ে পোর্টিকোর নিচে পৌঁছে গিয়েছিল। দোতলা বাড়ি। একটুখানি বারান্দা পেরিয়ে পাশাপাশি ঘর। তারই একটা ঘরে জিনিসপত্র রেখে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কাকতি বেরিয়ে আসছিল। স্বাতি তৎপর ভাবে এগিয়ে গিয়ে রিক্সাওয়ালার

হাতে তার ভাড়া গুঁজে দিল। ঘটনাটা যে এমন তাড়াতাড়ি ঘটবে কাকতি তা ভাবতে পারে নি। একটু দমে গিয়ে বলল : শুধু শুধু আপনি বেশি পয়সা দিলেন!

এ কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি বলল : এখানে চা পাওয়া যাবে?

কাকতি বলল : শুধু চা কেন, যা খেতে চাইবেন তাই পাওয়া যাবে।

বলেই ম্যানেজারের ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল। স্বাতি এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পেল ইভার কাছে। সে বলল : ওকে সামলাতে হবে না। শুধু চায়ের কথা আমি বলে এসেছি।

তার হাতে দুটো খাবারের বাক্স আমি দেখতে পেলুম। কোন দোকান থেকে এই খাবার কিনে সে যে এইমাত্র ফিরল তা বুঝতে আমার অসুবিধা হল না। বললুম : তুমি কি এইজন্যেই আমাদের ছেড়ে গিয়েছিলে!

সহাস্যে ইভা আমাদের ঘরের মধ্যে চলে এল। বলল : বসুন আপনারা। একটু বিশ্রাম করুন। চা এখুনি এসে যাবে।

এক পট চায়ের সঙ্গে দুটো বড় প্লেটও এল। ইভা তার বাক্স খুলে খাবার জিনিস সেই প্লেটে সাজাল। বড় বড় সিঙাড়া আর সন্দেশ। হাতে নিয়েই দেখলুম যে সিঙাড়া সদ্য ভাজা, এখনও বেশ গরম আছে।

স্বাতি ইভাকেও যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করে বলল : সিঙাড়া আর সন্দেশ খেতে তোমারাও কি ভালবাস?

এ কথার জবাব না দিয়ে ইভা বলল : কাছে যা পেলাম তাই নিয়ে এলাম।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অরুণাচলের কথা তুললেন শর্মা, বললেন : তুমি কাজের কথা বলছ না কেন কাকতি?

নিতান্ত লজ্জিত ভাবে কাকতি বলল : সে কি বলার মতো কথা।

প্রথমটায় আমি ঠিক বুঝতে পারি নি, পরে শর্মার কথায় বুঝলাম

যে অরুণাচলের কোন খবর কাকতি সংগ্রহ করতে পারে নি। কিন্তু চেষ্টার কোন ত্রুটি যে করে নি, সে কথাও শর্মা বললেন।

কাকতি বলল : ওরা কোন টুরিস্ট লিটারেচার এখনও বার করতে পারে নি। ইটানগরে ওদের রাজধানী এখনও অসম্পূর্ণ। অরুণাচলের একখানা টুরিস্ট ম্যাপ সংগ্রহের চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু ওদের নিজেদের দরকারী ম্যাপ ছাড়া আর কিছু নেই।

বললুম : প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বোধহয় কিছু প্রকাশ করতে সাহস পায় না।

কিন্তু ইভা বলল : নাগাল্যাণ্ড বা মিজোরাম তো ভয় পায় নি!

শর্মা বললেন : ওদের সঙ্গে অরুণাচলের তুলনা করলে ভুল হবে। নাগা বা মিজো রাজনীতিতে তুটো দল আছে। তাদের একটা আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কাজ করে চলেছে। মাটির ওপরের দল তাদের বিদ্রোহী বলে।

ইভা বলল : ওদের রাজনীতি বুঝবার মতো ক্ষমতা আমার নেই।

এই কথাতেই ইভার স্বামীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। ইভা আমাকে বলেছিল যে বিদ্রোহী নাগারা তার স্বামীকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। কোন গোপন কাজকর্ম করাচ্ছে তাকে দিয়ে। আমার খুবই ইচ্ছা হল তার স্বামীর কথা জানবার। কিন্তু সবার সামনে কোন প্রশ্ন করা উচিত হবে না বলেই মনে হল। বললুম : ওদের রাজনীতি কেউ বোঝে বলে তো মনে হয় না।

এ কথা বলেই ইভার আর একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। তার স্বামীর একখানা চিঠি নাকি মিস্টার বড়ুয়ার হাতে পড়েছিল, আর সেই চিঠি প্রকাশ করে তার ক্ষতি করবেন বলে ভয় দেখাতেন তাকে। এই ভয়েই ইভা মিস্টার বড়ুয়ার অনেক অত্যাচার সহ্য করত। সেদিন তার এই কথায় আমার মনে কোন সন্দেহ জাগে নি। কিন্তু আজ এক অদ্ভুত ভাবনা সহসা আমার মনে এল। বিদ্রোহী

নাগারা যদি কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোন গোপন কাজ করিয়ে নেয়, তার জন্যে তার স্ত্রী কেন দায়ী হবে। আর চিঠিতে এমন কী কথা থাকতে পারে যে ইভা সেই ভয়ে তার বিবেকের বিরুদ্ধে আত্ম-বিক্রয় করতে রাজী হতে পারে!

স্বাতি বলল: রাজনীতির কথা থাক। আপনারা নিজেদের কথা কিছু বলুন।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সুযোগ পেয়ে ইভা কতকটা সহজ হয়ে বলল: আপনি চলে যাবার পরে কাকতি যা করেছে শুনলে আশ্চর্য হবেন।

কাকতি লজ্জিত ভাবে বলল: এ সব কথা কেন!

আমি ইভার দিকে চেয়ে বললুম: খুব মজার কাজ বুঝি!

ইভা বলল: দুঃসাহসের কাজ। লড়াই করে মিস্টার বড়ুয়াকে তাড়িয়েছে গৌহাটি থেকে।

সবিস্ময়ে আমি বললুম: বল কি!

ইভা বলল: বিশ্বাস করতে পারছেন না তো! সত্যিই তাড়িয়েছে।

কিন্তু শর্মা বললেন: লড়াই করে নয়, কাকতি গুপ্তঘাতকের কাজ করেছিল। মিস্টার বড়ুয়ার যত কুকীর্তি জানা ছিল, সব লিখে পাঠিয়েছিল দিল্লীতে কন্‌ফিডেন্সিয়াল মার্কা করে।

ইভা সকৌতুকে বলল: সেই চিঠি কে টাইপ করে দিয়েছিল বুঝেছেন তো!

শর্মা প্রতিবাদ করে বললেন: মিথ্যে কথা। আমি কন্‌ফিডেন্সিয়াল কাজ করি বলে সকলের কন্‌ফিডেন্সিয়াল চিঠি টাইপ করি না।

কিন্তু ইভা হাসতে হাসতে বলল: ভয় পাচ্ছ কেন শর্মাদা, শত্রু তো নিপাত হয়েছে, আর কাকতিকে এখন দলপতি বলেও মেনে নিয়েছ।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল: কাকতি এখন আমাদের ইউনিয়ানের সেক্রেটারি।

লজ্জায় কাকতি মাথা হেঁট করল

স্বাতি বলল : লজ্জা কিসের ?

কাকতি মাথা নিচু করেই বলল : আমি একজন সাধারণ কেরানী ছিলাম বলেই ওঁর স্নেহ পেয়েছিলাম। শুধু আমি কেন, আমরা সবাই। আমরা—

বাধা দিয়ে আমি বললাম : থাক কাকতি।

ইভা বলল : ঠিক কথা। শক্তির কাছে আপনি যে মাথা হেঁট করতেন না, কাকতি তা বুঝতে পেরেছিল।

স্বাতি হেসে বলল : ওঁর মধ্যে ইউনিয়ানের সেক্রেটারি হবার যোগ্যতা ছিল বলেই এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

চা আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে শর্মা বললেন : কাজের কথা তুমি একটাও বলছ না কাকতি। কাল তোমাকে কী করতে হবে জেনে নিয়েছ কি ?

কাকতি বলল : আমাদের কোন সাহায্য কি উনি নেবেন! আমাদের নতুন পাঞ্জাবী ম্যানেজার গাড়িটা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি নিই নি।

আমি বললুম : ইউনিয়ানের সেক্রেটারির কোন ওব্‌লিগেশন নিতে নেই।

কাকতি হঠাৎ মুখ তুলে বলল : আমি নিলেই কি আপনি সেই গাড়িতে উঠতেন!

তার বিষণ্ণ দৃষ্টি হঠাৎ বেদনায় ছলছল করে উঠল। আমি অভিভূত হয়ে বলে উঠলুম : এ কি সাহায্যের চেয়ে অনেক বেশি নয় কাকতি! আমার জন্যে তোমরা যা করেছ, তা কি একটা গাড়িতে উঠলেই শোধ হয়ে যায়! তোমরা কি তা শোধ দিয়ে আমার সঙ্গে সম্পর্ক চোকাতে চাও!

কাকতি এবারে লজ্জা পেয়ে বলল : না না, তা নয়—

তবে! তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা রাখতে চাই বলেই তো আমি তোমাদের খবর দিয়েছি

ইভা তাড়াতাড়ি বলল: আপনি চেয়েছিলেন, আমি শিলঙে বদলি নিয়ে চলে যাই!

বললুম: বলেছিলুম বুঝি!

হ্যাঁ, মিস্টার মর্গান আমাকে ডেকে নিয়েছেন।

কেমন আছেন ভদ্রলোক?

আপনাদের একবার শিলঙে যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে দু দিন থাকতে হবে।

স্বাতি বলল: যদি সময় পাই নিশ্চয়ই যাব।

আমি বললুম: তুমি তাহলে শিলঙ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছ?

ইভা বলল: না। মিস্টার মর্গান আমাকে গৌহাটির কাজ দিয়ে পাঠিয়েছেন।

বলে হাসতে লাগল।

বিদায় নেবার সময় কাকতি বলে গেল: কাল সকালে আবার আসব।

স্বাতি বলল: নিশ্চয়ই আসবেন।

## ৬

টুরিস্ট বাংলোর অফিসে খাতাপত্রে সই করতে এসে কয়েকটা অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়ল। যে সব টুরিস্ট লিটারেচার আমরা পেয়েছিলুম, তার মধ্যে গৌহাটি সম্বন্ধেও সাইক্লোস্টাইল করা কিছু কাগজ ছিল। তাতে স্টেশন রোডের এই টুরিস্ট বাংলোয় খরচ মাথা পিছু বারো টাকা, আর দুজনের উপযোগী ঘর পিছু চব্বিশ টাকা। কিন্তু এখন জানা গেল যে আমাদের বত্রিশ টাকা দিতে হবে, তাতে ব্রেকফাস্টও পাওয়া যাবে। কিন্তু চব্বিশ টাকায় ঘর আর পাওয়া যাবে না। অথচ পুরনো কাগজপত্রই সবার কাছে পাঠানো হচ্ছে।

আর একটি মজার কথা হল যে মর্নিং টির জন্যে পয়সা দিতে হবে, ব্রেকফাস্ট ফ্রী। স্বাতি হেসে বলল: পরশু ভোর পাঁচটায় আমরা চলে যাব। সেদিন তো ব্রেকফাস্ট দিতে পারবেন না, সকালের চায়ের জন্যে কি পয়সা দিতে হবে?

ভদ্রলোক বললেন: তাই তো নিয়ম।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: ভারি মজার ব্যাপার দেখছি! টাইম টেবলে দেখেছিলাম যে ডিমাপুরের জন্যে আসাম মেল ছাড়বে সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিটে, এখানে এসে শুনছি যে সে সময় পাল্টে গেছে। ট্রেন আসে ভোর পাঁচটায়। তার মানে সকালে ভাঁড়ের চা খেয়েই যাত্রা করতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন: না, আমাদের রাতের চৌকিদার আপনাদের সময় মতোই চা দেবে। সময়টা তাকে বলে রাখতে হবে।

এর পরে আর একটা খবর পেয়ে আমরা হতাশ হলুম। টুরিস্ট লিটারেচারে শহর দেখবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এক বন্ধুর

মুখে খবর পেয়ে চিঠি লিখে জেনেছিলুম যে সে রকম ব্যবস্থা আছে এবং একটা ছাপানো প্রোগ্রামও পেয়েছিলুম। কিন্তু এখন শুনলুম যে এই ব্যবস্থা আছে ঠিকই। কিন্তু রোজ নয়। বুধ আর শুক্রবার বাস ছাড়ে সকাল সাড়ে সাতটায়। প্রথমে কামাখ্যার মন্দির, তার পরে পাহাড়ের চূড়ায় ভুবনেশ্বরীর মন্দির। পাহাড় থেকে নেমে মিউজিয়াম এম্পোরিয়াম দেখে নেহরু স্টেডিয়াম হয়ে গান্ধী মণ্ডপে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করে পল্টন বাজারের ভেতর দিয়ে পানবাজারে পৌঁছবে সোয়া বারোটায়। লাঞ্চ সেরে একটায় আবার যাত্রা শুরু। স্টেট জু দেখে নতুন রাজধানীর ভিতর দিয়ে বশিষ্ঠাশ্রম। তারপর সরাই ঘাটের পুল থেকে সূর্যাস্ত দেখে বিকেল পাঁচটায় টুরিস্ট লজে পৌঁছবে। হ্যাঁ, টুরিস্ট বাংলো ও টুরিস্ট লজ দুটো শব্দেরই ব্যবহার আছে। গাড়ি ভাড়া বোধহয় মাথাপিছু পনের টাকা, কিন্তু তার উল্লেখ নেই। এই গাড়ি যে রোজ চলে না, তারও কোন উল্লেখ নেই। স্বাতির মন্তব্যে ভদ্রলোক কিছু লজ্জা পেলেন, কিন্তু আমাদের তাতে সুরাহা হল না। আরও কিছু যাত্রী ছিলেন, তাঁরাও নিরাশ হলেন

বেড়ানোর প্রসঙ্গ ছেড়ে স্বাতি এই বারে প্রশ্ন করল : রাতের আহার কী পাওয়া যাবে?

এর উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন : অর্ডার দিয়েছেন?

স্বাতিও এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল : কিছু তৈরি থাকে না বুঝি।

না।

তারপরে ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন : অর্ডার দিলে তৈরি করে দেওয়া সম্ভব। কী খাবেন?

চিকেন।

ভদ্রলোক বললেন : ডিম ছাড়া এখন আর কিছু তৈরি করা সম্ভব নয়।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতেই বললুম: চল, আজ রাতে আমরা বাইরে খেয়ে নেব।

সেই ভাল।

বলে স্বাতি ঘরে ফিরে এল।

যথা সময়ে দরজায় তালা দিয়ে আমরা খেতে বেরোলুম। তার হাতে এক গোছা ছাপানো কাগজ দেখে বললুম: ও সব কী সঙ্গে নিলে?

স্বাতি বলল: গৌহাটিতে কাল আমরা কী দেখব তা আজই ঠিক করে ফেলব।

টুরিস্ট বাঙলো থেকে রেলওয়ে স্টেশন এত কাছে যে আমরা কোন অপরিচিত জায়গায় না গিয়ে স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রূমে চলে এলুম। স্বাতি বলেছিল যে রেলের ওয়েস্টার্ন স্টাইলের ডিনার চলনসই খাবার। কিন্তু শুনে হতাশ হতে হল যে এখানে আমিষ ও নিরামিষ খানা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। আমিষ বলতে মাংস আর ডিম। মাছ পাওয়া যায় সকালের দিকে। কিন্তু কী মাছ তা সন্দেহজনক। অনেক জায়গাতেই আজকাল রুই মাছ বলে বোয়াল বা আড় মাছ দেয়। অবাঙালী বেয়ারারা সব মাছকেই রোহু বলে।

স্বাতি বলল: মাংস তো দাঁত দিয়ে ছেঁড়া যায় না, নিরামিষই ভাল। তবে ভাতের বদলে রুটি চাই।

এদিকে রুটির চল বোধহয় খুব কম। তাই বেয়ারা বলল: একটু সময় লাগবে।

আপত্তি নেই। বলে স্বাতি টেবিলে বসে টুরিস্ট লিটারেচারের পাতা ওল্টাতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বলল: খবর সবই গতানুগতিক। গোটা কয়েক দিশী ও বিদেশী স্টাইলের হোটেলের নাম আর কিছু দর্শনীয় স্থান।

বললুম: দর্শনীয় স্থানের নাম পড়।

স্বাতি বলল : আসাম স্টেট জু, বশিষ্ঠ আশ্রম, গৌহাটি অয়েল রিফাইনারি, জনার্দন মন্দির, কামাখ্যা মন্দির, নবগ্রহ ও উমানন্দ মন্দির।

বললুম : এদের বর্ণনাও পড়।

স্বাতি বলল : জু-এ প্রবেশের ফী তিরিশ পয়সা, শিশুদের পনের। বশিষ্ঠ আশ্রম বারো কিলোমিটার দক্ষিণে। অয়েল রিফাইনারি ও জনার্দন মন্দির শহরের মাঝখানে, কামাখ্য মন্দির দশ কিলো-মিটার দূরে পাণ্ডু রোডে। নবগ্রহ ও উমানন্দ মন্দির গৌহাটি কোর্টের উল্টো দিকে ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে পিকক আইল্যাণ্ডে।

দুটো মন্দিরই সেখানে!

স্বাতি বলল : লেখার ধরন দেখে তাই তো মনে হচ্ছে।

আর কিছু খবর নেই?

পাতা উল্টে স্বাতি বলল : কণ্ডাক্টেড টুরের খবর আছে। প্রতি শনিবার কাজিরঙ্গা ও মালম। পরদিন ফেরা। ভাড়া একশো টাকা, বারো বছরের কম হলে কাজিরঙ্গায় পঁচাত্তর ও মালমে আশি টাকা, খাওয়া থাকা দেখার খরচ সমেত।

কোন বর্ণনা?

নেই।

তার পরেই বলল : আর একখানা কাগজ আছে। কাজিরঙ্গার মিনি-বাস, টুরিস্ট লজ থেকে ছাড়ে শনিবার দুপুর বারোটায়, পৌঁছয় বিকেল পাঁচটায়। তারপর রবিবার প্রাতরাশের পর বেরিয়ে রবিবার বিকেল চারটেয় গৌহাটি পৌঁছয়। ১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলবে। ভাড়া দিলে যাত্রীরা অ্যামবাসাডার গাড়ি স্টেশন-ওয়াগন বা মিনি-বাসও পেতে পারেন। কিন্তু—হ্যাঁ, এতে মালমের কোন উল্লেখ নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম : অনেক খবর পাওয়া গেল।

স্বাতি হেসে বলল : কেন, কী খবর পেলে না বলে দুঃখ হচ্ছে?

আমিও হেসে বললুম : সেবারে এখানে থেকে যেটুকু জেনেছিলুম, তোমার কথায় তাও গুলিয়ে যাচ্ছে।

যেমন ?

ব্রহ্মপুত্রের মাঝে উমানন্দ পাহাড়ে শুধু উমানন্দ শিবের মন্দিরই আছে জানি। আর যে জ্যোতিষ চর্চার জন্য পুরাকালে এই স্থানের নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, শহরের পূর্বে চিত্রাবল পাহাড়ের নবগ্রহ মন্দির সেই কথাই আজও স্মরণ করিয়ে দেয়।

তবে এ রকম করে লেখা হয় কেন ?

বললুম : একটু অপেক্ষা কর। অয়েল রিফাইনারি ও জনার্দন মন্দির তুমি এক নিঃশ্বাসে পড়েছিলে। কিন্তু এ দুটি জায়গার দূরত্ব কম নয়। শুক্রেশ্বর ও জনার্দন মন্দির শহরেই ব্রহ্মপুত্রের তীরে, কিন্তু অয়েল রিফাইনারি তো শুনেছিলুম শহরের মিউনিসিপালিটির বাইরে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ছাড়িয়ে। ট্রেনে ডিমাপুরে যাবার পথে চোখে পড়ে।

এর পরেই আমাদের খাবার এল। খেতে খেতেও দু-একটা কথা হল গৌহাটি সম্বন্ধে। স্বাতি বলল : টুরিস্ট লিটারেচারের কথা থাক। সেবারে তোমার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বল।

বললুম : শহর সম্বন্ধে সেবারে যে ধারণা হয়েছিল তাই তোমাকে বলি। ব্রহ্মপুত্র নদী শহরের উত্তরে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। শহরের মিউনিসিপাল এরিয়া ছোট, কিন্তু গ্রেটার গৌহাটি বেশ বড়। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরেও একটা বড় এলাকাকে নর্থ গৌহাটি বলে।

স্বাতি বলল : ওপারে কি স্টিমারে যেতে হয় ?

বললুম : আগে পাণ্ডু আমিনগাঁওএর মধ্যে ফেরি স্টিমার ছিল। এখন পুল হয়েছে। তার নাম বোধহয় সরাই ঘাট পুল। বিকেলে এই পুলের ওপরে দাঁড়িয়ে নাকি মনে হবে যে নদীর মধ্যেই সূর্যাস্ত হচ্ছে।

তারপর ?

গৌহাটির এয়ার পোর্টের নাম বোরঝাড়। এটি শহরের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে বাইশ কিলোমিটার দূরে। যে ন্যাশনাল হাইওয়ে গোয়ালপাড়ার দিকে গেছে, তারই ধারে এই এয়ার পোর্ট। এই পথের ধারেই গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ-ঈস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলের হেড কোয়ার্টার মালিগাঁও। একটা ম্যাপ থাকলে দেখাতে পারতুম যে ন্যাশনাল হাইওয়ে উত্তর থেকে ব্রহ্মপুত্রের পুলের উপর দিয়ে এপারে এসে শিলঙের দিকে গেছে, তার থেকেই একটি শাখা মালিগাঁওএর কাছ থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও এয়ার পোর্টের সামনে দিয়ে গোয়ালপাড়ার দিকে চলে গেছে। এই পথটি মেঘালয়ের শহর তুরায় পৌঁছেছে।

স্বাতি বলল : কামাখ্যার মন্দির কোন্ দিকে ?

বললুম : শহর থেকে যে পথ এয়ার পোর্টের দিকে এসেছে, তারই ধারে নীলাচল পাহাড়। নিচে থেকে মোটরের পথ পাহাড়ের ওপরে উঠেছে ঘুরে ঘুরে।

আর ?

নতুন রাজধানী গড়ে উঠেছে শহরের দক্ষিণে ডিসপুরে। চিড়িয়াখানা ছাড়িয়ে ডিসপুর, তারপর শিলঙের পথ পেরিয়ে বশিষ্ঠাশ্রম।

স্বাতি বলল : আজ এই পর্যন্তই থাক। এর বেশি বললে আর মনে রাখতে পারব না।

আমি হেসে বললুম : এর বেশি আমার জানাও নেই।

ফেরার পথে আমরা সকালের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেললুম। প্রথমে কামাখ্যার মন্দির, তারপর বশিষ্ঠাশ্রম। বিকেলের দিকে শহরটা দেখা যাবে।

কিন্তু সকালে এই প্রোগ্রাম পালটে গেল। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা যখন বেরোবার কথা ভাবছি, ঠিক সেই সময়েই কাকতি হুড়মুড় করে এসে পড়ল। বলল : যত সব বাজে কাজে খুব দেরি

হয়ে গেল। মানুষ বোঝে না যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই তো আমি এখানে আছি। অথচ আপনারা কাল এখানে থাকবেন না। আর একটু দেরি হলে কি আজ আপনাদের ধরতে পারতাম!

আমি হেসে বললুম: গৌহাটিতে আমি তো নতুন নই, আর সেবারে প্রায় সবই তোমার সঙ্গে দেখেছিলুম।

কিন্তু একটা গাড়ি পেলে আপনাদের স্থবিধে হত। দেখি কী করতে পারি!

বলেই কাকতি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল: টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্টের প্রায় সব গাড়িই আজ অচল। শুধু একখানা স্টেশন-ওয়াগন কোন সাহেবের বাড়ি যাচ্ছে। চিড়িয়াখানার দিকে বাড়ি। চলুন, চিড়িয়াখানাটাই আগে দেখে নিই।

স্বাতি বলল: চিড়িয়াখানা!

হ্যাঁ, এখানকার চিড়িয়াখানার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। সব জন্তুজানোয়ারকে স্বাভাবিক পরিবেশে ছেড়ে রাখা হয়েছে। ঠিক এরকমটি আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আর আমি কাকতিকে বললুম: তুমি অফিসে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, এ ভাল হয় না।

কাকতি বলল: কিন্তু আমি যে ছুটি নিয়েছি!

বললুম: ছুটি নিলে কি অফিসে যাবার বাধা আছে! না না, সে হয় না।

কিছু দমে গিয়ে কাকতি বলল: ইভা ঠিকই বলেছে। তাই সে বিকেল বেলায় আপনাদের কাছে আসবে।

এই সময়েই একজন এসে খবর দিলেন যে গাড়ি বেরিয়েছে। আর চুপিচুপি কাকতিকে যা বললেন তাও শুনতে পেলুম। ড্রাইভারকে গোটা পাঁচেক টাকা দিলে আমাদের চিড়িয়াখানার গেটেই পৌঁছে দেবে।

কাকতি বলল : টাকা আবার কেন!

ভদ্রলোক বললেন : একটু ঘুরতে হবে তো, তাই পেট্রোলের দাম চাইছে।

আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

বলে কাকতি আমাদের নিয়ে গিয়ে একটা স্টেশন-ওয়াগনে তুলে দিল। বলল : অফিসের পরে আমি আবার আসব।

বললুম : নিশ্চয়ই এসো। ফিরতে দেরি হলে একটু অপেক্ষা কোরো।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে গেল।

## ৭

শহরের পথে প্রথমেই যা চোখে পড়ল তা এই শহরের নাম। দোকানের সাইন-বোর্ডে লেখা গুয়াহাটি। সংস্কৃত গুবাক শব্দ থেকে গুয়া, তার মানে সুপারি। এই শব্দটি উত্তরবঙ্গে প্রচলিত দেখেছি। একদা এই স্থানে গুয়ার হাট ছিল বলেই বোধহয় গুয়াহাটি নাম হয়েছিল। গুয়াহাটি থেকেই গৌহাটি। মনে হল যে পুরনো নামটি আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে। গুয়াহাটি নাম অসমীয়া অক্ষরে লেখা, ইংরেজীতে গৌহাটি শব্দটি বর্জিত হয় নি।

স্টেট জু খুব বেশি দূরে নয়, শহরের উপকণ্ঠে টিলার মতো একটি নিচু পাহাড়ের উপরে এটি অবস্থিত। সরকারী গাড়ি আমাদের এই চিড়িয়াখানার দরজায় নামিয়ে দিল।

ড্রাইভারের হাতে স্বাতি পাঁচটি টাকা দিতেই সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। চিড়িয়াখানার প্রহরীকে ডেকে বলল: এখান থেকে এঁরা বশিষ্ঠাশ্রমে যাবেন, একটা অটো ধরে দিও।

বলে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

চিড়িয়াখানার গেট তখনও বন্ধ ছিল। মিনিট পাঁচেক পরে ঠিক আটটার সময়ে টিকিট পাওয়া গেল। মাথা পিছু পঞ্চাশ পয়সার টিকিট। শিশুদের জন্যে পনের পয়সার। ক্যামেরা নিয়ে ভিতরে ঢুকতে হলে আরও এক টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। মুভি ক্যামেরার দক্ষিণা বেশি।

গেট দিয়ে ঢুকেই পথের ধারে একটি মস্ত বড় বোর্ডে পুরো চিড়িয়াখানার নক্সা। দু ধার দিয়ে দুটি সমতল পথ আর মাঝখানের পথটি উঠেছে টিলার উপরে। চিড়িয়াখানার প্রধান দ্রষ্টব্য হল

গণ্ডার, তারা আছে প্রায় শেষ প্রান্তে। সাদা বাঘ সিংহ ও আরও অনেক জীবজন্তু আছে প্রাকৃতিক পরিবেশে। সমস্ত চিড়িয়াখানাটা ঘুরে দেখতে বেশ কিছু সময় লাগবে মনে হতেই স্বাতি বলল: এখানে দেরি করলে চলবে না। বশিষ্ঠাশ্রম দেখে কামাখ্যার মন্দিরে যেতে হবে।

বললুম: যতক্ষণ ভাল লাগে ততক্ষণই দেখব।

বলে আমরা দ্রুত পায়ে ডান দিকের সমতল পথ ধরে এগিয়ে গেলুম। ঠিক করলুম যে শেষ প্রান্তের দর্শনীয় জীবজন্তু দেখে মাঝ-খানের উঁচু পথ ধরে নিচে নেমে আসব। তার জন্য দরকার হলে অন্য পথটি বাদ দেব।

একটুখানি এগিয়েই নজরে পড়ল যে অনেকটা তফাতে আর একটা পাহাড়ের গায়ে অনেক ঘরবাড়ি। মালিদের জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে ওটা গৌহাটির মেডিকেল কলেজ। একটি ভিন্ন পথ ঐ পাহাড়ে উঠেছে।

কয়েকটি বাচ্চা হাতির দেখা পেলুম আরও খানিকটা এগিয়ে। তারা ঘাস পাতা খাচ্ছে আর একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পাশে। সব জায়গায় জন্তুজানোয়ার নেই, শূন্য পড়ে আছে অনেক স্থান। এক জায়গায় ফুলের চাষও হচ্ছে। এমনি করে দেখতে দেখতেই আমরা গণ্ডারের কাছে পৌঁছে গেলুম।

নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দু-তিন জায়গায় গণ্ডার আছে। ভারী আশ্চর্য জীব। হৃষ্টপুষ্ট দেহে মাথাটা যত বড়, পা চারটি সেই তুলনায় নিতান্তই ছোট। দেহের চামড়া এত পুরু ও শক্ত যে এক সময় তা দিয়ে ঢাল তৈরি হত যুদ্ধের জন্যে। নাকের উপরে একটি বা দুটি খড়্গ। উত্তরবঙ্গ আসাম নেপাল ভুটান থেকে পূর্বে ব্রহ্মদেশ মালয় ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে গণ্ডার দেখা যায়, তাদের নাকে একটি খড়্গ। আফ্রিকার সাদা গণ্ডার আকারেও বড়, আর তাদের নাকের উপরে দুটি খড়্গ। এদের চোখ খুব ছোট, আর দৃষ্টিশক্তিও

ক্ষীণ, কিন্তু ঘ্রাণ ও শ্রবণের শক্তি খুব প্রখর। স্তন্যপায়ী ও উদ্ভিদ-ভোজী নিতান্ত নিরীহ প্রাণী এরা। কিন্তু আক্রমণ করলে বা এদের বাচ্চাকে ধরবার চেষ্টা করলে ভীষণ হিংস্র হয়ে ওঠে। এরা তাদের ভারি দেহ নিয়ে এঁকে বেঁকে ছুটতে পারে না বলে এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা কঠিন নয়।

স্বাতি বলল : গণ্ডার যখন এখানেই দেখতে পাওয়া গেল, তখন আর কাজিরঙ্গায় যাবার প্রয়োজন নেই।

হেসে বললুম : কলকাতার চিড়িয়াখানাতেও গণ্ডার আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে তার আকর্ষণ অন্য রকম।

কিন্তু একে ঠিক প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা চলে না।

সেইজন্যেই তো যাত্রীরা উত্তরবঙ্গের জল্‌দাপাড়া বা আসামের কাজিরঙ্গায় যায় গণ্ডার দেখতে।

ফেরার পথে আমরা আরও অনেক জন্তুজানোয়ার দেখলুম। বাঘ আর সাদা বাঘ আছে খাঁচার মধ্যে। দূর থেকেই তাদের গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু সিংহের পরিবেশ অনেকটা প্রাকৃতিক। বনের বাইরে তারা রোদ পোহাচ্ছিল। নিচে গভীর খাদ। আর তারই ধার ঘেঁষে বিরাট উঁচু দেওয়াল উঠেছে। জল আছে এই খাদে। ধাপে ধাপে তারা নিচে নেমে যেতে পারে, কিন্তু পাঁচিল টপকে এপারে আসা একেবারেই অসম্ভব। দূর থেকে দেখে মনে হয় যে এরা বড় স্বচ্ছন্দে আছে।

আমাদের সময় সীমিত বলে খুঁটিনাটি দেখার চেষ্টা না করে আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। তাতেও প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় লাগল। কিন্তু বাহিরে এসে পুলকিত হলুম। অটো রিক্সায় চেপে এক দম্পতি এসে চিড়িয়াখানার গেটে নেমেছিলেন। প্রহরী তাকে আটকেছিল। সাত টাকায় আমাদের বশিষ্ঠাশ্রমে পৌঁছে দেবে, তার কমে যাবে না। স্বাতি আর দেরি না করে নিজে উঠে বসেই আমাকে তার পাশে ডেকে নিল।

শহর থেকে আমরা দক্ষিণে এসেছিলুম, এবারেও দক্ষিণে চললুম। ডিসপুর নামে নতুন রাজধানীর এক প্রান্ত ঘেঁষে এই পথ শিলঙের প্রশস্ত রাজপথ পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। দু ধারে ঘর বাড়ি। মিলিটারি হাসপাতাল। তারপরে পথ আর মসৃণ নয়। রুক্ষ পাথুরে পথের উপর দিয়ে অটো রিক্সা খুব সাবধানে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল পাহাড়ের একেবারে পাদদেশ পর্যন্ত। তারপরে একটি প্রশস্ত জায়গায় এসে থামল।

এইখানে দুখানা বাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। গৌহাটি শহর থেকে সরাসরি এখানে এসেছে। একখানা বাস ছেড়ে যাচ্ছে, আর একখানা থাকবে। স্বাতি এগিয়ে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এল যে ফেরার কোন ভাবনা নেই। আমরা সব কিছু দেখে শুনে এসে ফেরার বাস পেয়ে যাব। নিশ্চিন্ত হয়ে অটো রিক্সাকে আমরা বিদায় দিলুম।

মন্দিরের দিকে এগিয়ে স্বাতি বলল: তুমি তো বশিষ্ঠাশ্রম দেখে গিয়েছিলে!

বললুম: কাকতির সঙ্গে এক শনিবারের দুপুরে এখানে এসেছিলুম। এখানকার পৌরাণিক কাহিনী তারই কাছে শুনে কামরূপ পর্বে লিখেছি।

স্বাতি এই পৌরাণিক কাহিনী শুনতে চাইল না। সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের চত্বরে উঠে এল। পায়ের চটি বাইরে খুলে রেখে আমরা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলুম। বহু যাত্রী আনাগোনা করছে। তাদের মধ্য দিয়ে স্বাতি এগিয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের মন্দির। ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষির অন্যতম, সূর্যবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠ রাজা নিমির শাপে বিদেহী হয়ে এইখানে তপস্যা করেছিলেন সত্যযুগে। এই মন্দিরে তাঁর পায়ের চিহ্ন নাকি বিদ্যমান। আর গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি শিলাচিহ্ন আছে তাঁর পত্নী অরুন্ধতীর। এই পুণ্যাত্মা ঋষির কথা আজ কেউ জানতে চান না। আজ যে যাত্রীরা এখানে আসেন তাঁরা আসেন এই সুন্দর অরণ্যময়

পাহাড়ী পরিবেশে ততোধিক সুন্দর একটি ঝর্ণার পাশে বসে চড়ুই-ভাতি করতে। বশিষ্ঠাশ্রম এখন গৌহাটির একটি জনপ্রিয় পিকনিকের স্থান। প্রতিদিন নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। আর ছুটির দিনে আসে অগণিত মানুষ। তাদেরই কেউ কেউ এই মন্দিরে প্রবেশ করে স্বাতির মতো। ব্রাহ্মণেরা ঘোরাঘুরি করেন। তাঁদের এখানে বসবাসের ব্যবস্থা আছে। যাত্রী পেলে অনেক কথা বলেন তাঁদের। এই অঞ্চলে মন্দির স্থাপত্যের একটি বিশেষ রীতি আছে। মন্দিরের শিখরটি কতকটা গম্বুজের মতো। ব্যাসের চেয়ে উচ্চতা কিছু বেশি। কিন্তু তার গাত্র মোগল আমলের গম্বুজের মতো সাদামাঠা নয়। একের পর এক খাঁজ-কাটা বৃত্ত নিচে থেকে উপর পর্যন্ত উঠে গেছে, তার উপরে কলস। এরই সঙ্গে সংলগ্ন একটি নাটমন্দিরের মতো দালান। স্বাতি বেরিয়ে এসে এক নজরে এ সব দেখে নিয়েই আমাকে বলল : এসো।

বলে উপরের দিকে এগিয়ে গেল। একটি প্রশস্ত চত্বরের উপরে বহু স্ত্রী পুরুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। তারা নানা কাজে ব্যস্ত, সারা দিন এখানে কাটাবে বলে এসেছে। বশিষ্ঠ গঙ্গা নামের সুন্দর ঝর্ণাটি পাহাড় থেকে এই দিকেই নেমেছে। একটি ঝর্ণা। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্বাতি বলল : তোমার কাছে যেন শুনেছি যে বশিষ্ঠ গঙ্গা এখানে ত্রিধারায় প্রবাহিত।

বললুম : হ্যাঁ, তাদের নাম সন্ধ্যা ললিতা ও কান্তা।

কিন্তু ধারা তো একটিই দেখছি।

মনে হয় একটি। কিন্তু আসলে তিনটি ধারা। ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে।

স্বাতি আরও ভাল করে লক্ষ্য করে বলল : উঁহু, ঝর্ণা একটিই। এই সব বিক্ষিপ্ত পাথরের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত হচ্ছে বলেই তিনটি ধারা কল্পনা করা হয়েছে।

একটু নিচের দিকে এই ত্রিধারার উপরে একটি পাকা পুল আছে।

আমরা এই পুলের উপর নেমে এলুম। পাশাপাশি তিনটি ধারা দেখা যাচ্ছে। বড় বড় পাথরে পা রেখে রেখেও এই ঝর্ণা পার হওয়া যায়। অনেক মেয়ে পুরুষ স্নান করছে। অপ্রশস্ত ধারা বলে এক সঙ্গে অনেকে জলে নামতে পারে না। একজনের পরে আর একজন নামে সাবধানে। লোভ হয় স্নান করবার। কিন্তু আড়াল আবডাল নেই বলে সঙ্কোচও হয়। স্বাতি বলল : চলে এসো।

মন্দিরের ধার ঘেঁষে আমরা নেমে এলুম। জুতো পায়ে দিয়ে চলে এলুম বাস স্ট্যাণ্ডে। ছোটখাট দোকানপাট আছে কয়েকটা। পূজার উপকরণ পাওয়া যায়, পান সিগারেট।

একটা বাস দাঁড়িয়ে ছিল। দু-একজন করে যাত্রী উঠছিল সেই বাসে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, গৌহাটি শহরে যাবে। পানবাজার। সেখান থেকে অন্য বাস ধরে কামাখ্যা পাহাড়। আদালতের স্টপে নামলে ব্রহ্মপুত্রের খেয়া ঘাটে গিয়ে উমানন্দ পাহাড় দেখা যায়, কিংবা শুক্রেশ্বর জনার্দনের মন্দিরের সামনেও নামা যায়। কিন্তু কামাখ্যার বাস কোথা থেকে ছাড়ে ঠিক বোঝা গেল না।

স্বাতি বলল : বাস তো পাহাড়ের উপরে উঠবে না। আর বাস নয়। গৌহাটি থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়েই আমরা কামাখ্যা দেখে আসব।

সেই ভাল।

বলে আমি বাসের দিকে এগিয়ে গেলুম।

ছোট বাস, মুখোমুখি দু লাইন বসবার জায়গা। মাঝখানটা ফাঁকা। বাসের বাহিরের চেহারার মতো ভিতরের অবস্থাও ভাল নয়। তবু আমরা বসে গৌহাটি ফিরতে পারব ভেবে খুশী হয়ে উঠলুম। নির্দিষ্ট সময়ে বাস ছাড়ল।

ভিন্ন পথে আমরা গৌহাটি শহরে ফিরলুম। এই পথ এসেছে আসামের নূতন রাজধানী ডিসপুরের উপর দিয়ে। শুধু অফিস নয়,

রাজকর্মচারীদের জন্য ঘর বাড়িও তৈরি হয়েছে। শহরের কোথায় আমরা নামব, তা স্বাতিই স্থির করল। বলল: শুক্রেশ্বর জনার্দনের মন্দিরের সামনেই নামা যাক।

সমস্ত শহরটা পরিক্রমা করে ব্রহ্মপুত্রের ধারে পৌঁছবার আগে এই মন্দির রাজপথের ধারেই। বাস থেকে নেমে পথের অন্য ধারে মন্দিরের গেট। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে জনার্দনের মন্দির। শুক্রেশ্বর শিবের মন্দির একটি ছোট টিলার উপরে। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে এই মন্দিরে উঠতে হয়। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এই শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে তাঁর নাম শুক্রেশ্বর। অনেকে শুক্লেশ্বরও বলেন।

এই মন্দিরের স্থাপত্য ঠিক বশিষ্ঠাশ্রমের মতোই। একই রকমের আকার ও আকৃতি। স্বাতি খুব তাড়াতাড়ি প্রণাম করে ফিরে এল। বলল: বেলা অনেক হয়েছে। আর দেরি করলে কামাখ্যার মন্দির হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।

বললুম: এই পাহাড়ের পিছনে ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটি বুদ্ধের মূর্তি আছে।

স্বাতি বলল: এখন থাক।

কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে আমরা কোন যানবাহন দেখতে পেলুম না। এই এলাকার নাম পানবাজার, কিন্তু বাস বা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড কত দূরে তা বোঝা গেল না। একটুখানি এগিয়ে প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র চোখের সামনে সুবিস্তৃত দেখলুম। রাজপথের ডান ধারে নদী, বাঁ ধারে বড় বড় বাড়ি ঘর আছে দূরে দূরে। একটা গাছের নিচের ঘন ছায়ায় কয়েকটা রিক্সা দেখতে পেয়ে তাদের অনুরোধ করলুম বাস কিংবা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দিতে। কিন্তু কেউই রাজী হল না, বলল: এটুকু পথ নাকি আমরা হেঁটেই চলে যেতে পারব।

এই পথ দিয়ে বাস যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু স্বাতি আর বাসে উঠতে রাজী হল না। তার বদলে সে একটি মোটর গাড়ির চালককে

ট্যাক্সির কথা জিজ্ঞাসা করল। ভদ্রলোকের পাশে একজন মহিলাও ছিলেন। তিনি বললেন: আসুন, আপনাদের পৌঁছে দিচ্ছি।

আমি একটু ইতস্তত করেছিলুম, কিন্তু স্বাতি স্বচ্ছন্দে পিছনের দরজা খুলে উঠে বসল। আর আমাকেও ডেকে নিল পাশে। তারপরে বলল: অচেনা মানুষকে এখনও আপনারা গাড়িতে তুলে নিচ্ছেন, কিন্তু কলকাতায় সবাই সাহস পায় না।

ভদ্রলোকে গাড়ি চালাতে শুরু করে বললেন: আপনি একা হলে আমিও ইতস্তত করতাম।

কিন্তু তাঁর পাশের মহিলা বললেন: আমি থাকতে তোমার ভয় কী!

আমি বললুম: ভয় নানা রকমের। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ছেলেরা আজকাল ডাকাতিও করছে।

খানিকটা ঘুরে ফিরে তাঁরা আমাদের একটি জনবহুল বাজারের মধ্যে পৌঁছে দিলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের বিদায় দিলুম।

অনেকগুলো ট্যাক্সি এখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যাত্রীর অপেক্ষা করছে। সবাই কামাখ্যার মন্দিরে পৌঁছে দিতে রাজী। ভাড়া বারো টাকা, যাতায়াতে পঁচিশ, আধঘণ্টা অপেক্ষা করবে। স্বাতি বলল: আমাদের শুধু পৌঁছে দিতে হবে।

তারা বলল: ফেরার সময় কিন্তু বেশি ভাড়া লাগবে।

তা লাগুক।

বলে স্বাতি একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। আমি উঠলে বলল: মায়ের দর্শনে যাচ্ছি, ফেরার জন্যে তাড়াহুড়ো করব না।

এই বাজার থেকে বেরিয়ে আমরা আবার ব্রহ্মপুত্রের ধারে এসে পৌঁছলুম। ডান হাতেই দেখলুম একটা মস্ত বড় বাস স্ট্যাণ্ড। সমস্ত দূরের বাস নাকি এইখান থেকেই ছাড়ে। আমরা চললুম পশ্চিম মুখো। বুঝতে পারলুম যে ব্রহ্মপুত্রের ধার দিয়ে এই পথ পূর্ব থেকে

পশ্চিমে বিস্তৃত। পূর্ব প্রান্তে শুক্রেশ্বর দেখেছি, এইবারে পশ্চিমের দিকে চলেছি পাণ্ডু রোড ধরে।

যে পাহাড়ের উপরে কামাখ্যার মন্দির, তার নাম নীলাচল। উড়িষ্যার পুরীকেও নীলাচল বলে। কিন্তু সেখানে কোন পাহাড় নেই, সমতল ভূমির উপরেই মন্দির। শহর থেকে যে সব বাস যাতায়াত করে, তা নীলাচল পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়ায়। তারপর পায়ে হেঁটে উঠতে হয়। বাস স্ট্যাণ্ডে ট্যাক্সিও দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা পিছু এক টাকা নিয়ে উপরে মন্দিরের প্রাঙ্গণের কাছে পৌঁছে দেয়। কিন্তু আমাদের থামতে হল না, আমরা সরাসরি পাহাড়ী পথ ধরে উপরে উঠে এলুম।

শহর থেকে মাইল পাঁচেক পথ। কিলোমিটারের হিসেবে আট। কিন্তু সরকারী পুস্তিকায় আট ও দশ কিলোমিটার দুরকমই দেখানো আছে, কিন্তু তা কোনখান থেকে তার উল্লেখ নেই। ট্যাক্সি থেকে নেমে আমরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলুম।

একজন ব্রাহ্মণ বালক আমাদের আগে আগে চলল। পূজো করব কিনা জিজ্ঞাসা করল। শুধু দর্শন করব শুনে কুণ্ডের জল এনে মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে যাত্রীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে দিল।

গত বারে এখানে এসে আমাদের লাইনে দাঁড়াতে হয় নি, সরাসরি ভিতরে ঢুকতে পেরেছিলুম। এখানে এই ভাবে দাঁড়িয়ে আমার তিরুপতির কথা মনে পড়ে গেল। সে রকমের লাইন ভারতের আর কোথাও দেখি নি। কলকাতায় খেলার মাঠে টিকিটের জন্যে বড় বড় লাইন হয়, মারামারি পর্যন্ত হয়। কিন্তু তিরুপতির মতো ব্যবস্থা কোথাও হয় নি। সেখানে পয়সার খেলা। বিনে পয়সায় যারা দেবতার দর্শন চায় তারা দাঁড়িয়ে থাকে, কম পয়সার টিকিট ক্রেতারা এগিয়ে যায়। আবার তাদেরও খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করে বেশি পয়সার টিকিট ক্রেতারা দেবতার দর্শন করে বেরিয়ে আসে। যারা পাঁচশো হাজার টাকা খরচ করে, তাদের জন্যে কোন বিধিনিষেধ নেই, তারা

মন্দিরের সর্বত্র যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারে। অনেক সময় ব্যয় করে অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে মন্দিরে ঢোকবার পরে দেবতার সামনে কয়েক সেকেণ্ড বেশি দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই গলাধাক্কা খেতে হয়। সুব্যবস্থার নামে তিরুপতির মতো লাইন এখন অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। কিন্তু যাত্রীদের সৌভাগ্য যে টিকিট কাটতে হচ্ছে না। ভিতরে সংকীর্ণ স্থান বলেই এই লাইন। এখানে লাইন দীর্ঘ নয় বলেই বেশিক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হল না। মন্দিরের ভিতরে ঢুকে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে হল, দরজা বন্ধ হয়ে গেল মন্দিরের।

কিন্তু ভিতরে যে অনেক বেশি যাত্রী ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি নি। দেবীর কাছে পৌঁছবার জন্যে দীর্ঘ লাইন সাপের মতো এঁকে বেঁকে শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে। পাশাপাশি দুজন যাত্রী যেতে পারবে না। একজন করে এগিয়ে যাবে, পূজো পাঠ করবে, দেবীকে স্পর্শ করে প্রণাম করবে। তারপর দ্বিতীয় পথ ধরে বেরিয়ে আসবে। পাণ্ডারা এখানে পূজো পাঠ করান, যাত্রীদের মনস্তুষ্টির জন্য যথেষ্ঠ সময় ব্যয় করতে দেন। দেবীর জন্য এখানে তিরুপতির মতো গলা-ধাক্কা দেবার ব্যবস্থা নেই।

মন্দিরের মাঝখানে একটি সুসজ্জিত সিংহাসনের উপরে দেবদেবীর মূর্তি আছে। সেই দিকে চেয়ে স্বাতি বলল: বহুদিন আগে বাবা মার সঙ্গে যখন এসেছিলাম, তখন এই সিংহাসন দেখি নি বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের সঙ্গী ব্রাহ্মণ বালক বলল: না, বরাবরই এই রকম ছিল।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল। এই হাসির অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট। এই বালক হয়তো তার শৈশব থেকেই এই রকম দেখছে, কিন্তু সে তো বেশি দিনের পুরনো কথা নয়। স্বাত হয়তো তারও আগের কথা বলছে। আমিও এই মন্দিরে প্রবেশ করেছিলুম।

কিন্তু ভিতরের কথা ঠিক মনে পড়ছে না। আমার স্মৃতিতে একটি গুহার মতো অন্ধকার স্থানে দেবীর পীঠ, কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে সেখানে পৌঁছতে হয়। সেবারে আমাকে কোথাও অপেক্ষা করতে হয় নি।

এক সময়ে সেই স্থানে আমরা পৌঁছে গেলুম। এবারে আর অন্ধকার নেই। বাহিরে বিদ্যুতের আলোয় সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। যাত্রীরা ধাপে ধাপে নামছেন, আমরাও নামলুম। কিন্তু নিচেটা আগের মতো অন্ধকার, সব কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় না। দেখবার প্রয়োজন নেই। দেবতা তো আমাদের কল্পনাতেই আছেন, আমরা সবই কল্পনা করে নিতে পারি।

সময় মতো আমাদের সঙ্গী বালকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। ফেরার পথের রেলিঙ ধরে সে বলল: এর নাম মনোভব গুহা, মায়ের যোনীপীঠ এখানে।

কোন দেবতা নেই, কোন বিগ্রহ নেই। প্রদীপের মৃদু আলোয় একটি শিলাপীঠ দেখতে পাওয়া যায়। তার আধখানা কাপড় সোনার টোপর ও ফুলের মালা দিয়ে ঢাকা। সামনের ধারটি উন্মুক্ত, তার মধ্যে জলের ধারা। এই জল নাকি পাতাল থেকে আসছে।

যে ব্রাহ্মণ এই স্থানটি আগলাচ্ছিলেন তিনি কিছু মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দিলেন আমাদের মাথায়। স্বাতি প্রণাম করে ব্রাহ্মণকে প্রণামী দিল। তারপরে তৎপর ভাবে বেরিয়ে এল। আমি বললুম: মন ভরল?

স্বাতি এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল: আমাদের যাত্রা শুভ হোক, এই প্রার্থনা করে এলাম।

আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি হেসে বলল: গৌহাটি হল পূর্বাঞ্চলের দরজা। সাহেবরা বলত, গেটওয়ে অফ দি ঈস্ট। তাই বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মনে

ইচ্ছে হয়েছিল যে কামাখ্যা মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই এবারের যাত্রা শুরু করব।

আমরা তখন ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে নেমে এসেছিলুম। আর অসংখ্য যাত্রী নিয়ে একটা ট্যাক্সি এসে থামছিল। ব্রাহ্মণ বালক, সেই ট্যাক্সিটা আমাদের জন্য ধরে ফেলল। তাকে বিদায় দিয়ে আমরা উঠে পড়লুম।

পাহাড়ের মাথায় ভুবনেশ্বরের মন্দির এবারে আর দেখা হল না। মোটরের পথ এখন সে মন্দির পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ছ টাকা দিলে এই ট্যাক্সিও আমাদের উপরে নিয়ে যেত। কিন্তু বেলা হয়েছিল অনেক। সে মন্দিরও হয়তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ভুবনেশ্বর মন্দিরের কথা স্বাতিকে আমি মনে করিয়ে দিলুম না। ড্রাইভারকে বললুম: সোজা গৌহাটি স্টেশনে চল।

দু-তিনজন যাত্রী পাহাড়ের নিচে নামবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ড্রাইভার তাঁদের নিজের পাশে বসিয়ে নিল।

## ৮

স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে খেয়ে আমরা টুরিস্ট বাংলোয় বিশ্রাম করতে এলুম। কাল ভোরে আমরা নাগাল্যাণ্ড যাত্রা করব। স্বাতি বলল: তার আগে অরুণাচলের পথঘাট সম্বন্ধে এখানেই কিছু জেনে নেওয়া দরকার।

বললুম: নরি রুস্তমজীর লেখা একখানা বই পড়েছিলুম। তার নাম Enchanted Frontiers। বইটি ভ্রমণকাহিনী নয় বলে,পথ-ঘাটের হদিস নেই, কিন্তু আত্মজীবনীমূলক লেখা বলে কিছু তথ্য আছে।

স্বাতি বলল: অরুণাচল সম্বন্ধে সব কথাই আমার ভাল লাগবে।

বললুম: রুস্তমজীর লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে এই অঞ্চল সম্বন্ধে আমরা কেউই কৌতূহলী ছিলুম না। এমন কি ভারত সরকারও এই অঞ্চল নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯১৪ সালে। এই আন্তর্জাতিক সীমারেখার নাম হয়েছিল ম্যাকমোহন লাইন। ইংরেজ ও তিব্বত সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনার সময়ে চীনও উপস্থিত ছিল। কিন্তু ভারত সরকার ১৯৫০ সালে সহসা এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে।

কেন?

চীন আক্রমণ করেছিল পূর্ব তিব্বত। রাশিয়ার ভয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে সরকার অনেক আগে থেকেই সচেতন ছিল। এবারে দেখল যে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ম্যাকমোহন লাইন বরাবর ঘাঁটি তৈরি করা দরকার। ইংরেজ ১৯৩০ সালেই প্রথম এর প্রয়োজন

বোধ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের জন্যে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারে নি। আসামে যাতায়াত তখন এমন সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ছিল যে সবচেয়ে অনাদৃত ছিল এই প্রদেশ। অনেকে তাই এই প্রদেশকে বলত সিণ্ডারেলা। রূপকথার এই মেয়ের মতোই অনাদৃত।

১৯৫০ সালেই এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটে—নেফার নিদারুণ ভূমিকম্প। লোহিত ফ্রন্টিয়ার ডিভিসনের কয়েক মাইল উত্তরে তিব্বতে রিমার নিকটে ছিল এই ভূমিকম্পের এপিসেন্টার। এর পরেই এল ভীষণ বন্যা। এই অঞ্চলের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বোধহয় এই প্রথম ভারতের মানুষ শুনল নেফার নাম। নানা জায়গা থেকে সাহায্য এল। এয়ার ফোর্সের প্লেন থেকে খাদ্যদ্রব্য ফেলা হল নিচে। জলবন্দী মানুষকে উদ্ধার করা হল দুঃসাহসী উপায়ে। তখন চা বাগানের বিদেশী সাহেবদের অনেকেরই ছোট ছোট প্লেন ছিল। এমন সাহেবও ছিল যে বিকেল বেলায় বন্ধুর সঙ্গে টেনিস খেলবার জন্যেই প্লেন রাখত। এরাও সে সময়ে সাহায্য করেছিল।

স্বাতি হেসে বলল: বলিহারি খেলার শখ। কিন্তু শুধু প্লেন রাখলেই তো আকাশে ওড়া যায় না, ওঠানামা করতে এরোড্রোমও চাই।

বললুম: এরোড্রোমের দরকার হত বলে মনে হয় না। তিনজন আরোহীর উপযোগী ছোট এরোপ্লেন তো। টেনিসের মাঠেই বোধহয় ওঠা-নামা করতে পারত।

স্বাতি বলল: দীঘার সমুদ্রের ধারেও তো প্লেন নামতে পারে শুনেছি।

বললুম: কলকাতার হ্যামিল্টন কোম্পানীর বুড়ো সাহেব নাকি তার ছোট প্লেন নিয়ে দীঘায় বেড়াতে যেত।

সত্যিই, শখ ছিল সেকালের সাহেবদের। শখের জন্যে ভয়-ডর বলে তাদের কিছু ছিল না।

বললুম : নির্ভীক নই বলেই এখনও আমরা অনেক জাতির তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি। জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমাদের শোচনীয় পরাজয় হচ্ছে। কিন্তু এ সব কথা থাক।

স্বাতি বলল : আমরা অরুণাচলের কথা বলছিলাম।

বললুম : অরুণাচলের জেলাগুলির নাম যে এক একটা নদীর নামে হয়েছে, তা বোধহয় বলেছি।

স্বাতি বলল : বল নি।

বললুম : কামেং সুবনসিরি সিয়াং লোহিত ও তিরাপ—এই পাঁচটি নদীর নামেই অরুণাচলের পাঁচটি জেলার নাম।

স্বাতি বলল : সুবনসিরি নামটা কি স্বর্ণশ্রী থেকে হয়েছে?

বললুম : অসম্ভব নয়। লোহিত শব্দটিও সংস্কৃত। কাজেই অরুণাচল পাহাড়ে স্বর্ণশ্রী লোহিত নামের নদী থাকবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তবে কামেং সিয়াং নামগুলি নিশ্চয়ই সংস্কৃত নয়।

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়।

তারপরেই আমার চীনের ভারত আক্রমণের কথা মনে পড়ে গেল। বললুম : চীনের কাণ্ড তোমার মনে আছে?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : দিল্লীতে চৌ এন লাই আর জহরলাল নেহেরু গলা জড়াজড়ি করে বলেছিলেন, হিন্দী-চীনী ভাই ভাই। তারপরেই শোনা গেল চীন ভারত আক্রমণ করেছে অরুণাচলের পথে।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : ভারত আক্রমণ করবার আর কি কোন পথ ছিল না?

হয়তো ছিল। কিন্তু আমি এই অঞ্চল আক্রমণের একটা কারণ খুঁজে পেয়েছিলুম।

বল।

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : ভুটানের পূর্ব সীমান্তে কামেং জেলা। এই জেলার উত্তরে তাওয়াং শহরটি ম্যাকমোহন লাইনের কিছু দক্ষিণে। সেখানে মন্‌পাদের বাস। তারা বৌদ্ধ এবং নিরীহ প্রকৃতির মানুষ, আর তাদের ভালোমানুষির সম্পূর্ণ সুযোগ নিত তিব্বতীরা। কতকটা জোর করেই তাদের ধান চাল জলের দরে কিনে নিত।

স্বাতি বলল : তিব্বতীরা তাওয়াং-এ আসত কেন ?

তারও একটা কারণ ছিল। তিব্বতের ষষ্ঠ দলাই লামা সাঙ্গিয়াং গিয়াৎসোর জন্ম হয়েছিল এই অঞ্চলে। সে কতদিন আগের কথা জানো ?

স্বাতি নিঃশব্দে আমার দিকে চেয়ে রইল।

বললুম : শ তিনেক বছর আগে। তিনি দলাই লামা ছিলেন ১৬৮২ থেকে ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

মাত্র তেইশ বছর !

শুনেছি, আধ্যাত্মিক আনন্দের চেয়ে পার্থিব সুখের প্রতি তাঁর বেশি অনুরাগ ছিল। তাতেই নাকি ডুবে থাকতেন, আর প্রেমের কবিতা লিখতেন। দলাই লামার জন্মস্থান বলে অনেকদিন থেকেই তাওয়াং ছিল তিব্বতীদের কাছে প্রিয়। আর ভারত থেকে তাওয়াং পৌঁছনো এক রকম দুঃসাধ্য ছিল। সমতল ভূমিতে চারদুয়ারে ছিল এই এলাকার প্রধান শহর। মাঝপথে বম্‌ডি-লা ন হাজার ফুট উঁচুতে। চারদুয়ার থেকে বম্‌ডি-লা পেরিয়ে তাওয়াং-এ পৌঁছতে তখন প্রায় এক পক্ষ সময় লাগত।

এখন ?

শুনেছি এখন জীপগাড়ির পথ হয়েছে। তেজপুর থেকে এক-দিনেই তাওয়াং পৌঁছনো যায়। মনে নেই, চীনারা তো বম্‌ডি-লা অধিকার করে তেজপুরে নেমে আসছিল বলে শহর ছেড়ে সবাই পালিয়ে গিয়েছিল !

কিন্তু তেজপুরে তো চীনারা আসে নি !

কেন আসে নি, কেন তারা ফিরে গেল, তা শুধু ওরাই জানে। শুধু কি নিজেদের সামরিক শক্তির বহর দেখিয়ে সম্মান আদায় করতে, না আর কোন উদ্দেশ্য ছিল তা রাজনীতিবিদ্‌রাই বলতে পারেন।

স্বাতি বলল : এ দিকের মানুষের সম্বন্ধে কিছু বলবে না?

বললুম : তাহলেই মহাভারতের কথা এসে পড়বে।

কী রকম?

মহাভারতের ভগদত্তের কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে! নরকাসুরের পুত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা বৃদ্ধ ভগদত্ত এসেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। তাঁর সঙ্গে ছিল কিরাত ও চীনা সেনা।—স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।

স্বাতি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকাল দেখে হেসে বললুম : এর থেকেই প্রমাণ হয় নাকি যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নিকটেই ছিল কিরাত ও চীনাদের দেশ এবং ভগদত্ত ছিলেন তাদের রাজা! সভা-পর্বের আর একটি শ্লোকেও এই রকমের কথা আছে—হিমালয়ের পূর্বে লোহিত্য নদীর পারে কিরাতরা বাস করত। এই লোহিত অরুণাচলের নদী। বর্তমান সদিয়া ও পরশুরাম কুণ্ড অরুণাচলের লোহিত জেলায়। তাহলে কি শুধু এই জেলার লোককেই কিরাত বলা হত?

একটু থেমে বললুম : পরবর্তী কালের কথা শুনলে তা মনে হবে না। টলেমি তাঁর ভূগোলে কিরাডে বা Cirrhadœ নামে এক জাতির উল্লেখ করেছেন ভারতের পূর্বদেশবাসী বলে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে এরা আরাকানের অধিবাসী। ব্রহ্মদেশ ও প্রাচীন কম্বোজ বা কম্বোডিয়ায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে সে দেশের অধিবাসীদেরও কিরাত বলা হত। আবার পূর্ব নেপালেও কিরান্তি নামে এক জাত আছে। তাদের মধ্যে যখ ও রয়স নামে দুটি শ্রেণীর নাম পাওয়া যায়। তাতে অনেকেই অনুমান করেন যে যক্ষ ও রক্ষ বা রাক্ষসরাও এই কিরাত

জাতির অন্তর্গত ছিল। নেপালের পার্বতীয় বংশাবলী নামে প্রাচীন ইতিহাসে আছে যে উনত্রিশজন কিরাতবংশীয় রাজা নেপালে রাজত্ব করেছিলেন।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : তুমি কি বলতে চাও—

তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললুম : ঠিক এই কথাই বলতে চাই যে মহাভারতের কালে কিরাত জাতির বাস ছিল নেপাল থেকে কম্বোডিয়া পর্যন্ত এশিয়ার সমগ্র পূর্বাঞ্চল। ভুটান অরুণাচল মণিপুর ব্রহ্মদেশ তো বাদ ছিলই না, তিব্বত বা চীনেরও কিছু অংশে এরা ছিল। অন্তত মানস সরোবর ও কৈলাস অঞ্চলে যে ছিল তার প্রমাণ আছে মহাভারতেই।

কী রকম ?

হিমালয়ে অর্জুন যখন দিব্যাস্ত্রের জন্য তপস্যা করছিলেন, তখন কৈলাসবাসী শিব ও পার্বতী তাঁকে কিরাত বেশেই দেখা দিয়েছিলেন। এ অঞ্চল কিরাত অধ্যুষিত না হলে শিব কেন এ বেশ ধারণ করবেন!

স্বাতি বলল : তোমার কথায় যুক্তি আছে এবং তা খণ্ডন করার মতো কোন তথ্য আমার জানা নেই বলে মেনে নিতেও বাধ্য হচ্ছি।

তার কথা শুনে আমি হাসলুম, আর স্বাতি বলল : হাসলে যে!

বললুম : আমার এই কথার বিরুদ্ধে একটি মাত্র যুক্তি আমার জানা আছে। সে হল বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় কিরাত নামের একটি জনপদের উল্লেখ। সেই জনপদ নাকি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে এই কিরাতদেশ বিন্ধ্য শৈলে অবস্থিত ছিল।

তবে ?

আমরা তো কিরাত নামের কোন দেশের কথা বলছি না। আমরা আলোচনা করেছি কিরাত জাতির বাসস্থানের কথা। কিরাতরা যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, তাকে ঐতিহাসিক সত্য বলেই মেনে নেওয়া যেতে পারে। অনেকে তাদের অসভ্য বর্বর জাতি বলে মনে করেন,

তার বদলে তাদের আদিবাসী বলে ভাবলে কোন ভুল হবে না মনে হয়।

স্বাতি বলল : তবে বিন্ধ্যাচলে কিরাত দেশ এল কী করে?

বললুম : এ রকম গোলমেলে কথা আরও অনেক আছে। একেবারে গোড়াতেই বোধহয় বলেছি যে নাগরাজ্য নিয়েও এ রকম কথা আছে। আর—

আমি থামতেই স্বাতি প্রশ্ন করল : আর কী?

আমি ভাবছিলুম। বললুম : বিদর্ভ রাজ্যের রাজধানী নিয়েও এই রকমের একটা গোলমেলে কথা আছে বলে শুনেছি। রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকের রাজধানী ছিল কুণ্ডিল নগরে। এই নগর পশ্চিম ভারতের কোন স্থানে বলে আমরা মানি। কিন্তু এ দিকের প্রচলিত প্রবাদ হল, অরুণাচলের লোহিত বিভাগে ছিল ভীষ্মক রাজার রাজধানী ভীষ্মক নগর। সেখানে এখনও আছে তাম্রেশ্বরী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

স্বাতি বলল : পুরাণেও কি এই মন্দিরের উল্লেখ আছে?

বললুম : যত দূর মনে পড়ে, রুক্মিণী তাঁর বিয়ের আগে ইন্দ্রাণীর পুজো দিতে এসেছিলেন মন্দিরে। পুজোর পরে যখন বেরিয়ে আসছিলেন, তখনই কৃষ্ণ তাঁকে হরণ করেন। হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই গল্প আছে।

স্বাতি বলল : গল্পটা পুরোপুরি মনে পড়ছে না।

হরিবংশের গল্প মস্ত বড়।

তবে সংক্ষেপে বল।

বললুম : প্রেমের গল্পই বলতে পার। রুক্মিণীর রূপের খ্যাতি শুনেছিলেন কৃষ্ণ, আর রুক্মিণীও কৃষ্ণের বলবীর্যের কথা শুনে মনে মনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঐ পর্যন্তই ছিল। মগধ-রাজ জরাসন্ধের পরামর্শে ভীষ্মক চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হয়েছিলেন। আর নিমন্ত্রিত হয়ে কৃষ্ণ বলরাম

যাদবদের নিয়ে ভীষ্মকের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলেন। বোধহয় মনে আছে যে শিশুপাল ঃছিলেন কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। তাঁরা এসেছিলেন বরযাত্রী হয়ে।

তারপর ?

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে প্রথম দেখলেন মন্দিরে আসতে। দেখেই মুগ্ধ হলেন। বড় ভাই বলরামের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তাঁকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে হবে।

সে কি !

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ক্ষত্রিয়দের কাছে এ খুব সম্মানের বিয়ে। হরণ করা মানে তো চুরি করা নয়, রীতিমতো যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে হবে। তার জন্যে শুধু সাহস নয়, বীরত্বেরও দরকার। তাই রুক্মিণী যখন পূজো শেষ করে মন্দির থেকে বেরোলেন, কৃষ্ণ তাঁকে নিজের রথে তুলে নিলেন। খবর পেয়ে ভীষ্মক সমস্ত রাজাদের নিয়ে এলেন যুদ্ধ করতে। তুমুল যুদ্ধ হল, কিন্তু হেরে গেলেন তাঁরা।

স্বাতি বলল ঃ তারপর কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন, এই তো !

তার আগেও একটু ঘটনা আছে।

কী রকম ?

রুক্মিণীর ভাই রুক্মীর ছিল কৃষ্ণের প্রতি গভীর বিদ্বেষ। সে কৃষ্ণের কংসবধের জন্যে। রুক্মী প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে কৃষ্ণকে হত্যা করে রুক্মিণীকে ফিরিয়ে আনবেন, না পারলে কুণ্ডিল নগরে আর ফিরবেন না। এই রুক্মীর সঙ্গেও কৃষ্ণের যুদ্ধ হল। হেরে গেলেন রুক্মী। রুক্মিণীর অনুরোধে কৃষ্ণ রুক্মীকে বধ না করে ছেড়ে দিলেন। শুনে আশ্চর্য হবে যে পরবর্তীকালে এই রুক্মীর কন্যা সুভাঙ্গী স্বয়ম্বর সভায় রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের গলাতেই বরমাল্য দেয়।

স্বাতি সবিস্ময়ে বলল ঃ পিসতুতো ভায়ের গলায় !

সে যুগে নিশ্চয়ই এটা নিন্দার ব্যাপার ছিল না।

এইবারে তাম্রেশ্বরীর মন্দিরের কথা বল।

বাহিরে জুতোর শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। মনে হয়েছিল যে কাকতি এসেছে কাউকে সঙ্গে নিয়ে। তাই বললুম: মন্দিরের কথা পরে বলব।

আর তার পরেই দরজায় টোকা শুনে আমি উঠে দাঁড়ালুম। স্বাতিও সোজা হয়ে বসল। ঘরে আসবার অনুরোধ জানাতেই পর্দার ফাঁক দিয়ে কাকতি মুখ বাড়াল। বললুম: এসো এসো। তোমার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছি।

কাকতি একা আসে নি, সঙ্গে আর এক বুড়ো ভদ্রলোককে এনেছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালুম। নমস্কার বিনিময় হল। বসবার জন্য চেয়ার ছেড়ে দিয়ে আমি বিছানায় বসতেই কাকতি বলল: আপনাদের জন্যে ভূপেনবাবুকে ধরে আনলাম। ওঁর নাম ভূপেন কলিতা, অরুণাচলে ইনি কিছু দিন ছিলেন।

বললুম: খুবই আনন্দের কথা।

স্বাতি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল দেখে জিজ্ঞাসা করলুম: কোথায় যাচ্ছ?

স্বাতি বলল: তোমাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসছি।

কাকতি ব্যস্ত হয়ে উঠল দেখে বললুম: তুমি স্থির হয়ে বোসো। মেয়েদের কাজ মেয়েরাই করুক।

তারপরে সৌজন্যমূলক কথায় খানিকটা সময় কাটিয়ে দিলুম। স্বাতিকে ফিরতে দেখে এলুম অরুণাচলের প্রসঙ্গে। ভূপেনবাবুকে প্রশ্ন করলুম: অরুণাচলের কোন্ কোন্ জায়গায় আপনি গেছেন?

ভূপেনবাবু বললেন: খুব বেশি জায়গায় নয়। কিন্তু কাকতি মানল না বলেই এসেছি।

বলে কাকতির দিকে তাকালেন।

কাকতি বলল: যতটুকু জানেন বলুন না।

ভূপেনবাবু বললেন: প্রথম জীবনে বালিপাড়ায় ছিলাম। একটা সরকারী দলের সঙ্গে তাওয়াং পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। আর

একবার গিয়েছিলাম জিরোয়। সে সব অঞ্চলের কিছু লোকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

ভদ্রলোক থামতেই স্বাতি প্রশ্ন করল: পরশুরাম কুণ্ডে যান নি?

ভূপেনবাবু বললেন: অনেক কষ্ট করে একবার গিয়েছিলাম।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল: তবে আর কী চাই। এইটুকু জানলেই আমাদের চলবে।

আমি বললুম: এইবারে একে একে এই সব অঞ্চলের কথা বলুন।

ভূপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কি নর্থ ব্যাঙ্কের কোন জায়গায় গিয়েছেন?

ব্রহ্মপুত্রের উত্তরাঞ্চলকে যে নর্থ ব্যাঙ্ক বলা হয় তা জানতুম। কলকাতা থেকে এক সময় নর্থ ব্যাঙ্ক এক্সপ্রেস ছাড়ত। সেইজন্যেই কথাটা জানতুম। বললুম: না, সে সুযোগ পাই নি।

ভূপেনবাবু বললেন: তাহলে রেল লাইনের কথাই আগে বলি। রঙ্গিয়া থেকে তেজপুরে যাবার পথে রাঙ্গাপাড়া নর্থ স্টেশন। সেখান থেকে মুরকঙ সেলেক পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিন শো কিলোমিটার পথ। এই পথেই রাঙ্গাপাড়া নর্থের পরের স্টেশনই বালিপাড়া। ষাট বছর আগে অরুণাচলের দুটো ভাগ ছিল বালিপাড়া সীমান্ত অঞ্চল আর সদিয়া সীমান্ত অঞ্চল। তেজপুর থেকে বালিপাড়া ছত্রিশ কিলোমিটার। বালিপাড়া থেকে চারদুয়ারের ওপর দিয়ে ফুট হিল্‌সে পৌঁছতে হয়। সেখান থেকে খেলঙ ঘণ্টাখানেকের পথ। খেলঙে আছে এলাচ ও কফির চাষ। খেলঙ থেকে সকালে যাত্রা করলে দুপুরেই বম্‌ডি-লা পৌঁছনো যায়। কিন্তু বম্‌ডি-লায় যাত্রাভঙ্গ না করে সন্ধ্যা ছটায় আমরা দিরাঙে পৌঁছে গিয়েছিলাম। দিরাঙ থেকে সেঙ্গে পৌঁছতে লাগে ঘণ্টা পাঁচেক সময়। এই পর্যন্তই আমরা জীপে এসেছিলাম।

আমি বললুম: কতদিন আগের কথা বলছেন?

কতদিন আগের কথা!

বলে ভূপেনবাবু ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপরেই বললেন: মনে পড়েছে। ১৯৬২ সালে তো চীনারা এই অঞ্চল আক্রমণ করেছিল! তার এক বছর আগে। সেঙ্গে থেকে তাওয়াঙের পথ তখন বেশ দুর্গম ছিল। বারো ঘণ্টা পায়ে হেঁটে আর ঘোড়ায় চেপে আমরা জঙ্গে পৌঁছেছিলাম। সে-লায় আমাদের শক্ত বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম: কোন্ মাসে মনে আছে?

ভূপেনবাবু বললেন: বৈশাখের প্রথমে। কিন্তু সে-লার ওপরে কনকনে বাতাসে আমাদের ঠকঠক করে কাঁপতে হয়েছিল। গরম আণ্ডারওয়্যার সোয়েটার কোট ওভারকোটেও শীত মানছিল না। লা মানে পাস, গিরিবর্ত্ম। শুনেছিলাম তেরো হাজার ফুট উঁচু। বম্‌ডি-লাই তো ন হাজার ফুট।

তারপর?

জং থেকে তাওয়াং পৌঁছতে আমাদের সাড়ে ছ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। ছোটখাট শহর একটা। মিড্‌ল স্কুল ক্র্যাফ্‌ট্ সেণ্টার ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি আছে। একটা কুষ্ঠাশ্রমও আছে, আর আছে প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো একটা বৌদ্ধ গোম্‌ফা। এখানকার অধিবাসীদের নাম মন্‌পা। আর গ্রাম প্রধানদের বলে চোরগেল। একজন পলিটিকাল অফিসারও ছিলেন তাওয়াঙে।

জিজ্ঞাসা করলুম: আর কোন শহর নেই?

ভূপেনবাবু বললেন: ফুট হিল্‌সের কাছে ভালুকপঙ নামে একটা সীমান্ত শহর আছে। তিব্বতের সীমান্তে নয়, আসাম-অরুণাচলের সীমান্তে। শুনতে পাচ্ছি, বালিপাড়া থেকে এই ভালুকপঙ পর্যন্ত রেল লাইন বসবে।

স্বাতি বলল: মানুষদের সম্বন্ধে কিছু বলবেন না?

ভূপেনবাবু বললেন: এদের বড় শান্তশিষ্ট ও ভদ্র দেখেছিলাম।

তারা পরিশ্রমী ও শান্তিপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত। বেশ ধর্মভীরু। তাদের গ্রামগুলো পাঁচ থেকে বারো হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। বম্‌ডি-লায় তাদের প্রধান কেন্দ্র। মন্‌পারা পাথর আর কাঠে তৈরি দোতলা ঘরে বাস করে। অতিথিপরায়ণ এরা, নৃত্যগীতে পারদর্শী। তাওয়াঙে আমরা এদের নাচও দেখেছিলাম।

এই সময়ে আমাদের চা এল, তার সঙ্গে বিস্কুট। স্বাতি এগিয়ে এসে বলল: আপনারা গল্প করুন, আমি আপনাদের চা ঢেলে দিচ্ছি।

ভূপেনবাবু তাঁর চেয়ারটা একটুখানি সরিয়ে নিয়ে বললেন: পাহাড়ের নিচে ভালুকপঙে আমি যাই নি। তবে শুনেছি যে সেখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। বোধহয় জানেন যে পুরাকালে অসুররাজ বাণের রাজধানী ছিল তেজপুরে।

বললুম: শুনেছি। বাণের কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধর বিয়ের কথাও শুনেছি।

ভূপেনবাবু বললেন: এই বাণের পৌত্রের নাম ভালুক, ভরেলি নদীর দক্ষিণ তীরে ভালুকপঙে ছিল ভালুকের রাজধানী। তাঁরই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাতি চায়ের পেয়ালাটি তাঁর হাতে দিতেই ভদ্রলোক প্রসন্ন হয়ে বললেন: আপনাদের কই!

হেসে বললুম: সবাই পাব।

ভূপেনবাবু চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন: বেশ গরম!

স্বাতি বিস্কুটের প্লেটটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: বিস্কুট নিন।

ভদ্রলোক একসঙ্গে দুখানা বিস্কুট তুলে নিয়ে বললেন: এই কামেং জেলায় আরও কয়েক জাতের আদিবাসী আছে। তারা হল শেরদুকপেন, আকা, বাগান বা খোয়া, মিজিরা বা মম্মাই, বাঙনি, সুলুং এবং পূর্ব দিকে কিছু দফ্‌লাও আছে।

কাকতির দিকে চেয়ে বললেন: তুমিও বোধহয় শেরদুকপেনদের

দেখেছ। এরা জাত ব্যবসায়ী, সমতলের লোকেদের সঙ্গে কারবার এদের সারা বছর। সাদাসিধে পোশাক, মাথায় একটি চমরী গরুর লোমে তৈরি টুপি। নৃত্যগীত ও মুখোশপরা মূক অভিনয়ে এরা বিশেষ পারদর্শী। মনপাদের মতো এরাও থুতোতদাস নৃত্যাভিনয় জানে, আরপোষ নৃত্য চমরী নৃত্য বিহগ নৃত্য তাদের খুব প্রিয়।

* * * *

কাকতি ও আমার হাতেও চা এসেছিল। কাকতি বিস্কুট নিল, আমি নিলুম না। স্বাতিও শুধু চা নিল। ভূপেনবাবু বললেন: আকারা নিজেদের রাজা ভালুকের বংশধর মনে করে। ব্যবসায় এরাও পটু। মুখে এরা নানা রঙের উল্কি পরে বলেই অসমীয়ারা এদের আঁকা বা আকা বলত। এই নামই এখন প্রচলিত হয়ে গেছে। শুনেছি যে জামিরি ও হুসিগাঁও নামে দুই গ্রামে এদের দুজন নুগুম বা রাণী আছেন। যে রাজারা কিছুদিন আগেও আকাদের দেশ শাসন করতেন, তাঁদেরই বংশের। আকারা তাঁদের খুব সম্মান করে। যুদ্ধে এরা খুব পটু ছিল এবং সমতলভূমিতে এসে হানা দিত। কর আদায় করত অন্য উপজাতিদের কাছে। গত শতাব্দে বৃটিশের সঙ্গে সন্ধি করে খানিকটা শান্ত হয়েছে। উঁচু মাচার ওপরে এরা ঘর করে। নিচে থাকে ছাগল বা শুয়োর। পোশাক সাদাসিধে, কিন্তু অলঙ্কার নানা রকমের। এদের অঞ্চলে ধান হয় না, হয় ভুট্টা আর জোয়ার। ভুট্টা বা জোয়ার থেকেই এরা লাউপানি নামে এক রকমের মদ তৈরি করে খায়।

চা খেতে খেতে ভূপেনবাবু আরও অনেক কথা বললেন। আকা ও দফ্‌লাদের মধ্যে নাকি দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো আদিবাসী সুলুঙরাই নাকি এদের দাস। একবার কাউকে কিনে নিলে সারা জীবন দাস হয়ে থাকতে হবে, তাদের ছেলেমেয়েদেরও দাস হয়ে খাটতে হবে।

স্বাতি বলল: টাকা দিয়ে কিনতে হত?

ভূপেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন : উহুঁ, টাকা পয়সা নয়, জিনিস দিয়ে। মিথান জানেন ?

স্বাতি বলল : না।

মিথান না গরু না মোষ। দুধ দেয়, কিন্তু সে দুধ কেউ খায় না। বলে, সন্তানের জন্যে দুধ, সে দুধ মানুষ কেন খাবে! কিন্তু ভোজের সময় এই মিথানের মাংস এরা খায়। এই রকমের দুটি মিথান কিংবা কাপড় জামা দিয়েই দাস কেনা যেত। এই দাসপ্রথা পুরোপুরি লোপ পেয়েছে কিনা আমি জানি না। আকাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত ধরনের, মেয়েদের এরা সম্মান করে। বেশ ফূর্তিবাজ জাত। সমস্ত সামাজিক কাজ ও ধর্মানুষ্ঠানে এরা নাচ গান করে। এদের সঙ্গে বাগান ও ধাম্মাইদের অনেক মিল আছে, কিন্তু সংখ্যায় তারা বেশি নয়।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে ভূপেনবাবু এইবারে থামলেন। কাকতি আমাদের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করল আমাদের কেমন লাগছে। এই রকম একজন লোককে ধরে আনার জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করবে কিনা তা স্থির করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল : আপনাদের ভাল লাগছে তো!

আমি হেসে বললুম : নিশ্চয়ই ভাল লাগছে।

কাকতি বলল : এ সব ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। নিজেদের নিয়েই আমরা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি।

ভূপেনবাবু তাঁর চা শেষ করে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখছিলেন, স্বাতি বলল : আর একটু চা নিন।

আরও আছে!

বলে ভদ্রলোক পেয়ালাটা স্বাতির দিকে এগিয়ে দিলেন। স্বাতি নতুন চা ঢেলে ফিরিয়ে দিল পেয়ালাটা।

আমি বললুম : এইবারে জিরোর গল্প বলুন।

ভূপেনবাবু বললেন : তাহলে রেলের কথাই আগে বলতে হয়।

তাই বলুন।

নর্থ লখিমপুর পৌঁছবার ত্রিশ কিলোমিটার আগে হরমুতি নামের একটা ছোট স্টেশন আছে। শুনেছি সেইখান থেকেই শুরু হয়েছে নতুন রাজধানী ইটানগরের পথ।

আপনারা কি অন্য পথে জিরো গিয়েছিলেন?

ভূপেনবাবু বললেন: আমি যে সরকারী দলের সঙ্গে গিয়েছিলাম, তারা যাত্রা করেছিল নর্থ লখিমপুর থেকে জীপে। সড়ক পথে এসেছিলাম বলে কোন রেল স্টেশন দেখতে পাই নি। অরুণাচলের অ্যালঙে যেতে হলে শিলাপাথর স্টেশনে নামতে হয় বলে জানি। কিন্তু এই সব ছোট স্টেশন থেকে বাস যাতায়াত করে কিনা তা জানি না। তাই মনে হয় যে আপনারা যদি যেতে চান তো তেজপুর অথবা নর্থ লখিমপুরে গিয়েই খোঁজ খবর নেবেন। নর্থ লখিমপুরের আট কিলোমিটার দূরে লীলাবাড়িতে এয়ারোড্রোম আছে, প্লেনেও যেতে পারবেন। অরুণাচলের পাসিঘাটেও একটা ছোট এয়ারোড্রোম আছে। আর সুবনসিরি নামে একটা রেল স্টেশন আছে নর্থ লখিমপুর থেকে চৌত্রিশ কিলোমিটার দূরে।

কাকতি বলল: জিরোতে কী ভাবে গেলেন তাই বলুন।

ভূপেনবাবু বললেন: অরুণাচলের সীমান্তে কিমিন নামের একটা জায়গা আছে, মনে হয় এটা আসামের দিকেই। নর্থ লখিমপুর থেকে বেরিয়ে এই জায়গাটি প্রথম দেখেছিলাম। শুনেছিলাম, এর দূরত্ব আঠারো কিলোমিটার। কিমিন থেকে জিরো পর্যন্ত মোটর পথ আছে। বলতে ভুলে গেছি, এ সব জায়গায় যেতে হলে ইনারলাইন পারমিটের দরকার। কিমিন ছাড়িয়েই তা দেখাতে হয়। ভারি কড়াকড়ি এই পারমিট দেখার ব্যাপারে, কিন্তু তা সংগ্রহ করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

কাকতি বলল: তারপরে কোথায় পৌঁছলেন?

ভূপেনবাবু এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন: কিমিন ঠিক

পাহাড়ের ওপরে নয়, সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা হাজার ফুট হতে পারে। সেখান থেকেই পাহাড়ে ওঠা। এ হল অরুণাচলের সুবনসিরি জেলা। সুবনসিরি ও কমলা এই জেলার প্রধান নদী।

স্বাতি জানতে চাইল : নদী দেখেছিলেন ?

দেখেছিলাম। পথে এই নদী পেরোতে হয়। পুল আছে। ইটানগর থেকেও জিরো যেতে হলে এই পুল পেরোতে হয়। জিরো পৌঁছবার কিছু আগে হাপোলি একটা ছোটখাট শহর। তার আগে ইয়াজলি নামে আর একটা জায়গা আছে। প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু। ভারি চমৎকার আবহাওয়া।

জিজ্ঞাসা করলুম : আর কী দেখলেন ?

ভূপেনবাবু বললেন : পথের শোভা আর নতুন নতুন মানুষ দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। আর মারাত্মক অভিজ্ঞতা হয়েছিল এক রকমের ক্ষুদে মাছির কামড়ের। কালো রঙের ছোট ছোট মাছি, অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কামড়ালে আর রক্ষা নেই, ফুলে উঠে জ্বালা করবে, অনেক সময় ঘা হয়ে যাবে।

স্বাতি বলল : হিমালয়ের অনেক জায়গায় পিসু নামের এক-রকম পোকার কামড় খেয়েছি। তাই নয় তো!

ভূপেনবাবু বললেন : এখানে এই মাছিকে ডিমডিম বলে। আর এক রকমের প্রাণী দেখেছিলাম। তা বেড়ালের মতো দেখতে। কিন্তু বোধহয় উড়তে পারে। সাধারণত রাতে এই প্রাণীটি দেখতে পাওয়া যায়। তার কী নাম তা জানি নে।

স্বাতি বলল : এবারে তা হলে মানুষদের কথা বলুন।

ভূপেনবাবু বললেন : সুবনসিরি জেলায় আপা-তালি দফলা আর পাহাড়ী মিরিদের বাস। আপা-তালিরা থাকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচু উপত্যকায়, তার চারিধার ঘিরে আছে আট থেকে ন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। পাহাড়ে চাষবাসের দক্ষতা এদের অসাধারণ। হাল গরু নেই, পুকুর টিউবওয়েল নেই ; শুধু কোদাল চালিয়ে আর

পাহাড়ের জল ধরে এরা সারা বছরের ফসল ফলায়। স্বভাবত শান্তি-প্রিয় জাত, কিন্তু অনেক ব্যাপারে ভীষণ নিষ্ঠুর বলে শোনা যায়। যেমন, কেউ চুরি করলে তারা নাকি চোরের হাত কেটে দেয়। কিংবা ব্যভিচার জানতে পারলে যা করে তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, আর আমি তাকালুম ভূপেন-বাবুর মুখের দিকে। তিনি সহজ ভাবেই বললেন: একজন লোক শুনেছি তার স্ত্রীর প্রণয়ীকে খুঁজে বার করে তাকে কচুকাটা করেছিল। তারপর সেই মাংস রেঁধে তার স্ত্রীকে খেতে বাধ্য করেছিল।

স্বাতি শিউরে উঠে বলে উঠল: না না, এ অসম্ভব কথা। এ যুগে এ রকম কাজ সম্ভব নয়।

কিন্তু ভূপেনবাবু নির্বিকার ভাবে বললেন: সম্ভব নয় কিনা বলতে পারব না, তবে আমি শুনেছিলাম যে ব্যভিচারের অপরাধে এইটেই হল পুরুষের শাস্তি আর স্ত্রীকে গঞ্জনা সইতে হয় বাকি জীবন।

বলে ভূপেনবাবু থামতেই আমি বললুম: তারপরে বলুন।

ভূপেনবাবু বললেন: শুনে আশ্চর্য হয়েছি, বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় এদের কোন বিধিনিষেধ নেই। তারা একসঙ্গে রাত্রিবাস করছে জেনেও কোন অভিভাবক তাদের বারণ করবে না। এ সব যারা নিজের চোখে দেখেছে, তারাও আশ্চর্য হয়েছে এই ভেবে যে জারজ সন্তানের জন্ম তারা কী ভাবে ঠেকায়।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: তারা দেখতে কেমন?

দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু মেয়েরা মুখে উল্কি দিয়ে আর নাকে কানে কিছু গুঁজে তাদের স্বাভাবিক রূপটা নষ্ট করে ফেলেছে।

কেন?

শুনেছি প্রতিবেশী দফ্লাদের ভয়ে। তারা কতকটা যাযাবরের মতো। আপা-তালিদের গ্রামে চড়াও হয়ে একটা আপা-তালি মেয়ে কি পুরুষ ধরে নিয়ে গেল, কিংবা দুটো মিথান। আপা-তালিরা এটা

লজ্জার কথা ভাবে, তাই দাম দিয়ে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে চোরাই জিনিস। দুটো মিথান দিয়ে একটা পুরুষকে ফেরত পায়। কিন্তু মেয়েদের বোধহয় ফেরত দিত না, তাই তাদের বিরূপ করে রাখার নিয়ম হয়েছে বলে শুনেছি।

আমি বললুম: দফ্‌লা মেয়েরাও তো দেখতে সুন্দর বলে জানি। তবে এরা আপা-তালি মেয়ে ধরে নিয়ে যেত কেন?

তা বলতে পারব না।

তবে এবারে দফ্‌লাদের কথাই বলুন।

ভূপেনবাবু বললেন: দফ্‌লারা শিকারীর জাত, যুদ্ধপটু। চাষ-বাসের চেয়ে লুটেপুটে খাবার দিকে ঝোঁক বেশি। শত্রুর সঙ্গে নৃশংস আচরণ করে। কিন্তু তাদের পারিবারিক জীবন দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

কী রকম?

বলে স্বাতি তার কৌতূহল প্রকাশ করল।

ভূপেনবাবু বললেন: দফ্‌লারা অনেক মেয়ে বিয়ে করে আর তাদের নিয়ে অত্যন্ত সদ্ভাবে সংসার করে। প্রত্যেক বউএর জন্যে এক একটি ঘর আর তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রাত কাটাবার একটা নিয়ম আছে। তবে এদের মধ্যে প্রচলিত একটা পুরনো প্রথা শুনে আশ্চর্য হতে হয়। বাপের মৃত্যুর পরে সৎমায়েরা হয় ছেলের সম্পত্তি, এমনকি ছেলে মারা গেলেও পুত্রবধূদের গ্রহণ করে বাপ। এ ব্যাপারে এদের স্বাধীনতার কথা যা শুনেছি, তার সবটা বিশ্বাস করতে আমি সাহস পাই নি। তাই নিজে তা আর কাউকে বলতে চাই নে।

আমি বললুম: তবে অন্য জাতের কথা বলুন।

ভূপেনবাবু বললেন: সুবনসিরি জেলায় আর একটি জাত আছে, তারা হল মিরি। এরা দফ্‌লাদেরই একটি উপজাতি। এদের আমি দেখি নি, এদের কথাও বিশেষ কিছু শুনি নি। এর পরেই সিয়াং জেলা। সিয়াং নদী প্রবাহিত হচ্ছে এই জেলার পূর্ব সীমানায়। প্রধান

শহর অ্যালং। পাসিঘাটও এই জেলায়। হিমালয়ের উচ্চতা এখানে দশ থেকে পনের হাজার ফুট। উত্তরে বরফের পাহাড়। ভারি সুন্দর দৃশ্য বলে শুনেছি। এখানকার অধিবাসীদের বলে আবর বা আদি। নাগাদের মতো এদের অনেক উপজাতি আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হল পদম-মিলিয়ঙ ও শিমোঙ। এক সময়ে এরা দফ্লাদের চেয়েও দুর্ধর্ষ ছিল। আহোম রাজারা এদের বশ করতে পারে নি। বৃটিশ সরকারও হিমশিম খেয়েছিল। কিন্তু এখন আর এদের দেখে তা বোঝবার উপায় নেই।

কেন?

এদের পরিবর্তনটা বোধহয় বেশি তাড়াতাড়ি হয়েছে। স্কুল কলেজে পড়ে এদের ছেলেমেয়েরা আজকাল ভাল কবিতা লিখছে বলে শুনেছি। এদের পুরনো লোকসাহিত্যও বেশ সমৃদ্ধ। সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানে যে সব গান গায় তা সংগ্রহ করবার মতো।

ভূপেনবাবু হঠাৎ হেসে বললেন: এদের মেয়েদের হঠাৎ দেখে চেনা ভারি মুশকিল।

স্বাতি বলল: কেন?

মেয়েরা তাদের মাথার চুল কাটে ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে। হঠাৎ দেখলে ছেলে বলেই মনে হয়।

স্বাতি হেসে বলল: আজকাল ছেলেরাও তো এমন বড় চুল রাখছে যে অনেক সময়েই মেয়ে বলে ভুল হয়!

কাকতি হেসে বলল: ঠিক বলেছেন।

ভূপেনবাবু বললেন: আদি ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে থাকে না। এদের ছেলে ও মেয়েদের আলাদা থাকবার ব্যবস্থা। গ্রামের সব উঠতি বয়সের ছেলে ও মেয়েরা দুটো আলাদা বাড়িতে রাত্রিবাস করে। আর এই রকম ব্যবস্থা আরও অনেক আদিবাসীদের মধ্যেই আছে।

কাকতি অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। এই আলোচনা

বোধহয় তার ভাল লাগছিল না। তাই একবার উঠে গিয়ে বাইরেটা দেখে এল। আমি তাই দেখে বললুম : ব্যাপার কী ?

কাকতি বলল : ইভা এখনও এল না কেন জানি না।

বললুম : বোধহয় ফিরে গেছে।

উহুঁ, আপনাদের না বলে সে কিছুতেই ফিরবে না।

ভূপেনবাবু একটু দমে গিয়েছেন দেখে বললুম : সিয়াং জেলায় আর কোন জাত নেই ?

উৎসাহ পেয়ে ভদ্রলোক বললেন : গালঙরা আছে এবং এরাই সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং জাত।

তাই নাকি !

ভূপেনবাবু আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন : স্বামী বিবেকানন্দের একটা অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের মনে আছে কি ! হিমালয়ের কোন গ্রামে তিনি একটি তিব্বতী পরিবারে একজন স্ত্রীর ছ'জন স্বামী দেখেছিলেন। অবশ্য এ দেশেও মহাভারতের দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল বলে আমরা জানি।

স্বাতি বলল : দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের মধ্যেও এই রীতির প্রচলন আছে বলে শুনে এসেছি।

ভূপেনবাবু বললেন : গালঙদের মধ্যেও এই ব্যবস্থা দেখবেন। অর্থনৈতিক কারণেই গালঙদের কোন বড় ভাই কন্যাপণ দিয়ে একটি মেয়ে বিয়ে করে আনলে সে অন্য ভাইদেরও স্ত্রী বলে গণ্য হয়। পরে আর কোন ভাইও যদি আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনতে পারে, তবে সেও সব ভাইদের স্ত্রী হয়ে বাস করে। এই প্রথার বিরুদ্ধে মন্তব্য করে স্বামী বিবেকানন্দ কী উত্তর পেয়েছিলেন মনে আছে তো ?

স্বাতি বলল : না।

সেই তিব্বতীরা তাঁকে বলেছিল, সাধু হয়ে মানুষকে তুমি স্বার্থপরতা শেখাতে চাও ! এ আমার ভোগের জিনিস, অন্যের নয়—এ রকম ভাবা কি অন্যায় নয় !

কাকতি স্বাতির দিকে চেয়ে বলল : আপনারা পরশুরাম কুণ্ডের কথা শুনতে চেয়েছিলেন না!

স্বাতি বলল : হ্যাঁ।

তবে এবারে পরশুরাম কুণ্ডের কথাই বলুন না ভূপেনবাবু!

ভূপেনবাবু থমকে গেলেন খানিকটা, তারপর সামলে নিয়ে বললেন : পরশুরাম কুণ্ডের কথা!

আমি বললুম : কোন্ পথে সেখানে গিয়েছিলেন তাই আগে বলুন।

ভূপেনবাবু বললেন : আমি গিয়েছিলাম তিনসুকিয়া থেকে। ব্রাঞ্চ লাইনে তালাপ নামে একটা স্টেশন আছে প্রায় চৌত্রিশ কিলোমিটার দূরে। সেখান থেকে মাইল তিন-চার দূরে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়েছিলাম ফেরিতে। ওপারে নিউ:সদিয়া। সেখান থেকে অরুণাচলের বাসে লোহিত জেলার প্রধান শহর তেজু। দিঘারু নামের একটা পাহাড়ী নদী নাকি পথঘাট প্রায়ই নষ্ট করে। তেজু থেকে পরশুরাম কুণ্ড মাইল পনের দূরে লোহিত নদীর পরপারে।

একটু থেমে বললেন : আমার মনে হয় নর্থ লখিমপুর থেকে গেলে ব্রহ্মপুত্র বোধহয় পেরোতে হয় না। ও লাইনের গোগামুখ স্টেশন তো ডিব্রুগড়ের উল্টো দিকে। শেষ স্টেশন মুরকঙ সেলেক বোধহয় নিউ সদিয়ার কাছাকাছি। পাহাড় বা নদীর কোন বাধা আছে কিনা তা জানি না।

স্বাতি বলল : কুণ্ডের নাম পরশুরাম কুণ্ড হল কেন?

ভদ্রলোক বললেন : কুঠার দিয়ে মাতৃহত্যার পর পরশুরাম তো দেশের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করেছিলেন, এই কুণ্ডে স্নান করেই তাঁর হাতের কুঠার খসে পড়েছিল।

পরশুরাম তাঁর মাকে হত্যা করেছিলেন কেন?

স্বাতির এই প্রশ্নে ভূপেনবাবু কাবু হলেন। তাঁকে অপ্রতিভ হতে না দিয়ে আমি বললুম : তাঁর পিতা জমদগ্নির আদেশে।

কিন্তু এমন নিষ্ঠুর আদেশ তিনি কেন দিলেন ?

বললুম : জমদগ্নির স্ত্রী ছিলেন রাজা প্রসেনজিতের কন্যা। এক দিন স্নান করতে গিয়ে তিনি রাজা চিত্ররথকে দেখলেন তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে জলকেলি করতে। ত্রস্ত হয়ে তিনি আশ্রমে ফিরলেন। তাঁর অবস্থা দেখে জামদগ্নি রেগে তাঁর পুত্রদের বললেন মাকে হত্যা করতে। বড় চারটি ছেলে এ কাজে রাজী হল না বলে জমদগ্নির শাপে তারা জড় হয়ে গেল। পরশুরাম এই আদেশ পালন করলেন বলে ঋষি খুশী হয়ে বললেন, তুমি বর নাও। পরশুরাম কী বর চাইলেন জানো ?

বল।

পরশুরাম বললেন, মায়ের পুনর্জন্ম হোক, নিজের পাপমুক্তি ও এই হত্যার বিস্মৃতি হোক, ভাইদের হোক জড়ত্ব মুক্তি। এই সঙ্গেই নিজের দীর্ঘ জীবন ও যুদ্ধে অজেয় হবার বরও নিলেন।

স্বাতি হেসে বলল : খুব বুদ্ধিমান ছেলে।

ভূপেনবাবু প্রচুর আনন্দলাভ করে বললেন : এই অঞ্চলের মিশমিরা নিজেদের বলে পরশুরামের বংশধর। এদেরও তিনটি গোষ্ঠী আছে। তাদের মধ্যে ইদুরাই বেশি পরিচিত।

স্বাতি বলল : দেখেছেন তাদের ?

দেখেছি বৈকি। বেশ সুশ্রী দেখতে। কিন্তু পুরুষদের মুখে দাড়িগোঁফ কম বলে ছেলে মেয়ে চিনতে ভারি অসুবিধা হয়।

কাকতির দিকে তাকিয়ে দেখলুম যে সে আবার অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু কিছু বলছে না।

ভূপেনবাবু বললেন : মিশমি পাহাড়ের মিশমিরা ছাড়া এই লোহিত জেলায় আরও কয়েকটি জাত আছে, তাদের নাম পদম খাম্‌তি ও সিংফো। খাম্‌তি আর সিংফোরা শুনেছি বৌদ্ধ।

তারপরেই বললেন : তিরাপ অঞ্চলে আমি যাই নি, ব্রহ্মদেশের সীমান্তে তিরাপ। আসামের মার্গারিটা থেকে ঠিক দক্ষিণে এদের

প্রধান শহর খোল্‌সা। এই জেলার প্রধান জাতি হল তাংসা। তাংসা মানে পাহাড়ী মানুষ। এরা ছাড়াও আছে নক্‌তে ও ওয়াঞ্চোরা।

কাকতি বলে উঠল: একটু সংক্ষেপে বলুন।

ভূপেনবাবু বিব্রত বোধ করলেন দেখে আমি বললুম: যতটুকু জানেন তা বলতে দ্বিধা করবেন না।

ভূপেনবাবু বললেন: বিশেষ কিছু জানি না। শুনেছি লুঙ্গিপরা তাংসারা দেখতে কতকটা বর্মার লোকের মতো। এই নিরীহ শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবীদের দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে এক সময় এরা নরমুণ্ড শিকারী যোদ্ধা ছিল। ওয়াঞ্চোরা দেখতে খুব সুশ্রী। কিন্তু কাপড় পরা পছন্দ করে না। অলঙ্কারে ঢাকে দেহ। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে নক্‌তেরা এখন বৈষ্ণব, অথচ আগে এরা নরমুণ্ড শিকারী ছিল।

বাহিরে একটা জীপের শব্দ শুনেছিলুম। এইবারে হৈ হৈ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলেন মিস্টার মর্গান, তাঁর পিছনে ইভা।

## ১০

মিস্টার মর্গান উচ্ছ্বসিত ভাবে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: আমাদের কী সৌভাগ্য বলুন! কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেও আপনি আমাদের মনে রেখেছেন!

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বসতে দিয়ে বললুম: সৌভাগ্য আমার বলুন। দূরে চলে গিয়েও আমি আপনাদের বন্ধুতা হারাই নি।

মিস্টার মর্গান শিলঙ অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। শিলঙেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তিনিই আমাকে চেরাপুঞ্জিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিবার নেই। হাসিখুশি মানুষ, ব্যবহারে আন্তরিকতা আছে। বললেন: ভদ্রতায় আমরা আপনার সঙ্গে এঁটে উঠব না। তাই কাজের কথাটা আগেই বলি। আজ রাতে আমাদের কিছু সময় দিতে হবে। কোন আপত্তি শুনব না।

আমি বললুম: তাহলে আপনারা ফিরবেন কী করে?

মিস্টার মর্গান গম্ভীর হয়ে বললেন: কাল গৌহাটি অফিসে যে আমার অনেক কাজ!

তারপরেই হেসে বললেন: ইভাকে বলেছিলাম আপনি এলে ফোনে একটা খবর দিতে। আজ তার কাছ থেকে খবর পেয়েই চলে এসেছি।

ভূপেনবাবু কিছু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এই বারে বললেন: আমি এবারে উঠি।

বলেই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে কাকতিও। মিস্টার মর্গান বললেন: তুমি চলে যেও না, ফিরে এসো।

তাঁরা বেরিয়ে যেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ব্যাপারখানা কী ?

মিস্টার মর্গান বললেন : আজ আমরা এক সঙ্গে ডিনার খাব। ইভাই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

স্বাতি একটু লজ্জিত ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি ইভার দিকে তাকিয়ে বললুম : কেন এসব করছ বল তো !

ইভা বলল : ওঁরই হুকুমে।

বলে মিস্টার মর্গানের দিকে তাকাল।

মিস্টার মর্গান স্বাতিকে বললেন : আপনার কাছে আমাদের একটা অনুরোধ আছে।

বলুন।

বলে স্বাতি তাঁর দিকে তাকাল।

মিস্টার মর্গান বললেন : দুদিনের জন্যে হলেও শিলঙে আপনাদের একবার আসতে হবে।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল : এবারে পারব কি !

না, না। পারতেই হবে।

আমি বললুম : যদি গৌহাটি হয়ে ফিরি তো নিশ্চয়ই যাব।

তাহলে আর কোথা দিয়ে ফিরবেন ?

বললুম : আগরতলা যাবার ইচ্ছা আছে। তাহলে আর ট্রেনে ফিরব না।

মিস্টার মর্গান বললেন : ট্রেনে খুব কষ্টের জানি বলে শুনেছি। আমি নিষ্ঠুর হতে চাই না।

তারপরেই বললেন : কাল সকালে যাওয়া কি সম্ভব নয় !

এবারে আমি গম্ভীর হয়ে বললুম : আপনার অফিসের কাজ !

হা হা করে হেসে উঠলেন মিস্টার মর্গান, বললেন : কথাটা দেখছি আমাকেই ফিরিয়ে দিলেন।

এক সময়ে তিনি ইভাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি তোমার স্বামীর কথা এঁদের বলেছ ?

ইভা বলল : অনেক দিন আগে একদিন বলেছিলাম। সে কথা কি আপনার মনে আছে?

বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

সে কথা কি ভুলতে পারি!

মিস্টার মর্গান বললেন : আপনি তো নাগাল্যাণ্ড যাচ্ছেন, ওদের আণ্ডার গ্রাউণ্ড রাজনীতির সম্বন্ধে হয়তো কিছু জানবার সুযোগ পাবেন।

বললুম : জানবার ইচ্ছে তো ষোল আনা আছে, কিন্তু—

মিস্টার মর্গান বললেন : তুমি সাহায্য করতে পার না ইভা?

ইভা মাথা নত করল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার মর্গান বললেন : বুঝেছি, ভয় পাচ্ছ তুমি। তা ভয়ের কথাই বটে। নাগাদের বিশ্বাস হারানো উচিত নয়।

আমি বললুম : কিন্তু চিরকাল কি তাঁকে বন্দী থাকতে হবে!

মিস্টার মর্গান বললেন : ওরা অত্যন্ত আশাবাদী। তাই ভাবছে যে ওদের সুদিন আসতে আর দেরি নেই।

ইভার স্বামীর কথা কাকতির জানা নেই বলেই আমি মনে করি। এ কথা নিশ্চয়ই সে সবার কাছে গোপন রেখেছে। তাই কাকতি ফিরে আসবার আগেই আমি ইভাকে একটা অনুরোধ জানালুম। বললুম : তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে তোমার স্বামীর নাম ও ঠিকানা এক টুকরো কাগজে লিখে আমাকে দিও। তোমার নিজের ঠিকানাও। কোহিমায় যদি কোন খবর সংগ্রহ করতে পারি তো তোমায় জানাব।

ইভার দৃষ্টিতে আমি খানিকটা দ্বিধা দেখতে পেলুম। আর মিস্টার মর্গানও তা দেখতে পেয়ে বললেন : দ্বিধা কিসের! উনি তোমার ভালোর জন্যেই বলছেন।

জানি।

তবে?

ইভা বলল : আমি অন্য ভয় পাচ্ছি।

আমি বললুম : অসঙ্কোচে বল।

বেদনার্ত স্বরে ইভা বলল : কোন চিঠিতেও আমাকে তার ঠিকানায় দেয় না। আমি ওর চিঠি পাই, কিন্তু উত্তর দিতে, হয় অন্যের ঠিকানায়। তার ঠিকানা পেলে আমি নিজেই তো তাকে দেখে আসতে পারতাম !

মিস্টার মর্গানের কাছেও এ সংবাদ নূতন। তাই বললেন : তুমি কি তাহলে অন্য কিছু সন্দেহ কর ?

ইভা লজ্জিতভাবে মাথা নত করল।

আমি বললুম : থাক, আর কিছু বলতে হবে না। ইচ্ছা করলে তুমি তার নামটা আর যে ঠিকানা জানো তাই আমাকে দিতে পার।

মিস্টার মর্গান কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। দরজার বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল এবং পরক্ষণেই কাকতি এসে ঘরে ঢুকল।

মিস্টার মর্গান আমাদের সঙ্গে কফি খেলেন, আর আমরা তাঁর সঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে ডিনার খেলুম। তারপর আমাদের আবার টুরিস্ট বাংলোয় পৌঁছে দিলেন।

ভোর পাঁচটায় ট্রেন ধরতে হবে বলে স্বাতি কিছু উদ্বিগ্ন হয়েছিল। কাকতি আগেই ম্যানেজারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেছিল : চৌকিদার আমাদের জাগিয়ে দেবে ভোর সাড়ে চারটেয়, মর্নিং টি দেবে, রিক্সা ডেকে দেবে। তার পরামর্শেই আমরা সন্ধ্যে বেলাতেই বিল চুকিয়ে দিয়েছিলুম। মিস্টার মর্গান এ সমস্তই দেখেছিলেন। তবু তিনি বিদায় নেবার আগে বললেন : রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোন, আমি তো আছিই।

স্বাতি বলল : আপনি আর কষ্ট করবেন না।

যদি আনন্দ পাই, তাতেও কি বঞ্চিত করতে চান।

বলে হাসতে হাসতে তাঁরা বিদায় নিলেন।

রাতে শুয়ে পড়তে আমরা দেরি করি নি। তাই কেউ ডাকবার আগেই আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আলো জ্বেলে দেখলুম যে তখন সবে চারটে বেজেছে। চৌকিদারকে আমিই জাগালুম। বললুম: চা তৈরি হলেই দিয়ে যাও।

স্টেশনে যাবার জন্য বেরিয়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলুম। চৌকিদার রিক্সা ডাকে নি, তার বদলে ইভাকে নিয়ে মিস্টার মর্গান হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই বললেন: গুড মর্নিং।

নমস্কার করে স্বাতি বলল: শেষ রাতেই আপনারা এসে গেছেন?

মিস্টার মর্গান বললেন: উপায় তো নেই। ইভা সারা রাত ছটফট করেছে।

কেন?

মিস্টার মর্গান ইভাকে তাড়া দিয়ে বললেন: দেরি করছ কেন, বার করে দাও।

ইভা শান্ত ভাবে বলল: তার জন্যে তাড়া নেই। ট্রেন রাইট টাইম আছে। সময় মতো পৌঁছতে হবে।

চৌকিদার আমাদের মালপত্র মিস্টার মর্গানের গাড়িতে তুলে দিল। স্বাতি বকশিশ দিল তাকে। সময় মতোই আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেলুম।

নির্দিষ্ট সময়ের দু'চার মিনিট আগেই আসাম মেল এসে গেল। বড় লাইনের গাড়ি দিল্লী থেকে সমস্তিপুর পর্যন্ত আসে। তারপরে মিটার গেজের ট্রেন গৌহাটির উপর দিয়ে যায় ডিব্রুগড় টাউনে। এমন দূর পাল্লার ট্রেন যে তার সময়সূচী অনুসরণ করে চলতে পারে তা দেখে আনন্দ হয়। কিন্তু ট্রেন থামার পরেই বিমর্ষ হতে হল। ট্রেনে মাত্র একখানি প্রথম শ্রেণীর কোচ। কোন কারণে আর দুখানি নেই। অথচ গৌহাটি থেকে বহু যাত্রী এই ট্রেনে উঠবে।

মিস্টার মর্গান কিছু উদ্বিগ্ন হয়েছেন দেখে বললুম : ভাববেন না, আমাদের ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।

কী করে?

কাল টিকিট কেটে রিজার্ভ করে রেখেছি। দিনের ট্রেন বলে আর কেউ তা করেন নি! কাজেই দুজন যাত্রী নামলেই আমরা উঠে পড়তে পারব।

ইভাও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখতে লাগল কেউ নামছেন কিনা। আর মিস্টার মর্গান একজন টিকিট কালেক্টারের হাত টেনে ধরলেন। বললেন : ওটা কি রিজার্ভেশন চার্ট?

তার উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই আমাদের নাম দেখে নিলেন। তারপরে, চেপে ধরলেন তাকে : কোথায় জায়গা দিচ্ছেন বলুন।

দেখছি, দেখছি।

বলে সে বেচারা পালিয়ে গেল।

একাধিক যাত্রী নামলেন। আমরাও উঠে পড়লুম। কিন্তু তিল ধারণের জায়গা নেই। একজন সহৃদয় যাত্রী তাঁর ছড়ানো পা গুটিয়ে নিলেন বলে স্বাতি বসতে পারল। আমি কুলির মাথা থেকে মাল পত্র নামিয়ে রেখে প্ল্যাটফর্মে নেমে এলুম।

ইভা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললুম : এইবারে দাও।

ইভা তার ব্যাগ খুলে এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দিল। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে তার স্বামীর নাম লেখা। একটা ঠিকানাও আছে। দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলল : আপনি চাইলেন বলেই দিচ্ছি। কিন্তু কোহিমা তো ছোট জায়গা নয় যে এই ঠিকানা নিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে পারবেন!

বললুম : অনায়াসেই তো পেয়ে যেতে পারি!

মিস্টার মর্গান বললেন : ঠিক তাই।

গৌহাটিতে নতুন কোন কোচ লাগল না। যাত্রীরা কেউই দ্বিতীয়

শ্রেণীতে উঠলেন না। ঠেলে ঠুলে কোন মতে একই গাড়িতে উঠে করিডরে ভিড় করে রইলেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আমি বললুম: আপনারা কি আজ বিকেলে ফিরবেন?

ইভা হেসে বলল: না।

তবে?

আমরা এখুনি ফিরে যাচ্ছি।

মিস্টার মর্গানের দিকে চেয়ে আমি বললুম: আপনি যে আজ অফিসে কাজের কথা বলেছিলেন?

অবলীলাক্রমে ভদ্রলোক বললেন: এখানকার কাজ তো হয়ে গেছে!

কী রকম?

টেলিফোনেই সেরে নিয়েছি। এই সময়ে বেরিয়ে পড়লে সময় মতোই শিলঙের অফিসে পৌঁছতে পারব।

বলে হাসতে লাগলেন।

ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে কাকতি এল হাঁপাতে হাঁপাতে। খপ্ করে আমার পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করতেই আমি সরে গিয়ে বললুম: এ কী হচ্ছে?

কাকতি বলল: আশীর্বাদ করে যান।

আমি গাড়ির হাতল ধরে উঠে পড়ে বললুম: কিসের আশীর্বাদ!

জনতার জয় হোক, এই আশীর্বাদ।

রাজনীতি!

না। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ন্যূনতম দাবী সবাই হাসি মুখে মেনে নিক। সবকিছু আমরা চাই নে, কিন্তু চাইবার অধিকার আছে। এই সত্য মেনে নিলেই আমরা সুখী হব।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। তারই সঙ্গে কাকতিকে চলতে দেখে বললুম : এ আশীর্বাদ করার অধিকার কি আমার আছে ?

কাকতি বলল : আপনার প্রার্থনাই আশীর্বাদ।

বললুম : আমি এ সম্মানের যোগ্য নই। তবু প্রার্থনা করব, ধর্মের জয় হোক, জয় হোক আদর্শের।

ট্রেন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। ইভা হাত নাড়ছিল। আর রুমাল উড়িয়েছিলেন মিস্টার মর্গান। আমিও হাত নাড়তে লাগলুম। দু চোখ ঝাপসা হয়ে গেল, আর তাদের দেখতে পেলুম না।

## ১১

নিজেদের কামরায় এসে দেখলুম যে স্বাতি আমার জন্যে একটু-খানি জায়গা সংগ্রহ করতে পেরেছে। যে ভদ্রলোক পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিলেন, তিনিই উঠে বসেছেন। আমি দুজনের মাঝখানে বসলুম।

স্বাতিকে প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। আমি তাকাতেই বলল: এইবারে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বললুম: তার মানে এখন থেকে আমাদের চোখ কান খুলে চলতে হবে।

স্বাতি বলল: এই সীমান্ত রাজ্যগুলি সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা না জানারই সামিল। টুরিস্ট লিটারেচার পড়ে আমাদের জানার পরিধি একটুও বাড়ে নি।

আমার পাশের ভদ্রলোক যে বাঙালী তা আমরা বুঝতে পারি নি। সহসা তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন: আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

এই আকস্মিক প্রশ্নের বিস্ময়টা কেটে যাবার পরেই বললুম। নাগাল্যাণ্ড মণিপুর ও মিজোরাম ভ্রমণে বেরিয়েছি।

শখের ভ্রমণ?

হ্যাঁ, শখেরই বলতে পারেন।

ভদ্রলোক বললেন: তার মানে ডিমাপুরে নেমে কোহিমার বাস ধরবেন।

বললুম: এ ছাড়া তো আর কোন উপায় নেই।

পথ তো একটাই। আর ডিমাপুরে আপনাকে ইনার লাইন পারমিট সংগ্রহ করতে হবে সরকারী অফিস থেকে। আজ বোধহয় পাবেন না।

কেন? দুপুর বারোটাতেই তো আমরা ডিমাপুরে পৌঁছে যাব।

ভদ্রলোক হেসে বললেন: আজ গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্মদিন। দেশটা তো সেকুলার। মাইল কয়েক দৌড়ে যাবার আগে দপ্তর খোলা আছে কিনা জেনে নেবেন।

তার মানে পুরো একটা দিন নষ্ট হবে।

এক দিন নয়, দেড় দিন বলুন।

কেন?

কালকের রাতটাও আপনাদের ডিমাপুরেই কাটাতে হবে। বাস পাবেন ভোর বেলায়।

বিকেলে বাস নেই?

ভদ্রলোক বললেন: থাকতে পারে। আর না থাকলেও ট্যাক্সি পাবেন শেয়ারে। কিন্তু শীতের দেশে রাতে পৌঁছবেন, থাকবার ব্যবস্থা করেছেন তো!

বললুম: না।

বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই কয়েকটা হোটেল আছে শুনেছি, সে আপনাদের পছন্দ হবে কি! এম.এল.এ. হস্টেলে থাকবার চেষ্টা করবেন। সকালের দিকে পৌঁছলে তা সম্ভব।

ভদ্রলোক আরও অনেক বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিলেন। কোহিমায় কোন যানবাহন পাওয়া যাবে না। অথচ পাঁচ মাইল লম্বা শহর। হোটেলগুলোও নাকি অপরিচ্ছন্ন এবং কমার্সিয়াল রেপ্রেজেন্টেটিভদের জন্যে সব সময়েই স্থানাভাব। যারা ইম্ফলে যাবে, তারা কোহিমায় সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসে, পরদিন যায় ইম্ফলে। তাতে দুটো সুবিধে। প্রথম, কোহিমায় রাত্রিবাস করতে হয় না। আর দ্বিতীয়, ইম্ফলের সব বাস ছাড়ে ডিমাপুর থেকে, কোহিমা থেকে

জায়গা পাওয়া অনিশ্চিত। মণিপুর স্টেটের বাস তো কোহিমা শহরের প্রান্ত ঘেঁষে বেরিয়ে যায়।

আমি বললুম: কোহিমার কথা পরে ভাবব। এখন আপনি ডিমাপুরের বিষয়ে কিছু বলুন।

ভদ্রলোক পালটা প্রশ্ন করলেন: ডিমাপুরে কোথায় উঠবেন ঠিক করেছেন?

বললুম: টাইম টেবলে দেখেছি, স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে।

একখানা এঁদো ঘর আছে। আর শুধু ডিমাপুরে নয়, এ অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই আছে। কিন্তু কোথাও খালি পাবেন না।

কেন?

মনে হবে পাকাপাকি ভাবে লোক বাস করছে। আর একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হবেন। বাঙালী ছেলেরা সর্বত্র ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সবাই কমার্সিয়াল রেপ্রেজেন্টেটিভ। তারা এই অঞ্চলে নানা কোম্পানীর নানা জিনিস বেচছে। সস্তায় থাকবার জায়গাগুলো সব ভর্তি। অনেক জায়গায় তারা দল বেঁধে মেস করেও আছে।

তাহলে আমরা থাকব কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন: একটু বেশি পয়সার জায়গা মাঝে মাঝে খালি পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটা হল নাগাল্যাণ্ড স্টেট ট্রান্সপোর্টের রেস্ট হাউস। স্টেশনের খুব কাছেই এই জায়গা, স্টেশনের কুলিই আপনাকে নিয়ে যাবে।

আর সেখানেও জায়গা না পেলে?

হোটেল আছে অনেকগুলো। একটা টুরিস্ট বাংলো আর দুটো সার্কিট হাউসও আছে। বেশি পয়সার জায়গা পেয়েই যাবেন। ডিমাপুর এখন খুব ব্যস্ত শহর। শুধু নাগাল্যাণ্ডের নয়, সমস্ত মণিপুর রাজ্যেরও মাল যাচ্ছে এখান থেকে। শহরটা ক্রমেই ফেঁপে উঠছে।

আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম : ডিমাপুরে তাহলে বাসস্থানের অভাব হবে না। কী বলেন!

কিন্তু স্বাতি অন্য একটা প্রশ্ন ভদ্রলোকের দিকে ছুঁড়ে দিল : দেখবার কিছু নেই?

ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, সামলে নিয়ে বললেন : শুনেছি, মহাভারতের যুগে হিড়িম্বা রাক্ষসীর রাজত্ব ছিল এখানে।

এখানে!

তাইতো শুনেছি।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আমার মনে পড়ে গেল মহাভারতের পুরনো কথা। জতুগৃহে পুড়িয়ে মারবার জন্যে দুর্যোধন পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠিয়েছিলেন। বারণাবত একটি মনোরম নগর। তখন সেখানে পশুপতির উৎসব উপলক্ষ্যে বহু যাত্রী সমাগম হয়েছিল। এই বারণাবত কোথায় তা জানা নেই। শুধু এইটুকু অনুমান করা যায় যে এই স্থান ছিল গঙ্গার নিকটে। তার কারণ জতুগৃহ দগ্ধ হবার পরে পাণ্ডবরা যখন পলায়ন করছিলেন তখন বিদুরের একজন বিশ্বস্ত অনুচর গঙ্গার তীরে অপেক্ষা করছিল। তার সঙ্গে ছিল একটি যন্ত্রযুক্ত নৌকা, মানে মোটর লঞ্চ। সেই নৌকায় চেপে পাণ্ডবরা গঙ্গা পার হয়েছিলেন। উত্তর কাশীতে আমরা শুনেছি যে মহাভারতের এই জতুগৃহ ছিল উত্তর কাশীতে। সেই স্থানটি এখনও নির্দেশ করা হয়।

এই ঘটনার পরেই হিড়িম্বার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ভীমের। পাণ্ডবরা নক্ষত্র দেখে দক্ষিণ দিকে চলেছিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পরদিন সন্ধ্যা বেলায় তাঁরা এক অরণ্যে এসে উপস্থিত হলেন। ক্লান্ত দেহে শুধু জল পান করে সবাই নিদ্রা গেলেন, জেগে রইলেন ভীম।

অনতিদূরে এক তালগাছের উপরে বাস করত হিড়িম্ব রাক্ষস. হিড়িম্বা তার বোন। হিড়িম্ব নরমাংসের লোভে তার বোনকে পাঠাল পাণ্ডবদের কাছে।

আমি নিঃশব্দে আছি দেখে স্বাতি বলল : কী ভাবছ ?

বললুম : হিড়িম্বার কথা ভাবছি।

স্বাতি সকৌতুকে বলল : বল না শুনি।

হেসে বললুম : ভীমকে দেখে রাক্ষসী হিড়িম্বা প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে ভীমের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল। কুন্তী তাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, দেব-কন্যার মতো দেখতে, তুমি কে ? এই বনের দেবতা, না অপ্সরা ?

স্বাতি বলল : হঠাৎ এ কথা তোমার কেন মনে এল ?

বললুম : দুটো কারণে। একটা হল, ডিমাপুরে হিড়িম্বার রাজ্য থাকা সম্ভব ছিল কিনা। আর রাক্ষসীরা দেখতে মানুষের মতো ছিল, না তার' যে কোন রূপ ধারণ করতে পারত।

ভদ্রলোক বিস্ময়াপন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এইবারে বললেন : আপনার কী মনে হয় ?

বললুম : কুলু উপত্যকার মানালিতে আছে হিড়িম্বার মন্দির। এই উপত্যকার সবচেয়ে শক্তিশালী দেবী। তিনি না আসা পর্যন্ত কুলুর দশেরা উৎসব শুরু হয় না। তাই হিড়িম্বার রাজ্য ডিমাপুরে ছিল শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু আপত্তিও করা যায় না।

কেন ?

নাগাল্যাণ্ডে নাগরাজ্য ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু মণিপুর সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। এই সব তর্কের মধ্যে আমাদের না যাওয়াই ভাল।

স্বাতি বলল : আর হিড়িম্বার রূপ সম্বন্ধে ?

বললুম : পুরাণকাররা বলেন যে রাক্ষসরা কামরূপী, অর্থাৎ তারা ইচ্ছা মতো রূপ ধারণ করতে পারে। ছদ্মবেশ নেওয়া এক কথা, আর ইচ্ছা মতো যে কোন রূপ ধারণ করা এক নয়, সম্ভবও নয়। পুরাণ বা মহাভারতকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে এই সব উক্তি বাদ দেওয়া দরকার।

তবে কি রাক্ষসীরাও সুন্দরী ছিল?

কুৎসিত ছিল মনে করবার কোন কারণ দেখি না। তাহলে দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমন দৈত্যের মেয়ে শচীকে বিয়ে করতেন না।

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন! বললেন: বলেন কি! দেবরাজের স্ত্রী ছিলেন দৈত্যের মেয়ে!

বললুম: পুরাণে তো এ রকম উদাহরণ অনেক আছে। রাবণের বাবা বিশ্রবা মুনির কথাই ধরুন না! তিনি ব্রাহ্মণ ঋষি, বিয়ে করেছিলেন ভরদ্বাজ ঋষির মেয়েকে। তাঁদের বড় ছেলে যক্ষদের রাজা কুবের। তারপর বিয়ে করলেন সুমালী রাক্ষসের মেয়ে কৈকসীকে। এঁরই ছেলেমেয়ে রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ও শূর্পণখা।

ভদ্রলোক বললেন: এটা কী রকম হল?

বললুম: এ যেন বাঙালীর সঙ্গে পাঞ্জাবীর বিয়ে, কিংবা দক্ষিণ ভারতীয়ের সঙ্গে রাজস্থানীর।

স্বাতি বলল: অথবা নাগা ছেলের সঙ্গে মিজো মেয়ের বিয়ে। কিংবা সাঁওতাল ছেলের সঙ্গে মুণ্ডা মেয়ের বিয়ে।

বললুম: মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। সে যুগে বাঙালী বা পাঞ্জাবী ছিল বলে মনে হয় না। তার বদলে ছিল দেব দানব রাক্ষস যক্ষ গন্ধর্ব নাগ বানর প্রভৃতি জাতি। রূপে পার্থক্য হয়তো ছিল, কিন্তু আসলে সবাই ভারতীয়। পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হত, বন্ধুতাও হত। যুদ্ধ হত যুদ্ধের কারণ ঘটলে। যেমন লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কাটল, আর রাবণ চুরি করে নিয়ে গেল সীতাকে। তারপর যুদ্ধ।

স্বাতি প্রশ্ন করল: ডিমাপুরে মহাভারতের যুগের কিছু দেখবার আছে?

ভদ্রলোক বললেন: মহা মুশকিলে ফেললেন।

কেন?

পুরাণ-টুরাণ তো পড়ি নি, পুরাণের কোন কথাই জানি নে। কার

কাছে কবে এই হিড়িম্বার কথা শুনেছিলাম, তাও মনে নেই। সেই কথাটি বলতে গিয়েই বিপদ বাধিয়েছি।

স্বাতি হেসে বলল : বিপদ কিসের !

ভদ্রলোক বললেন : শুনেছিলাম যে এই অঞ্চলের প্রথম রাজা ছিলেন ঘটোৎকচ।

আমি বললুম : তাই বলুন। এ অঞ্চল হিড়িম্বার রাজত্ব ছিল না বললেই সব গোলমাল মিটে গেল।

কেমন করে ?

হিড়িম্বার দেশ ছিল কুলু উপত্যকা, আর তাঁর ছেলে ঘটোৎকচ এই অঞ্চল জয় করে রাজা হয়ে বসেছিলেন।

স্বাতি হেসে বলল : এ রকম যুক্তি দিলে সব গোলমালই মিটে যায়।

কী রকম ?

গঙ্গায় স্নান করবার সময় অর্জুনকে উলূপী টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু তার বাপের বাড়ি ছিল নাগাল্যাণ্ডে।

বললুম : এই ব্যাপারটা গোঁজামিল দেওয়া খুব কঠিন নয়। উলূপী অর্জুনকে পাতালে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাতাল হল গঙ্গাসাগর। কপিলমুনির আশ্রম ছিল পাতালে। আর অর্জুন যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার পিছনে মণিপুরে এসেছিলেন, তখন উলূপীর প্ররোচনাতেই চিত্রাঙ্গদার ছেলে বভ্রুবাহন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে অচেতন করেছিল। আর নাগলোক থেকে উলূপী মণি এনে অর্জুনকে বাঁচিয়েছিলেন। এই নাগলোক হল নাগাল্যাণ্ড।

তারপরেই বললুম : নাগদের মধ্যে তখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল।

ভদ্রলোক বললেন : কী করে জানলেন ?

বললুম : উলূপী বিধবা ছিলেন, গরুড় তাঁর স্বামীকে খেয়ে ফেলেছিল। উলূপীর বাবা এই বিধবা মেয়েটি অর্জুনকে দিয়ে-

ছিলেন। না দিয়ে অবশ্য উপায় ছিল না, উলূপীই অর্জুনকে ভুলিয়ে এনেছিল।

ভদ্রলোক বললেন: মহাভারতখানা দেখছি আপনি গুলে খেয়েছেন!

বললুম: খেয়ে হজম করতে পারি নি।

কেন?

যতবার পড়ি, মনে হয় নতুন কথা পড়ছি। যা মনে আছে, তার চেয়ে বেশি কথাই ভুলে গেছি দেখি।

গৌহাটি আমরা বহু আগেই ছাড়িয়ে এসেছি। একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। এইবারে চাপারমুখ নামে একটা জংশন স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল। যাত্রীদের অনেকেই চা পেলেন এই স্টেশনে। স্বাতি আমাকেও চা খাওয়াল। তারপরে দুপুরের খাবার কথাও বলে দিল। ট্রেন বারোটা আট মিনিটে পৌঁছবে ডিমাপুরে। তার আগেই আমরা ভাত খেয়ে নেব। একটু আগে হলেও নিশ্চিন্ত হয়ে নামা যাবে।

টাইম টেবল খুলে আমি এই জংশন স্টেশনটি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিলুম। এখান থেকে ব্রহ্মপুত্রের ধারে শিলঘাট টাউনে যাওয়া যায়, পথে নওগাঁ। শিলঘাট থেকে স্টিমারে নদী পেরিয়ে তেজপুরে পৌঁছনো যায়। অরুণাচলে যাবার এও একটা পথ।

দশটার সময় আমাদের ট্রেন লামডিং জংশনে পৌঁছবে। এটিই বোধহয় এ লাইনের সবচেয়ে বড় স্টেশন। লামডিং থেকে শিলচরের পথ। এই পথের ওপারে বদরপুর জংশন থেকে অন্য পথ গেছে ত্রিপুরার ধর্মনগরে।

কারও কাছে শুনেছিলুম যে লামডিং থেকে বদরপুর নাকি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। পাহাড়ের উপর দিয়ে গেছে রেলপথ, আর মাঝে মাঝেই পাহাড় ভেদ করে সুড়ঙ্গপথ। এত সুড়ঙ্গ নাকি ভারতের আর কোনখানে নেই। আমাদের সহযাত্রী ভদ্রলোকও

এই কথা বললেন: আপনারা মিজোরামও যাবেন তো। তাহলে দিনের ট্রেনে লামডিং থেকে শিলচরে যাবেন। পাহাড়ের রূপ দেখে খুব আনন্দ পাবেন।

আমি দেখলুম যে গৌহাটি থেকে বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেস সরাসরি শিলচরে যায়। রাত আটটায় গৌহাটি ছেড়ে শিলচরে পৌঁছয় সকাল সাড়ে দশটায়। কিন্তু অর্ধেকটা পথ অন্ধকারেই পেরোতে হয়, ভোর পাঁচটায় পৌঁছয় লোয়ার হাফলং নামে একটা বড় স্টেশনে। লামডিং থেকে রাত সোয়া নটায় ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জার ছাড়ে। এ ট্রেন আরও আগে হাফলং পাহাড় পেরিয়ে যায়। কাজেই রাতে লামডিঙে থেকে ভোর ছটার ট্রেন ধরলে সমস্ত পথটা দেখতে দেখতে বিকেল পাঁচটায় বদরপুরে পৌঁছনো যায়। কিন্তু এ কাজ করলে আর একটা রাত কাটাতে হবে বদরপুরে।

স্বাতি বলল: বম্বে থেকে পুনে যাবার সময় আমরা পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম। এ পথ কি তার চেয়েও সুন্দর?

ভদ্রলোক বললেন: আমি তো ও পথ দেখি নি। তাই তুলনা করতে পারব না।

স্বাতি এবারে আমার দিকে তাকাল। আমি বললুম: এ পথ দেখতে হলে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে, আর কষ্টের কথা ছেড়ে দিলেও সময় লাগবে অনেক বেশি।

কেন?

ইম্ফল থেকে শিলচর প্লেনে কুড়ি মিনিটের পথ। পাহাড় ডিঙোতে যত সময় লাগে, তার চেয়ে বেশি সময় লাগে আকাশে উঠতে আর নামতে। এর চেয়ে কম ভাড়া নাকি এ দেশের আর কোথাও নেই।

ভদ্রলোক বললেন: ছোট প্লেন, শুনেছি মেঘের মধ্যে লাফায় খুব বেশি।

বললুম: ভেঙে পড়ার ভয় নেই তো, তাহলেই হল।

লামডিঙের পরে একটা ছোট স্টেশনে আমাদের খাবার এল। ডিমাপুরে পৌঁছবার অনেক আগেই আমরা নামবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলুম। আর কোন যাত্রী খেলেন না, তাঁদের খাবার আসবে ডিমাপুরে। আমাদের সহযাত্রী বাঙালী ভদ্রলোক সিমালুগুড়ি জংশনে নেমে শিবসাগর টাউনে যাবেন, সরকারী গাড়ি আসবে তাঁকে নিতে। পথ মাত্র দশ মাইল, কিন্তু কোন ট্রেন নেই। একজন অবাঙালী ভদ্রলোক তাঁর আগেই নামবেন মরিয়ানি জংশনে, তিনি যাবেন জোড়হাটে। ফার্কাটিং জংশনে নামলে তাঁকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। তাই উজিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন: লামডিং আর মরিয়ানির মধ্যে আজকাল কাজিরঙ্গ এক্সপ্রেস চলছে, কিন্তু তাতে তাঁদের সুবিধে হয় নি, গৌহাটি থেকে হলে সুবিধে হত। আমাদের তৃতীয় সহযাত্রী সেনাদলে কাজ করেন। তিনি এ লাইনের শেষ স্টেশন ডিব্রুগড়ে নামবেন রাত দশটার পরে। আমরা সবার আগে ডিমাপুরে নামলুম।

## ১২

ডিমাপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে আমি স্বাতিকে বললুম: তুমি একটুখানি দাঁড়াও, আমি একটু খোঁজ খবর নিয়ে আসি।

স্বাতি বলল: স্টেশনের খবরটা আগে নিও।

তাই নিলুম। রিটায়ারিং রুম খালি নেই। খালি থাকলেও এখানে থাকা সম্ভব হত কিনা জানি না। শুনলুম সার্কিট হাউসও কাছে, কিন্তু তার জন্যে তো সরকারী অনুমতি পত্রের দরকার। কোথায় কার কাছে ধর্ণা দিতে হবে জানা নেই। হোটেলের আব-হাওয়াও আমার ভাল লাগে না। তাই ঠিক করলুম প্রথমে নাগাল্যাণ্ড স্টেট ট্রান্সপোর্টের রেস্ট হাউসে খোঁজ নেব, তাতে ভোরবেলায় বাস ধরবারও সুবিধে হবে। সেখানে না হলে টুরিস্ট বাংলোয় যেতে হবে। স্টেশনেই একজনকে জিজ্ঞাসা করে রেস্ট হাউসের হদিস জেনে নিলুম।

স্টেশনের খুব কাছে হলেও বাইরে বেরিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। সদর দরজা দিয়ে পৌঁছতে হলে একটু ঘুরে যেতে হয়। পিছনের দিকেও একটা পথ আছে। সেই পথেই আমি তাদের বিরাট প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলুম।

নিচের তলায় ট্রান্সপোর্টের অফিস, ওপর তলায় রেস্ট হাউস ও রেস্তোরাঁ। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলুম যে পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর, সামনে প্রশস্ত বারান্দা। কিছু পাতার গাছ ও ক্যাকটাস আছে, আর কিছু চেয়ার টেবিলও ছড়ানো আছে বসবার জন্যে। কিন্তু লোকজন নেই। ঘরের দরজা সব বন্ধ।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখলুম, জানালায় দাঁড়িয়ে একজন নিচের দিকে চেয়ে কিছু দেখছে। পরনে টেরেলিনের প্যাণ্ট ও সার্ট, পায়ে

সাদা চামড়ার জুতো। তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্মে বললুম: গুড মর্নিং স্যর।

অনেকটা তফাতে হলেও আমার কথা বোধহয় শুনতে পেয়েছিল। ফিরে তাকাতেই বললুম: রেস্ট হাউসে জায়গা পাব?

এগিয়ে এসে সে বলল: আপনি একা?

বললুম: না, আমরা দুজন।

আসুন।

বলে সে রেস্তোরাঁর দেওয়ালে একটা বোর্ড থেকে চাবি সংগ্রহ করে আমাকে একটা ঘর খুলে দিল। প্রশস্ত ঘর, দুধারে দুখানা খাট। ডানলোপিলোর গদি ও বালিশ, পরিষ্কার বিছানা ও কম্বল। বাথরুমটি ঘরের সঙ্গেই লাগোয়া। ভাড়া কুড়ি টাকা। বললুম: ঘর পছন্দ হয়েছে। চাবিটা পেলে স্টেশন থেকে মালপত্র নিয়ে আসি।

লোকটি বলল: চাবি আমার কাছেই আছে, নিশ্চিন্ত মনে আপনারা আসুন।

আমরা এখুনি আসছি।

বলে আমি স্টেশনে ফিরে গিয়ে স্বাতিকে খবর দিলুম। সে একটা সাইকেল রিক্সায় উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু কুলি হেঁটে যাবার প্রস্তাব দিল। স্বাতি একটু ইতস্তত করছিল, তাই দেখে আমি বললুম: বেশি দূরে নয়।

কুলি আমাদের মালপত্র নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে সে আর দ্বিধা করল না। তাকে অনুসরণ করে সেই পুরনো পথেই আমরা রেস্ট হাউসের দরজায় পৌঁছে গেলুম।

রেস্ট হাউসের লোকটি কাছেই ছিল, দরজা খুলে মালপত্র সাজিয়ে রাখল। কুলিকে বিদায় দেবার পরে জিজ্ঞাসা করল: লাঞ্চ খাবেন? না খেয়ে এসেছেন?

বাঙলায় প্রশ্ন। এর আগেও সে আমার সঙ্গে বাঙলায় কথা

বলেছিল। স্বাতি বেশ নিশ্চিত হয়ে বলল: একটু কফি পেলে ভাল হয়।

নিশ্চয়ই পাবেন।

বলে সে বেরিয়ে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই কফির ট্রে নিয়ে ফিরে এল। স্বাতি লজ্জিত ভাবে বলল: আপনি নিজে কেন কষ্ট করলেন!

কফির ট্রে একটা টেবিলে রাখতে রাখতে সে বলল: ভৌমিক ছাড়া আর কে আছে বলুন! জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবই আমাকে করতে হয়।

তারপরেই প্রশ্ন করল: কোহিমায় যাবেন, না ইম্ফলে?

স্বাতি কফি ঢালবার উদ্যোগ করছিল, তাই আমি উত্তর দিলুম: প্রথমে কোহিমা, তারপরে ইম্ফল।

ভৌমিক বলল: কাল বিকেলের আগে তো যেতে পারবেন না।

কেন?

আজ তো অফিস বন্ধ, পারমিটের জন্যে কাল সকালে আপনাকে যেতে হবে।

স্বাতি বলল: তা হলে আজ বিকেলে আমরা কী করব?

তৎপর ভাবে ভৌমিক বলল: ডিমাপুর শহরটা দেখুন।

দেখবার কিছু আছে?

আছে বৈকি। কাছাড়ী রাজাদের ভাঙা বাড়ি দেখুন। রুথের নাগা এম্পোরিয়ামে গিয়ে হাতের কাজ দেখুন—

সে সব কত দূরে?

সব কাছাকাছি। বিকেলে চা খাবার পরে একখানা রিক্সা ঠিক করে দেব, একটা চক্কর দিয়ে চলে আসবেন।

বলে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার এসে যখন এঁটো বাসনপত্র নিয়ে গেল তখনও আমরা বুঝতে পারি নি যে ভৌমিক এখানকার বেয়ারা। তার পোশাকে কথাবার্তায় ব্যবহারে এ পরিচয় বোঝা দুষ্কর। প্রথম দর্শনে

আমি তাকে ম্যানেজার ভেবেছিলুম, আর স্বাতি বোধহয় কেয়ার-টেকার ভেবেছিল। কিন্তু এই নামে কী এসে যায়! সন্ধ্যেবেলায় নানা রকমের হাঁক ডাক শুনতে পেয়েছিলুম। যারা এখানে নিয়মিত যাতায়াত করে তাদের কেউ তাকে ভৌমিকদা বলছে। কেউ বলছে ভৌমিকবাবু, কেউ আবার ভৌমিক বলেও ডাকছে। ভৌমিক হাসি মুখে সবার সব ফরমাশ খাটছে তৎপর ভাবে। অদ্ভুত কাজের মানুষ। পরে যখন জানলুম যে তার মালিকও তাকে ভৌমিকদা বলে ডাকে, তখন আর আশ্চর্য হলুম না।

কফির ট্রে নিয়ে যাবার পরে স্বাতি বলল: একটু ঘুমিয়ে নেবে?

আশ্চর্য হয়ে বললুম: কেন বল তো!

সেই সাত সকালে উঠেছ—

হেসে বললুম: দিবানিদ্রার অভ্যাস হলে দুঃখ আছে কপালে।

স্বাতি বলল: কথাটা মিথ্যে নয়। নিয়মিত ঘুমোলে দেহটা ধীরে ধীরে ফুলে ওঠে।

দেহ নয়। ভুঁড়ি হয় বল।

স্বাতি একেবারে অন্য কথায় চলে গেল, বলল: কাছাড়ী রাজাদের কথা কিছু জানো?

বললুম: সে তো ইতিহাসের কথা!

জানা থাকলে বল না!

বললুম: কাছার বা কাছাড় এখন আসামের একটি জেলা। তার প্রধান শহর শিলচর। কিন্তু এক সময়ে কাছাড় একটি রাজ্য ছিল এবং তার প্রথম রাজধানী ছিল ডিমাপুরে। শুধু বর্তমান কাছাড় জেলা নয়, বাঙলা দেশের রঙ্গপুর আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যও এই কাছাড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই রাজ্যেরই প্রাচীন নাম হেড়ম্ব বিষয়। ঘটোৎকচের মা হিড়িম্বার নামে রাজ্যের নাম। হিড়িম্বাই ছিলেন এই রাজবংশের জননী।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: তুমি এই কথা মানো?

কেন মানি তা বলছি, ব্রহ্মখণ্ড নামে একখানি পৌরাণিক গ্রন্থে আছে—

বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্ব মণিপুরকম।
লৌহিত্যত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসন্দকম্॥

তার পরেই আছে—

হেড়ম্ব দেশ মধ্যে চ রণচণ্ডী বিরাজিতে।
বরচক্রা সরিৎপার্শ্বে হিড়িম্বা লোকদুর্জয়া॥

অর্থাৎ এই দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম রণচণ্ডী। এখানে য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে বলে শুনেছি, তাই রণচণ্ডীর মন্দির কিনা কে জানে। তবে এ কথা মেনে নিতে আপত্তি হবার কোন কারণ দেখি না।

স্বাতি কোন আপত্তির কথা তুলল না দেখে বললুম: কোথায় যেন পড়েছিলুম যে কাছাড়ের রাজারা ছিলেন অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর, কিন্তু আমি এ কথা মেনে নিতে পারি নি কেন জানো?

কেন?

দেশাবলী নামে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত বই পাওয়া যায়। তাতেও আছে যে হেড়ম্ব দেশের প্রথম রাজা ছিলেন ঘটোৎকচ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের হাতে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁরই পুত্র বর্বরীক দেশের রাজা হন। বর্বরীকের মৃত্যু হয় কৃষ্ণের হাতে। তারপর বর্বরীকের পুত্র মেঘবর্ণ হেড়ম্ব দেশের রাজা হন। এই বংশেই দর্পনারায়ণের জন্ম।

স্বাতি বলল: দর্পনারায়ণ নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক রাজা!

বললুম: মনে হয় তাই। কিন্তু ইংরেজ চিরকালই আমাদের পুরাণ ও সংস্কৃত গ্রন্থকে অবহেলা করেছে। কাছাড় রাজ্য সম্বন্ধেও আমাদের লিখিত বিবরণ তারা অস্বীকার করেছে। এখানকার এক ডেপুটি কমিশনার এডগার সাহেব বলেছেন যে এই রাজবংশ

বেশি প্রাচীন নয়। ১৭৯০ সালে নাকি এই রাজাদের বংশাবলী তৈরি হয়েছে।

সত্যি নাকি?

বললুম: মিথ্যে। রাজমালা নামের বিখ্যাত গ্রন্থটি পাঁচ শো বছরের বেশি পুরনো। তাতে পাওয়া যায় যে ত্রিপুরার রাজা ত্রিলোচনের বড় ছেলে ছিলেন হেড়ম্ব রাজার দৌহিত্র। সেই সূত্রে তিনি ঐ দেশের রাজা হয়েছিলেন।

স্বাতি বলল: একটা গোঁজামিল দেওয়া যায়।

কী রকম?

সাহেবের মতে বংশাবলীটা হয়তো পরেই তৈরি হয়েছে, তা মহাভারতের ঘটোৎকচের বংশধরের নয়। অন্য কোন ঘটোৎকচ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বললুম: মহাভারতের নাগলোক ও উলুপীকে মানব, মানব মণিপুরের চিত্রাঙ্গদাকে, আর হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচকে মানব না, এ কোন যুক্তির কথা নয়।

স্বাতি বলল: তা হলে ইতিহাসের কথা বল।

বললুম: আজ আমরা ডিমাপুরে তাদের প্রথম রাজধানীর কিছু চিহ্ন দেখব। শুনেছি এখানে তাদের দুর্গ বা রাজবাড়ির গেট, কারুকার্য করা দু সারি স্তম্ভ আর দুটি পুষ্করিণী আছে সে যুগের। এখান থেকে কাছাড়ী রাজারা দক্ষিণে মাইবঙে রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে এসেই তাঁরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। একজন বিবাহ করেন ত্রিপুরার এক রাজকন্যাকে। আর বিবাহের যৌতুক হিসেবে পান বরাক নদীর উপত্যকাটি। কিন্তু জয়ন্তী রাজাদের উপদ্রবে তাদের মাইবঙ ছেড়ে খাসপুরে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করতে হয়। এই খাসপুর শিলচরের এয়ার পোর্ট কুম্ভীগ্রামের নিকটে। মাইবঙ ও খাসপুরেও এই রাজাদের স্মৃতিচিহ্ন কিছু আছে।

স্বাতি বলল: এঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন কেন?

সে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। না, নিজেদের মধ্যে কোন বিবাদ নয়। যত দূর জানি বিবাদ হয়েছিল মণিপুরের এক রাজকুমারের সঙ্গে। নিজেদের গৃহবিবাদে সেই রাজকুমার মণিপুর থেকে পালিয়ে এসে কাছাড়ের রাজার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর একটি প্রিয় ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়াটি চেয়ে না পেয়ে কাছাড়ের রাজা জোর করে তা কেড়ে নিয়েছিলেন। তারপর বর্মার রাজার সহযোগিতায় নিজের রাজ্য অধিকার করবার পরে সেই রাজকুমার কাছাড় জয় করেছিলেন।

তারপর ?

বললুম : না, এ অঞ্চলের যুদ্ধ বিগ্রহের কথা খুবই বিরক্তিকর। তার চেয়ে আর কিছু জানবার থাকলে বল।

প্রশ্ন করবার মতো কোন কথা স্বাতি বোধহয় খুঁজে পেল না। তাই দেখে বললুম : আসামে এখন কাছাড়ীরা একটা আদিবাসী জাত। বড়ো ডিমাছা ও সোনোয়াল কাছাড়ী উপজাতি। শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী জাত। পাহাড়ে এরা জুম চাষ করে। কিন্তু সমতল ভূ মতে লাঙ্গল দিয়ে চাষবাস করে। নাগাদের মতো এদেরও গ্রামের অবিবাহিত যুবকেরা একটা নোত্রাঙে রাত্রিবাস করে। দেবতা ও উপদেবতায় এদের বিশ্বাস। অনেকেই হিন্দু। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহ আছে। বিচ্ছেদ হলে ছেলেরা বাপের ও মেয়েরা মায়ের ভাগে পড়ে। তা না হলেও ছেলেরা বাপের গোত্র ও মেয়েরা মায়ের গোত্র পায়। এই দুই গোত্রে বিবাহ পাপ। গাঁয়ে গাঁ-বুড়া আছে। বিহু তাদের প্রধান উৎসব। সে সময়ে পচাই মদ জু আর ভোজ খেয়ে সারা রাত নাচগান চলে।

স্বাতি বলল : বিহু তো অসমীয়দের উৎসব !

বললুম : আসামের জাতীয় উৎসব বলতে পার।

স্বাতি হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল : অন্ধকার হবার আগেই আমাদের সব কিছু দেখে আসতে হবে।

হেসে বললুম : তা না হলে ভয় করবে বুঝি ?

ভয় নয়। ছবি তোলবার মতো কিছু পেলে আপসোস করতে হবে আলোর অভাবে।

ঠিক এই সময়ে দরজার গায়ে কেউ টোকা দিল। আমি হেঁকে বললুম : প্লিজ কাম ইন।

দরজা ঠেলে ভিতরে এল ভৌমিক। জিজ্ঞাসা করল : চায়ের সঙ্গে কী খাবেন ?

স্বাতি বলল : কী খাওয়াতে পারেন ?

ভৌমিক বলল : বারোটার আগে ভাত খেয়েছেন তো ! আমি বলি, টোস্ট আর ওমলেট খেয়ে বেড়াতে যান, রাতে ডিনার খাওয়াব তাড়াতাড়ি।

সেই ভাল।

বলে স্বাতি উঠে পড়ল।

চা আসবার আগেই স্বাতি মুখ হাত ধুয়ে শাড়ি বদলে নিল। তারপর তার ক্যামেরা বার করল। আমিও মুখ হাত ধুয়ে 'চুল আঁচড়ে নিলুম।

চায়ের ট্রে টেবিলে নামিয়ে ভৌমিক বলল : একটা রিক্সা ঠিক করে দেব ?

বললুম : আপনি কষ্ট করবেন কেন! গেটের বাইরে অনেক রিক্সা দেখেছি, একটায় উঠে পড়ব।

ভাড়া ঠিক করে উঠবেন।

বলে ভৌমিক চলে গেল।

রিক্সা ঠিক করতে আমাদের কিছু বেগ পেতে হল। আমরা যেখানে যেতে চাই সে জায়গার কথা সবাই জানে না। আমরাও বোঝাতে পারছিলুম না যে কোথায় যেতে চাই। শেষ পর্যন্ত একজন বলে উঠল : আমি জানি।

জানো ? কোথায় বল তো !

পুরনো সার্কিট হাউস ছাড়িয়ে যেতে হয়। একটা মাঠের মাঝে পুরনো কালের কয়েকটা পাথরের থাম আছে।

ঠিক বলেছ। সেইখানেই নিয়ে চল।

বলে আমরা তারই রিক্সায় উঠে বসলুম।

কোহিমার পথ ধরে কিছু দূর এগিয়ে যাবার পরে ডান দিকের অন্য পথ ধরতে হল। কয়েকটা ঘর বাড়ির পরেই পথের ডান হাতে একটা পুরনো গেট দেখতে পাওয়া গেল। রিক্সাওয়ালা বলল : এইটেই কাছাড়ী রাজাদের রাজবাড়ির গেট।

আরও খানিকটা এগিয়ে সে দাঁড়াল। বলল : এইখানে নেমেই দেখতে হবে।

কী দেখব ?

বলে স্বাতি নেমে পড়ল। আমিও নামলুম। পথের বাঁ ধারে ছোট ছোট তাঁবু পড়েছে পুলিস কিংবা সেনা বাহিনীর, আর ডান ধারে একটি অনাদৃত ময়দান। মাঝে মাঝে কিছু বড় গাছপালাও আছে। আমরা একটু ঘুরে এই ঘেরা জায়গার ভিতরে ঢুকলুম ছোট একটা গেট দিয়ে। তারপরেই দেখতে পেলুম কিছু বিক্ষিপ্ত পাথর ও কারুকার্য করা এক সারি স্তম্ভের নিচের অংশ। সমস্ত থামেরই উপরের দিক ভেঙে পড়ে গেছে।

স্বাতি বলল : একটা ছবি তুলে নিই।

বলে দূর থেকে একটা ছবি তুলে নিল। এ তার চিরকালের অভ্যাস। বেড়াতে বেরিয়ে অজস্র ছবি তোলে, বলে, যা দেখলাম তা মনে থাকবে। ভুলে গেলেও ছবি দেখলে মনে পড়ে যাবে।

কথাটা মিথ্যে নয়। মন থেকে কিছুই মুছে যায় না। দিনে দিনে অস্পষ্ট হয়ে গেলেও স্মৃতি ঘুমিয়ে থাকে। তাকে জাগিয়ে দিতে পারলেই সব কিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছবিও এই কাজে সাহায্য করে।

ডিমাপুরে শুধু এইটুকুই দেখবার জায়গা। কিন্তু এও নাকি কেউ

দেখে না। ফেরার পথে রিক্সাওয়ালা বলল, এ সব দেখতে এখানে কেউ আসে না।

বললুম : এ সব দেখে তো লাভ নেই কিছু, শুধু শুধু সময় নষ্ট, পয়সাও নষ্ট।

পুরনো পথ ধরে কিছু দূর ফেরবার পরে আবার আমরা বাঁ হাতের একটা নির্জন রাস্তা ধরলুম। স্বাতি বলল : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

রিক্সাওয়ালাই উত্তর দিল : এম্পোরিয়ামে।

রুথ্'স্ নাগা এম্পোরিয়ামের কথাও আমরা বলেছিলুম। কিন্তু স্বাতি বলল : আমরা তো কিছু কিনব না। শুধু শুধু সেখানে যাচ্ছি কেন ?

রিক্সাওয়ালা বলল : জিনিসপত্র কী ভাবে তৈরি হয় তা দেখতে পাবেন।

কতকটা গ্রাম্য পরিবেশে খানিকটা এগিয়ে যাবার পরে এক জায়গায় আমাদের রিক্সা থামল। বাহিরে সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারলুম যে আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। কিন্তু এই সাইনবোর্ড না থাকলে এটি কোন গৃহস্থের বাড়ি বলেই মনে হত। হয়তো তাই। ভিতরে প্রবেশের পথে ডান দিকের একটা বাড়িতে একটি পরিবার বাস করেন। আর একটু এগিয়ে আর একটি বাড়ি। তার বারান্দায় অনেকগুলি মেয়ে দু সারিতে বসে কাপড় বুনছে। তাঁত নয়, কিন্তু তাঁতের মতোই ক্ষুদে ব্যাপার। অপ্রশস্ত কাপড় তৈরি হচ্ছে নানা রঙের সুতো দিয়ে। এই কাপড়ে ব্যাগ তৈরি হবে, চায়ের পটের ঢাক্না, আরও অনেক কিছু। একটা ছোট ঘরে তৈরি জিনিস বিক্রির জন্যে সাজানো আছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাতি অনেক খবর সংগ্রহ করে ফেলল।

ষোলটি মেয়ে কাজ শিখতে এসেছে আসামের নানা জায়গা থেকে। নাগা মেয়েও আছে কয়েকটি। এরা এখানে খেতে পায়

আর হাত খরচ পায় কুড়ি টাকা। তার বদলে সারা দিন কাজ করতে হয়। স্বাতির মনে হল যে এরা কষ্টেই আছে। গরিব মেয়ে বলেই শ্রমের বিনিময়ে কাজ শিখছে। এদের মধ্যেই একজন বাঙালী মহিলা ছিলেন, তিনিই স্বাতিকে সব বুঝিয়ে দিলেন।

এখান থেকে আমরা ডিমাপুরের বাজারে এলুম। আমাদের রেস্ট হাউসের কাছে এসেই বাজারের রাস্তা। এক দিকে স্টেশন, অন্য দিকে বাজার। রেল লাইন পেরিয়ে যেতে হয়। এই বাজারেই অনেকগুলো ছোট বড় হোটেল আছে। আর নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরী জিনিসের অজস্র দোকান।

বাজারে নেমে রিক্সাওয়ালাকে আমরা বিদায় দিয়েছিলুম। তারপরে হেঁটে ফিরতে লাগলুম। যাবার সময়ে যা দেখতে পাই নি, ফেরার পথে তা দেখলুম। আমাদের গেট থেকে অদূরে মোড়ের উপরেই একটি মন্দির। তার ভিতরে সন্তোষী মা। আরও দেববেবী আছেন। প্রণাম করে আমরা রেস্ট হাউসে ফিরলুম।

## ১৩

রাতে রেস্ট হাউসের মালিকের সঙ্গে পরিচয় হল। মালিক ঠিক নয়, নাগাল্যাণ্ড সরকারের কাছ থেকে এই রেস্ট হাউস ও রেস্তোরাঁ পরিচালনার ভার পেয়েছেন তিনি। সদালাপী বাঙালী ভদ্রলোক। আমরা কোহিমা যাচ্ছি শুনে বললেন: কোহিমার হোটেলে আপনারা থাকতে পারবেন না, আমি এম. এল. এ. হস্টেলে আপনাদের ব্যবস্থা করে আসব।

আপনি কি এর জন্যে কোহিমায় যাচ্ছেন?

এর জন্যে নয়। আমার একটু কাজ আছে কোহিমায়। আর সেখানে সবাই আমার পরিচিত। যদি বিকেলে যান তো আমার নাম করে হস্টেলে ঢুকে যাবেন।

আপনি ফিরবেন কখন?

আমি বিকেলেই ফিরে আসব।

স্বাতি বলল: তবে আমরা পরশু সকালে যাব।

ভদ্রলোক বললেন: তাহলে তো কোন চিন্তাই নেই। আমি ফিরে এসেই আপনাদের খবর দেব।

বুঝতে পারলুম যে আরও একটা দিন আমাদের ডিমাপুরে কাটাতে হবে। বেড়াতে বেরিয়ে সময়ের অপব্যয় বড় গায়ে লাগে। কিন্তু এই ভেবেই সান্ত্বনা পেলুম যে একবেলাতেই যে পারমিট পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সরকারী কাজের উপরে ভরসা করে অনেক সময়েই ঠকতে হয়। পরে আমার এই ভাবনার সমর্থন পেয়েছিলুম। অনেক সময়েই নাকি পারমিট পেতে সারা দিন লেগে যায়।

অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড মণিপুর ও মিজোরামে ঢুকতে হলে ইনার লাইন পারমিটের প্রয়োজন আছে। বিদেশীদের এই পারমিট সংগ্রহ করতে হয় দিল্লীতে হোম অ্যাফেয়ার্সের সেক্রেটারীর কাছ থেকে। আর ভারতীয়রা নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের জন্য এই পারমিট পাবেন ডিমাপুরের এস. ডি. ও. সিভিলের কাছে। ডিমাপুরের অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনারও দিতে পারেন। মাথা পিছু ফী লাগে পঞ্চাশ পয়সা। এ সব কথা টুরিস্ট লিটারেচারেই আছে।

অনুসন্ধান করে জানলুম যে আমাদের দুজনের যাবার দরকার নেই। একজন গিয়ে দরখাস্ত করলেই চলবে। দরখাস্তের বয়ানটাও জেনে নিলুম। নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের জন্য আলাদা আলাদা দরখাস্ত করতে হবে বলে দুখানা দরখাস্ত নিয়ে সকালে ব্রেকফাস্টের পরেই যাত্রা করলুম।

ডিমাপুরে সাইকেল রিক্সা ও অটো রিক্সা দুইই আছে, ডেপুটি কমিশনারের অফিসে যাবার জন্য বাসও যাতায়াত করে। মাইল পাঁচেক দূরে অফিস, তাই বাসেই চলে এলুম।

অফিস তখনও খোলে নি, কিন্তু দিল্লীর এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমার আগেই এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি আমাকে একটা সুখবর দিলেন, বললেন: আজ খুব তাড়াতাড়ি পারমিট পাওয়া যাবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: অন্য দিন কি দেরি হয়?

দেরি মানে! সারা দিন বসে থাকতে হয়।

কেন?

একজন নাগা অফিসারের কাছে দরখাস্ত দাখিল করতে হয়। তিনি সেগুলো টেবিলে জমাতে থাকেন। তারপর খেতে যাবার আগে ইয়েস অথবা নো লিখে অফিসে পাঠিয়ে দেন।

নো লেখেন কেন?

সে তাঁর মর্জি। তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কোন আপিল নেই।

তারপর?

তারপর অফিসের বাবু কিংবা মেয়েদের কাছে তদ্বির করে পারমিট লিখিয়ে সাহেবের ঘরে সই করতে পাঠানো হয়। সাহেব বাড়ি যাবার আগে সেগুলো সই করে দেবেন। আপনার ভাগ্য ভাল হলে সকাল দশটায় এসে পাঁচটায় এই পারমিট নিয়ে ফিরতে পারবেন। আর তা না পেলে পরদিন আবার আসবেন। আবার দরখাস্ত। আপিল নয়, নতুন দরখাস্ত। সেদিন হয়তো ইয়েস হয়ে যেতে পারে।

বললুম ঃ আজ এই পারমিট তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে কেন?

ভদ্রলোক বললেন: দেখছেন না, তিনি আজ ছুটিতে বলে আমরা অন্য অফিসারের ঘরের দরজায় বসেছি। ইনি একজন প্রবীণ অফিসার, বোধহয় কাশ্মীরী। দরখাস্ত হাতে দিলেই ইয়েস করে দেবেন। ঐ উনি আসছেন।

আমি একজন প্রসন্ন চেহারার মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালুম। নমস্কার করলাম তাঁকে। আমার সঙ্গীও তাই করলেন এবং অফিসারটি ঘরে ঢুকতেই ব্যবসাদার ভদ্রলোক আমাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন: আপনি আগে যান।

আমরা দুজনেই ঘরে ঢুকলুম। ভদ্রলোক বসতে দিলেন আমাদের। দরখাস্ত নিয়ে সই করে অফিসে পাঠিয়ে দিতেই আমার সঙ্গী বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি বসে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই দুখানা বই নিয়ে পিওন ফিরে এল, তার পিছনে সেই ভদ্রলোক। অফিসারটি হেসে পারমিটগুলো সই করে দিয়ে আমাকে বললেন: দু টাকা জমা দিয়ে অফিস থেকে পারমিট নিয়ে নিন।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলুম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকে গেল। একখানা বাস দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সেই বাসে চেপে ফিরে এলুম।

দিল্লীর সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক শেয়ারে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কোহিমায় যাবেন এবং আজই ফিরে এসে দিল্লীর ট্রেন ধরবেন।

আমাকেও তাঁর সঙ্গী হতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি রাজী হই নি এই কারণে যে আমাকে ইম্ফলে যেতে হবে। তাই কোহিমা থেকে ডিমাপুরে ফিরে আসার কোন অর্থ হয় না। ভদ্রলোক বললেন: কেন আপনাকে এই অনুরোধ করলাম পরে বুঝতে পারবেন।

কেন?

কোহিমায় রাত্রিবাসের জায়গা পাবেন না। আর কোহিমা থেকে ইম্ফলে যাবারও ব্যবস্থা ভাল নয়।

মানে?

মানে, এখান থেকে ইম্ফলের বাস ছাড়ে, তাতে যদি কোহিমার প্যাসেঞ্জার না থাকে তবে আপনাকে পরের দিনের বাসের অপেক্ষা করতে হবে। তাই বলছিলাম, কাল সকালের বাসে কোহিমায় গিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে আসবেন। ইম্ফলে যাবেন পরের দিন সকালের বাসে।

বললুম: ভেবে দেখব।

রেস্ট হাউসে ফিরে স্বাতিকে এই কথা বলতেই সে হেসে বলল: আমি সে ব্যবস্থা করেছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

সে বলল: তুমি চলে যাবার পরে নিচে নেমেছিলাম। বাস স্টেশনের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে পরিচয় হল। ভদ্রলোক বাঙালী এবং পরোপকারী। কাল সকালের বাসে আমাদের জন্যে দুখানা ভাল সীটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে পরশু সকালের বাসেও দুজন কোহিমার যাত্রীকে ভাল সীট দেবেন। তার মানে, ওঁরা নামলে ঐ সীট দুটো আমরা পাব।

বললুম: চমৎকার ব্যবস্থা।

স্বাতি বলল: তিনি কোহিমাতেও ফোন করে বলে দিয়েছেন। এম. এল. এ. হস্টেলে আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে দিতে।

তাহলে আর ভাবনা কী! যাত্রা আমাদের শুভ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

দুপুরে রেস্তোরাঁয় বসে আমরা লাঞ্চ সেরে নিলুম। স্বাতি বলল: বিকেলে কিছু বইএর খোঁজ করা যাবে। এই অঞ্চল সম্বন্ধে ভাল বই আমাদের নেই।

বললুম: বই নেই, তা নয়। ইংরেজীতে অনেক বই আছে, কিন্তু সে সবই সাহেব আমলের লেখা। আর বাঙলা বইএ প্রয়োজনীয় খবর নেই তবে প্রকাশ সিংয়ের লেখা নতুন একখানা বই পড়েছি। তাতে এ কালের অনেক কথা আছে।

কই, এ বইএর কথা তো আমাকে বল নি!

বললুম: হাতের কাছে যা পাই, তাই পড়ে ফেলি। এ তো আমার পুরনো বদ অভ্যেস।

নিজেদের ঘরে এসে স্বাতি বলল: আজ দুপুরটা তাহলে ভাল কাটবে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলুম: কেন বল তো!

নাগাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারব!

তার মানে আজ সারা দুপুর আমাকে বকতে হবে!

স্বাতি বলল: ভৌমিক আছে। চা-কফি-স্কোয়াশ যখন যা চাও তাই পাবে।

অতএব—

শুরু কর।

বলে স্বাতি আমাকে শুইয়ে দিয়ে নিজেও পাশের খাটে শুয়ে পড়ল। বললুম: কোন্‌খান থেকে শুরু করব?

স্বাতি বলল: পুরনো কথা পরে শুনব, আগে বর্তমান যুগের কথা বল।

বললুম: তাহলে প্রথমে রাজ্যটার কথা বলতে হয়, পরে মানুষদের কথা।

তাই বল।

নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের জন্ম হয় ১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর। অরুণাচল বা মিজোরামের মতো ইউনিয়ন টেরিটরি নয়, নাগাল্যাণ্ড স্টেট। এক সময়ে তিনটি জেলা ছিল—কোহিমা, মোককচুং ও তুয়েনসাঙ। জেলার নামেই প্রধান শহরের নাম। এখন আরও চারটি জেলা হয়েছে—ফেক, তোখা, জুনেবোটো ও মাও। লোকসংখ্যা পাঁচ লাখের কিছু বেশি। এর শতকরা আশি ভাগ কৃষিজীবী। প্রধান শিল্প তাঁত।

শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে নাগারা নিজেদের নাগা বলে জানত না। সমতলবাসীরা তাদের এই নাম দিয়েছিল। কিছু দিন আগেও তারা গ্রামের নামে নিজেদের পরিচয় দিত, কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে এক একটি উপজাতি। এখনও তাদের এই পরিচয় লুপ্ত হয় নি। প্রধান উপজাতির সংখ্যা চোদ্দ। তারা হল অঙ্গামি আও চাখেসাং চাং খেমুঙ্গান কলিয়ান লোটা ফোম পচুরি রেঙ্গমা সাঙ্গটাম সেমা ইমচুঙ্গার ও জেনিয়াং। এদের মধ্যে আরও কত বিভাগ আছে তা মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে কোন্ জেলায় কাদের বাস, চেষ্টা করলে তা মনে রাখা সম্ভব। যেমন কোহিমায় প্রধান হল অঙ্গামি। রেঙ্গমা সেমা ডিয়াং ও কুকিও কিছু আছে। ফেক জেলা আওদের। লোটাদের ডোখা জেলা, আর সেমাদের জেলা বুলেবোটো। অন্যান্য জেলায় একাধিক উপজাতি আছে। খুবই সাম্প্রতিক কালে এরা জেনেছে যে ভারতবাসীর কাছে তারা সবাই নাগা নামে পরিচিত। তাদের রাজ্যের নাম হবে নাগাল্যাণ্ড। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জেগেছে অল্প দিন আগে।

স্বাতি বলল: এইবারে বোধহয় নাগাদের আচার ব্যবহারের কথা বলবে।

শুনতে না চাও, বলব না।

কী বলবে তবে?

বললুম : ইতিহাসের কথা কি ভাল লাগবে ?

স্বাতি বলল : সংক্ষেপে বল।

যদি সময় পাও তো সুনীতিবাবুর লেখা কিরাত-জন-কৃতি পড়ে নিও। নাগাদের তিনি কিরাত জাতি বলেছেন, ইণ্ডো-মঙ্গোলয়েড। যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে এই কিরাত জাতির উল্লেখ আছে। মহাভারতেও যে আছে তা আগে বলেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে নাগারা কোন প্রাচীনত্ব দাবী করে না। তারা বলে না যে উলূপী তাদের আদি মাতা বা ঐ রকমের কিছু। অঙ্গামি সেমা রেঙ্গমা আর লোটারা তাদের উৎপত্তির বিষয়ে অন্য গল্প বলে।

গল্পটা জানো ?

বললুম : জানি। তারা বলে যে গ্রামে একখানা বড় পাথর ছিল। তার ওপরে ধান শুকোতে দিলে সন্ধ্যেবেলায় ডবল হয়ে যেত। যার পাথর সেই দম্পতির তিন ছেলে পালা করে ধান শুকোত। কার পালা, এই নিয়ে এক দিন তাদের বিবাদ হল। রক্তারক্তির ভয়ে বুড়ো বাপ-মা আগুন লাগিয়ে দিল পাথরে। পাথর চৌচির হয়ে গেল। সবাই জানল যে পাথরের আত্মা স্বর্গে চলে গেছে। তাদের ধান আর বাড়বে না। তাই খেজা-কেনোমা গ্রাম ছেড়ে তিন ছেলে তিন দিকে চলে গেল। তারাই নাকি অঙ্গামি সেমা আর লোটাদের প্রথম পুরুষ।

স্বাতি হেসে বলল : বেশ গল্প।

বললুম : তাদের কোন ইতিহাস নেই কেন, তা নিয়েও একটা গল্প আছে।

বল।

বললুম : সৃষ্টির পরে ভগবান সবাইকেই এক সঙ্গে লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন। সমতলভূমির লোকের মতো পাহাড়ী মানুষরাও লিখতে পড়তে শিখেছিল। সমতলভূমির লোকেদের ভগবান কাগজ দিয়েছিলেন লেখবার জন্যে, আর পাহাড়ী মানুষদের

দিয়েছিলেন চামড়া। চামড়া খাওয়া যায় বলে পাহাড়ী মানুষ তা খেয়ে ফেলেছিল। তাই তাদের কোন ইতিহাস লেখা হয় নি।

খুব সুন্দর গল্প। এইবারে তাদের ইতিহাসের কথা সংক্ষেপে বল।

বললুম : দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নাগাদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১২২৮ সালে প্রথম আহোম রাজা সুকফা ব্রহ্মদেশ থেকে তিরাপের মধ্য দিয়ে আসামে আসেন। বুরুঞ্জিতে তাদের ইতিহাস আছে, নাগাদের কথাও আছে—কী ভাবে আহোম রাজারা নাগাদের শাসনে রেখেছিলেন সেই কথা। ১৮৩২ থেকে ইংরেজরা নানা ভাবে তাদের সামলাচ্ছে। কিন্তু সে ইতিহাস তোমার ভাল লাগবে না। শুধু একটি কথা মনে রাখবার মতো।

বল।

অর্জুন কোন্ পথে নাগলোকে এসেছিলেন আমাদের জানা নেই, কোন্ পথে তিনি মণিপুরে গিয়েছিলেন তাও আমরা জানি না। শুধু এইটুকু জেনেছি যে ১৮৩২এর জানুয়ারী মাসে দুজন ইংরেজ মণিপুর থেকে সাত কোটি সৈন্য নিয়ে নাগা পাহাড় অতিক্রম করেছিল। আর পরের বছর মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিংও এই কাজ করেছিলেন। কিন্তু নাগারা কি করেছিল জানো? পাহাড়ের উপর থেকে পাথর ফেলেছিল তাদের মাথায়, তীর ছুঁড়েছিল। এদের বশে আনতে ইংরেজকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

তারপর?

তারপরে চাকা ঘুরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাগারা নাকি ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিল সর্বতোভাবে।

আশ্চর্য!

খুবই আশ্চর্যের কথা। সবাই বলে কোহিমায় জাপানী সেনার সঙ্গে ইংরেজের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল চৌষট্টি দিন ধরে। এই যুদ্ধে নাগারা ইংরেজের পক্ষে ছিল। শুধু দোভাষীর কাজ নয়। গুপ্ত-

চরের কাজও করেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের পেছনে যে নেতাজী ছিলেন তা বোধ হয় তারা জানত না। নেতাজী যে মণিপুর রাজ্যে ঢুকে ভারতীয় পতাকা উড়িয়েছিলেন; তাও বোধ হয় তারা জানতে পারে নি। জানলে কী করত, তাই জানতে ইচ্ছা করে।

স্বাতি বলল: ফিজো কী করেছিল?

বললুম: ফিজো তখনও নাগাল্যাণ্ডের রাজনীতিতে আসে নি।

সে কি!

ফিজো তখন বর্মায় ইনসিওরেন্সের কাজ আর স্টিভেডোরের কাজ করত।

স্টিভেডোররা তো খুব বড়লোক শুনেছি।

বললুম: এই ইংরেজী কথাটার মানে হল, জাহাজে যারা মাল তোলে। তার মানে কুলিও হতে পারে। সে যাই হোক, শুনে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবে যে এই ফিজো ১৯৪৩ সালে নেতাজীর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগ দিয়েছিল।

তারপরে বিদ্রোহী হল!

ফিজো বর্মায় ছিল ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত। সে ছিল অঙ্গামি নাগা, নাম অঙ্গামি পাপু ফিজো। সংক্ষেপে এ. জেড. ফিজো। জন্মের সাল অনুমান করা হয় ১৯০০ থেকে ১৯০৪এর মধ্যে কোন বছর। অর্থাৎ তার বর্তমান বয়স পঁচাত্তরের কম নয়। শিলঙে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ে ব্যবসার চেষ্টা করে। তারপরে ১৯৩৩ সালে বর্মায় চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফিজো ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে জেলে যায়। তার সম্পত্তি হয় বাজেয়াপ্ত। তারপরে ১৯৪৬ সালে ছাড়া পেয়ে নাগাল্যাণ্ডে এসে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেয়।

তার কথা বলবে না?

বলব পরে। তার আগে একজন আশ্চর্য নারীর কথা বলব। এক সময়ে তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে শোনা যেত।

স্বাতি বলল: আমার তো কিছু মনে পড়ছে না!

হেসে বললুম : আমাদের সময়ের কথা তো নয়। এ তার অনেক আগের কথা। রাণী গাইদিলিউ-এর নাম প্রথম শোনা যায় ১৯৩০ সালের পরে।

স্বাতিও হেসে বলল : তুমি এমন ভাবে বলছিলে যেন এক দশক আগের কথা!

বুড়োদের কাছে তাই মনে হয়। রাণীর কথা তাঁরা খবরের কাগজে পড়তেন মনোযোগ দিয়ে।

এইবারে গল্পটা বল।

বললুম : রাণীর কথা বলতে হলে খাম্পাইদের কথা বলতে হয়।

খাম্পাইরাও কি নাগা ?

নাগা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু খাম্পাই নাগাদের কোন উপজাতি নয়, এরা এক ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক। ১৯২৫ সালের ঘটনা। মণিপুরের তামেংলং এলাকার যাদুনাং নামে একজন লোক এই সম্প্রদায়ের গুরু। তিনি নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করলেন। এবং তাঁর ভক্তদের বললেন যে তাঁর কথা মতো ক্রিয়া করলে রোগ-শোক থাকবে না, অপর্যাপ্ত খাদ্য পানীয় জুটবে এবং এমন দিন আসবে যে সুখ ছাড়া আর কিছু থাকবে না। দেখতে না দেখতে যাদুনাং-এর নতুন ধর্ম মণিপুরের তামেংলং এলাকা ছাড়িয়ে নাগাল্যাণ্ডের জেলিয়াং ও উত্তর কাছাড়ের পাহাড়ীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। তিঙ্গোয়া তাদের দেবতা, আর পূর্ণিমার রাতে হত গেল্লা অনুষ্ঠান। যাদুনাং-এর এই সম্প্রদায়ের নাম হল খাম্পাই, অনেকে বললেন যে হিন্দু তান্ত্রিকদের সঙ্গে নাকি এদের কিছু মিল আছে।

স্বাতি বলল : রাণীর কি হল ?

বললুম : রাণী পরে আসবেন। তার আগে যাদুনাং পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন।

কেন ?

১৯৩০ সালে যাদুনাং নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে দেবতা নরবলি চাইছেন। ভক্তরা এ কথা শুনেই চারজন মণিপুরী ব্যবসায়ীকে ধরে এনে বলি করে তাদের রক্ত যাদুনাং-এর জন্মভূমি নাংকাও-এর নিকটে এক মন্দিরে দেবতাকে নিবেদন করল। খবর পেয়ে মণিপুর সরকার যাদুনাংকে ধরে খুনের দায়ে তাঁর ফাঁসি দিল ১৯৩৫ সালে।

তারপর ?

বললুম : গুরুর পদ তো খালি থাকতে পারে না, যাদুনাং-এর সম্পর্কে এক বোন গান্দিলিউ এগিয়ে এসে বললেন যে তিনি দেবতার আশীর্বাদ লাভ করেছেন। আত্মগোপন করে ভক্তদের তিনি বলতে লাগলেন যে ইংরেজকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই, দেবতার কৃপায় তাদের গুলি জল হয়ে যাবে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খাম্পাইদের রাণী হয়ে গেলেন। কিন্তু ইংরেজের হাতে ধরা পড়লেন ১৯৩৩ সালে। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। আমাদের কংগ্রেস তাঁকে রাণী বলে মেনে নেয়, তাঁর আন্দোলনকে বলে মুক্তি সংগ্রাম। কাজেই ১৯৪৬ সালে রাণীর মুক্তি হয় এবং একটা পেনসনের বরাদ্দও হয়।

তিনি কি বেঁচে আছেন ?

জিজ্ঞেস করল স্বাতি।

বেঁচে আছেন বৈকি। তাঁর আরও কীর্তিকলাপ আছে।

কী রকম ?

১৯৬০ সালে হঠাৎ আত্মগোপন করে তিনি খাম্পাইদের নিয়ে ফিজোর মতো একটা সরকার গঠন করেন। এই নিয়ে আত্মগোপনকারী নাগাদের সঙ্গে তাঁর দলের প্রচণ্ড বিরোধ হয়। পাঁচ বছর পর খাম্পাইরা ন জন বিদ্রোহী নাগাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। কিন্তু পরের বছরই রাণী বন থেকে বেরিয়ে কোহিমায় আসেন এবং

ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আত্মসমর্পণ করেন। পরে তাঁর দলের লোকেরাও আত্মসমর্পণ করে।

এখন কি আবার জেলে ?

উঁহু। তাঁর দলের অর্ধেক খাম্পাই এখন নাগাল্যাণ্ডের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীতে।

আর রাণী ?

কখনও কোহিমায়, কখনও দিল্লীতে। রাজ্যের সরকার তাঁর নিরাপত্তার ভার নিয়েছে।

## ১৪

বিকেলে চা দেবার সময়ে ভৌমিক খবর দিয়ে গেল যে তার বাবু কোহিমা থেকে ফিরে এসেছেন, কিন্তু এম. এল. এ. হস্টেলে আমাদের জন্যে ঘরের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। কোন একটা কনফারেন্সের ব্যাপারে হস্টেলের সমস্ত ঘর রিজার্ভ করা আছে। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন নি, এই কাজের জন্যেই বেরিয়ে গেছেন। একটা ব্যবস্থা না করে তিনি ফিরবেন না, এই কথা বলে গেছেন।

স্বাতির দিকে তাকাতেই সে বলল : ভাবনা কী! ঘর ছেড়ে যখন বেরিয়েছিলাম, তখন কি এ সব আশঙ্কা করে ভয় পেয়েছিলাম

তা পাই নি, কিন্তু—

এর মধ্যে কিন্তু কিছু নেই। কোন হোটেলে গিয়ে উঠব, জায়গা না পেলে ইম্ফলে চলে যাবার চেষ্টা করব। বাস না পাই, ট্যাক্সি পেতে পারি। আর ডিমাপুর তো হাতের পাঁচ। কোন ব্যবস্থা না হলে বাসে বা ট্যাক্সিতে ডিমাপুরেই ফিরে আসব।

তার কথায় আমি খুব উৎসাহ পেলুম না দেখে বলল : নিশ্চিন্ত আরামের কথা তুমি তো আগে ভাবতে না!

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকালুম। এক নিমেষে সমস্ত অতীতটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কত সুখ দুঃখ দুর্ভাবনায় ভরা মধুর অতীত। এই তো সেদিন স্বাতিকে আমি প্রথম দেখেছিলুম হাওড়া স্টেশনে, মাদ্রাজ মেলের প্রথম শ্রেণীর একটা কামরার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মামাবাবুর হারানো চাকরকে খুঁজে দেখব বলতেই সে খিল খিল করে হেসে উঠে বলেছিল: আপনি তাকে খুঁজে দেখবেন মানে! চিনবেন কী করে?

তার এই মন্তব্যে আমি লজ্জা পেয়েছিলুম খানিকটা। যাকে দেখি নি কোন দিন, স্টেশনের সেই জনসমুদ্রে নিজে থেকে ধরা না দিলে কে তাকে খুঁজে বার করতে পারে! মামী আমার দিকে চেয়ে করুণ ভাবে বলেছিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পার না বাবা?

মামাবাবু খপ করে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তুমি রাজী হয়ে যাও গোপাল, তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

না, সেদিন আমি নিশ্চয়ই কোন নিশ্চিন্ত আরামের কথা ভাবি নি। আমার জাত বাউণ্ডুলে মন বোধ হয় আমার অজ্ঞাতসারেই নেচে উঠেছিল। কাজের দিনে আমি অফিস পালাতুম, আর ছুটির দিনে ফিরতুম না বাড়ি। বাহিরের আকাশ আমাকে টানত, আর সেই টানে ঘরে কিছুতেই মন বসত না। পরদিন থেকে ছিল পূজার ছুটি, আর ঘরে এমন কেউ ছিল না যার অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল। তবু আমি ইতস্তত করছিলুম বলে মামাবাবু আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলেছিলেন, কই, কথা কইছ না যে!

বড় অসহায় মনে হয়েছিল তাঁকে। জানালার ভিতর দিয়ে মামীর চোখও দেখেছিলুম বেদনায় ছলছল করছে, আর দরজায় দাঁড়িয়ে এই স্বাতি বড় বড় চোখ মেলে আমার উত্তরের অপেক্ষা করছিল।

কোন ভাবনার আর সময় ছিল না। বড় তাড়াতাড়ি বাজিয়ে দিয়েছিল শেষের ঘণ্টা। বড় তীব্র মনে হয়েছিল প্ল্যাটফর্মের আলো। যাত্রীরা যেখানে চলেছে, সেই উদার দিগন্তের স্নিগ্ধ স্নেহস্পর্শ ছিল না সেই কৃত্রিম আলোয়। তবু আমার চোখে আবেশ লেগেছিল, মনেও কি ছায়া পড়েছিল কোনও। মামাবাবুকে ঠেলে তুলে দিয়ে চলতি ট্রেনে আমিও উঠে পড়েছিলুম।

স্বাতি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল: কোন পুরনো কথা মনে পড়েছে বুঝি?

বললুম : হ্যাঁ।

কী কথা মনে পড়েছে, স্বাতি তা জানতে চাইল না। বলল : তুমি এখনও ভারি অবুঝ আছ।

কেন বল তো!

তোমার মনে আগে তো কখনও দুশ্চিন্তা দেখি নি। মন্দিরের বারান্দায় তুমি রাত কাটাতে পারতে, সব কথা ভুলে যেতে দেশ দেখার আনন্দে। তুমি কি ভাবছ, তোমার পায়ে আমি বেড়ি পরিয়েছি!

বাধা দিয়ে বললুম : না না, তা কেন ভাবব।

তবে?

আমি কোন দুশ্চিন্তার কথাই ভাবছিলুম না, তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ভাবছিলুম, সেদিন কিসের টানে আমি তোমাদের সঙ্গে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম।

স্বাতি হেসে বলল : সে কথা কি আজও বুঝতে পার নি?

না।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল : আমি জানি।

বললুম : বল।

এ কি বলবার কথা! মন দিয়ে অনুভব করতে হয়।

তারপরেই বলল : কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আরও অনেক আগে। তুমি আমায় চিনতে পার নি, কিন্তু আমি চিনেছিলাম তোমাকে।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল : মনে নেই! আমি তো বলেছিলাম তোমাকে!

মনে পড়েছে। কামরার জিনিসপত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে সুস্থ হয়ে বসতেই মামী বলেছিলেন, তোমার বোন স্বাতিকে বুঝি তুমি আগে দেখ নি গোপাল?

মাথা নেড়ে আমি স্বীকার করেছিলুম, দেখি নি।

কিন্তু স্বাতি বলেছিল, আমি কিন্তু গোপালদাকে আগে দেখেছি। নতুন কলেজে উঠে কনভোকেশন দেখতে গিয়েছিলাম। মনে পড়ছে, এম. এ. র ডিগ্রী গোপালদা নিয়েছিলেন গোড়ার দিকে।

এইবারে আমি স্বাতির কথার উত্তর দিলুম। বললুম: সে কথা ভুলি নি। আর একটা প্রশ্নও আমার মনে এসেছিল, সেকথা এখন মনে পড়ছে।

কী কথা ?

অনেকেই তো সেদিন ডিগ্রী নিয়েছে। কিন্তু তুমি আমায় মনে রেখেছিলে কেন! তুমি কি আমায় জানতে ?

স্বাতি বলল: না। তোমার কথা কেউ আমায় বলে নি। আমার যে ভাই নেই, দূর সম্পর্কেরও না, তা আমি জানতাম।

তবে ?

সে কথা কেন শুনতে চাইছ! সে কথাও কি মন দিয়ে বোঝা যায় না।

হয়তো যায়। কিন্তু শুনতে বোধহয় বেশি ভাল লাগবে।

না।

স্বাতির পরের কথা শোনবার জন্যে আমি তার দিকে তাকাতেই বলল: মনের কথা মনেই থাক, তাকে টানাটানি করে বার করলে আলোর তাপে তা শুকিয়ে যাবে।

স্বাতি যে এড়িয়ে যাবে আমি তা জানতুম। তাই আর কোন প্রশ্ন না করে চায়ের পেয়ালাটা শেষ করলুম।

বাহিরের আকাশ দেখে এসে স্বাতি বলল: রোদ এখনও ঝলমল করছে, আরও কিছুক্ষণ আমাদের ঘরে বসেই কাটাতে হবে।

বললুম: কাল থেকে তো পরিশ্রমের অন্ত থাকবে না। আজ একটু বিশ্রাম করা যাক।

স্বাতি ব্যাগ থেকে কিছু টুরিস্ট লিটারেচার বার করে বলল:

সময়ের অপব্যয় করে তো লাভ নেই, এই সময়েই এগুলো পড়ে নেওয়া যাক।

বলে নাগাল্যাণ্ডের সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমাকে পড়ে শোনাল।—

ডিমাপুরে অনেকগুলি হোটেল আছে। অম্বর হোটেলই সবচেয়ে ভাল মনে হয়, তার কারণ এটি বেশি পয়সার হোটেল। একজনের উপযোগী ঘর পনের থেকে পাঁচিশ এবং দুজনের তিরিশ থেকে চল্লিশ। এ ছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল হোটেল প্যালেস হোটেল নাগাল্যাণ্ড টুরিস্ট হোটেল ও পাঞ্জাবী হোটেল আছে। ভাড়া আট-দশ টাকা থেকে কুড়ি-পঁচিশ টাকা। দোতলা টুরিস্ট লজে আটাশ জনের থাকবার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া একজনের সাত থেকে আঠারো টাকা, দুজনের বারো থেকে চব্বিশ। সার্কিট হাউস দুটো আছে। পুরনোটায় পাঁচটা ঘর, আর ষোলটা ঘর নতুনটায়। এক ঘরে দুজনে থাকতে পারে, ভাড়া মাথা পিছু পাঁচ টাকা। সাত দিন আগে ডিমাপুরের অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনারের কাছে আবেদন করতে হয়। দুটো এয়ার কণ্ডিশণ্ড রেস্তোরাঁ আছে। নাম প্লাজা আর ব্রীজ। দেশী বিলেতি ও চীনা খাবার পাওয়া যায়।

দর্শনীয় স্থানের নাম আছে। ধনসিরি নদী, বোধহয় ধনশ্রীর অপভ্রংশ, শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে চা বাগান, দশ কিলোমিটার দূরে চিনির কল, নিউ মার্কেট বা দেবী মার্কেট এবং রুথ্‌স্ নাগা এম্পোরিয়াম।

এই পর্যন্ত পড়ে স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল। আমি বললুম: হাসলে যে?

স্বাতি বলল: লোকে এখানে কি চা বাগান আর চিনির কল দেখতে আসবে!

তুমি কি ভাবছ কাছাড়ী রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের কথা লিখলে লোকে সেখানে ছুটে যেত!

হাজার হলেও ঐতিহাসিক নিদর্শন তো।

অতীত যে লোকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছে, তা তুমি ভুলে যাচ্ছ। পুরনো গৌরবের আলোচনা বর্তমান সমাজে আমাদের দুর্বলতা বলে নিন্দা করা হচ্ছে। আমাদের প্রগতিতে ইতিহাসের স্থান নেই। তার চেয়ে কলকাতায় ফিরে যদি বলতে পার যে ডিমাপুরে প্লাজার চীনা খাবার অপূর্ব, তাহলে তোমার বন্ধুরা ভুরু নাচিয়ে বলবে, সত্যি! এমন ভাবে বলবে যে মনে হবে তোমার যাত্রা সার্থক হয়েছে এবং এক দিন তারাও এই চীনে খাবার চেখে দেখবার জন্যে ডিমাপুরে উড়ে আসবে।

স্বাতি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাই দেখে বললুম: আমি মিথ্যে বলছি না স্বাতি। আমরা যা দেখে আনন্দ পাই তা এ যুগের লোকের কাছে হাস্যাস্পদ ব্যাপার।

স্বাতি বলল: আজ কি কেউ তোমাকে এ কথা বলেছে!

মাথা নেড়ে বললুম: হ্যাঁ। কোহিমায় বেড়াতে যাচ্ছি শুনে একজন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না, বোধহয় মাথা খারাপ বলে ভেবেছিল। থাক সে কথা। তার পর কী লিখেছে পড়।

স্বাতি বলল: দেখছি, কলকাতা থেকে ডিমাপুরে উড়ে আসা যায় গৌহাটি ও তেজপুর হয়ে। গৌহাটি থেকে বাসেও আসা যায়, সময় লাগে আট ঘণ্টা, ভাড়া চব্বিশ টাকা। ডিমাপুর থেকে কোহিমা চুয়াত্তর কিলোমিটার, মানে ছেচল্লিশ মাইলের কিছু বেশি। পাহাড়ী পথ বলে সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা, ভাড়া এগারো টাকা। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল দুশো চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, মানে দেড়শো মাইল দূরে। ভাড়া চব্বিশ টাকা আর পৌঁছতে সময় লাগে সাড়ে সাত ঘণ্টা

তারপর?

তারপর কোহিমার কথা। সমুদ্রতল থেকে ৪৮৬০ ফুট উঁচুতে এই শহর পাঁচ মাইল লম্বা। কিন্তু শহরে বেড়াবার জন্যে কোন যানবাহন নেই।

তবে দেখব কী করে ?

দেখবার কী আছে দেখি।

বলে স্বাতি উপর নিচে একবার চোখ বুলিয়ে বলল : ওয়ার সিমেট্রি দেড় কিলোমিটার, এম্পোরিয়াম পঞ্চাশ গজ, জুলজিক্যাল পার্ক তিন কিলোমিটার, কোহিমা গ্রাম দু কিলোমিটার, খোনোমা গ্রাম কুড়ি কিলোমিটার, জাপভো পিক বারো কিলোমিটার, জুজা প্রজেক্ট বারো কিলোমিটার, আর নাগাল্যাণ্ড স্টেট মিউজিয়ম দু কিলোমিটার

বললুম : বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে এম্পোরিয়াম দেখা যাবে, আর ওয়ার সিমেট্রি, মিউজিয়ম ও জুলজিক্যাল পার্ক যদি একদিকে হয় তো চেষ্টা করা যাবে।

তার পরেই আমার ইভার কথা মনে পড়ে গেল। বললুম : আর সব চেয়ে জরুরি কাজ হল ইভার স্বামীর একটা খোঁজ নেওয়া। আমার কাছে ব্যাপারটা একটু রহস্যময় মনে হচ্ছে।

স্বাতি বলল : রহস্যময় কেন ?

ইভা নিজেই তো খোঁজ নিতে আসতে পারে! কেন আসে না! বাধা কিসের তা বুঝতে পারি না বলেই রহস্যময় মনে হচ্ছে। আর এইজন্যে রহস্যভেদের একটা ইচ্ছাও মনে জেগেছে।

ওর স্বামীর ঠিকানা তুমি দেখেছ ?

দেখেছি। ওটা নিজের ঠিকানা নয়, ওটা আর একজনের ঠিকানা। তাকে খুঁজে বার করা কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

তারপরেই বললুম : ইভার কথা থাক, তুমি কোহিমার খবর বল।

স্বাতি বলে উঠল : কোহিমাতেও তো অনেকগুলো হোটেলের নাম দেখছি রাজু অ্যামবাসাডার টিপটপ উডল্যাণ্ড আর এভার গ্রীন হোটেল। একজনের খরচ ছয় থেকে দশ টাকা। এ ছাড়া সার্কিট

হাউসে দশটা ঘর আছে। ভি. আই. পি. গেস্ট হাউসে আছে চারটে ঘর।

বললুম: সার্কিট হাউসের জন্যে নিশ্চয়ই ডেপুটি কমিশনারের দ্বারস্থ হতে হবে।

স্বাতি বলল: সরকারী ব্যবস্থাকে তুমি ভয় পাও দেখছি।

বললুম: সরাসরি গিয়ে ঢোকবার অধিকার থাকলে ভয় পেতুম না।

স্বাতি আবার পড়তে লাগল: রেস্তোরাঁও আছে গোটা কয়েক— গেলর্ড রাবু কফি হাউস। নিউ মার্কেট সুপার মার্কেট আছে, শিব বাড়ি দুর্গা বাড়িও আছে দেখছি। তবে আর ভাবনা কী। কোথাও জায়গা না পেলে মন্দিরে আশ্রয় নেব।

ঘর ছেড়ে আমরা যখন বেরোলুম, দিনের আলো তখন নিবে এসেছে। বারান্দায় জন কয়েক যুবক বাংলায় কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁদের মধ্যেই একজন এগিয়ে এসে বললেন: আপনারা বুঝি কোহিমায় বেড়াতে যাচ্ছেন?

বললুম: আপনি জানলেন কী করে?

ভৌমিকদার কাছে।

একে একে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হল। এঁরা সবাই বিভিন্ন কোম্পানীর কমার্সিয়াল রেপ্রেজেণ্টেটিভ আর পরস্পরের পরিচিত। শুধু নাগাল্যাণ্ড নয়, মণিপুর মিজোরাম ত্রিপুরা রাজ্যেও ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন নিজেদের কোম্পানীর মালপত্র বেচবার ব্যবস্থা করতে।

আমি বললুম: তাহলে তো ভালই হল। এই সব জায়গায় গিয়ে কোথায় থাকব, আপনাদের কাছেই জেনে নিই।

স্বাতি বলল: কোহিমায় কোন্ হোটেলে থাকতে পারি বলুন।

একজন বললেন: একটা টুরিস্ট লজ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কবে শেষ হবে বলতে পারি না। পরে যদি আবার আসেন খোঁজ নেবেন।

তাহলে এবারে ?

বাস স্ট্যাণ্ডের সামনে এভার গ্রীন হোটেলে দেখতে পারেন। এক রাতের ব্যাপার তো, চলে যাবে।

ইম্ফলে ?

থাঙ্গালবাজারে নটরাজ হোটেলে উঠবেন। মালিক চঞ্চল সিং হিমাচলের লোক। ভাল ব্যবহারে আপনাদের অসুবিধা পুষিয়ে দেবেন।

এঁদের কাছেই আমি শিলচর আইজল ধর্মনগর ও আগরতলার খবরও সংগ্রহ করলুম। কয়েকটা হোটেলের নামও লিখে নিলুম একখানা কাগজে। কথায় কথায় জানতে পারলুম যে যিনি আমায় এইসব খবর দিলেন, তিনি আমাদের পাড়ারই এক পরিচিত ভদ্র-লোকের ভাগনে। এঁদের নাম প্রকাশ করার সাহস আমার নেই। তার কারণ আছে। রাজস্থান ভ্রমণে বেরিয়ে আমি কিশানগড়ের ডাক্তার সত্যকুমার বসুর কথা লিখেছিলুম। পরে তাঁর নিগ্রহের কথাও জেনেছিলুম। রাজস্থান ভ্রমণে বেরিয়ে অনেক বাঙালী তাঁর অতিথি হতেন। অত্যন্ত সহৃদয় মানুষ বলেই তিনি সবার সব অত্যাচার সয়েও আনন্দ পেতেন। এই ঘটনা জানবার পর থেকে পথের বন্ধুদের নাম আমি লিখি না, লিখলেও নাম একটু পাল্টে দিই। সেই নাম দেখে চেনা মানুষই চিনতে পারবে, নতুন কেউ তাঁকে আবিষ্কার করতে পারবে না। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই যাত্রায় অনেকের সঙ্গেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল।

বারান্দায় যে চেয়ারগুলি ছিল তাতে বসেই আমরা গল্প করছিলুম।

দাদা ভাই !

বলে হুঙ্কার দিয়ে যিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখেই আমি চিনতে পারলুম। ইনিই এই রেস্ট হাউসের মালিক। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন : আপনাদের একটা সামান্য উপকার আমার দ্বারা হল না, এই লজ্জায় আমি মুখ দেখাই নি।

ভাষাটা এ রকম নয়, এ রকম বাঙলা ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু সবই বুঝতে পারছিলুম। ভদ্রলোক বললেন: টেলিফোনে ব্যবস্থা পাকা করে এলাম। যে ডেপুটি সেক্রেটারি এম. এল. এ হস্টেলের ঘর দেবেন, তাঁর ভাইপো এখানে পুলিসে কাজ করে। তাকে দিয়ে টেলিফোন করালাম। এই নিন চিঠি।

বলে এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন: খুড়োকে লিখে দিয়েছে যে এই চিঠি দেখালেই ঘর পাবেন।

চিঠিখানা পকেটে রেখে আমি বললুম: অনেক ধন্যবাদ। আমাদের জন্যে আপনি অনেক কষ্ট স্বীকার করলেন।

এ আর কষ্ট কী! বাঙালীর জন্যে এইটুকুই যদি করতে না পারলাম তাহলে এখানে এতদিন কি ঘাস কাটছি!

বলে ফিরে গেলেন। তাঁর বলার ছন্দে খানিকটা গৌরবের আভাস পেলুম।

## ১৫

সকাল সাতটার কিছু পরেই আমাদের কোহিমায় বাস ছাড়ল। একেবারে সামনের দিকে আমরা দুটো সীট পেয়েছিলুম। স্বাতি বসেছিল জানালার ধারে, আর আমি ভিতরের দিকে। একটা ব্যাগ ছিল আমাদের পায়ের কাছে, সুটকেশ আর হোল্ডল বাইরে ছিল।

এই বাস ধরতে হবে বলে আমরা বেশ ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলুম। গরম জলে স্নান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়েছিলুম রেস্ট হাউসের ঘরেই। দেরি হচ্ছিল বলে ব্যস্ত হয়েছিলুম আমরা, কিন্তু ভৌমিকের ভাবনা ছিল না। বলেছিল, বাস তো নিচে থেকেই ছাড়ে, দু মিনিট আগে নামলেও বাস ধরতে পারবেন।

আমরা বারান্দায় বেরিয়ে দেখছিলুম যে ঠিক নিচের বারান্দায় যাত্রীরা এসে জড়ো হয়েছেন। একটার পর একটা বাস এসে দাঁড়াচ্ছে। যাত্রীরা উঠছে আর বাস ছেড়ে যাচ্ছে। ডিমাপুর থেকে কোহিমার বাস বিকেল চারটে পর্যন্ত এক ঘণ্টা পর পর ছাড়ে। এ কথাও জানতে পারলুম যে মণিপুর স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস এখান থেকে ছাড়ে না। তার আলাদা বাস স্ট্যাণ্ড আছে, সে বাস শুধু ইম্ফলে যায়, কোহিমা শহরের ধার ঘেঁষে, কোহিমার বাস স্ট্যাণ্ডের ধারে কাছেও আসে না। পর পর দু-তিনখানা বাস ছাড়ে এই সকাল বেলায়, তারপর আর বাস নেই। সারাদিন সময় লাগে বলে বিকেলে কোন বাস ছাড়ে না।

আমাদের বাস এল সাতটার একটু পরেই। যাত্রীরা অপেক্ষা করছিলেন। আমরাও সময় মতো নেমেছিলুম। হুড়মুড় করে

সবাই উঠে পড়লুম। বাস ছাড়তে আরও কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেল।

একজন যাত্রী বললেন: কোহিমায় পৌঁছতে আরও দেরি হবে।

আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন: কেন?

তিনি উত্তর দিলেন: পথের নানা জায়গায় ভেঙে গেছে, সেখানে খুব সাবধানে চলতে হয়।

আমরা বুঝতে পারলুম যে আড়াই ঘণ্টার বদলে হয়তো তিন ঘণ্টা সময় লাগবে কোহিমায় পৌঁছতে, দশটার পরেই আমরা পৌঁছে যাব। তারপরে একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে শহর দেখতে হবে।

আমাদের বাস তখন ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে চলছিল। খানিকটা এগিয়েই একটা ছোট নদীর পুল পেরোল। এই নদীরই নাম ধনসিরি বা ধনশ্রী। ডিমাপুর থেকে আসাম ও নাগাল্যাণ্ডের সীমানা ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই অঞ্চলে জেলিয়াং ও কুকিদের বাস।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলেছি। আসামের সীমান্তে কিছু সমতল ভূমি ছাড়া নাগাল্যাণ্ডের প্রায় সবটাই পার্বত্য এলাকা। পাহাড়ের চূড়াগুলি ন শো থেকে বারো শো মিটার উঁচু। রাজ্যের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গের উচ্চতা ৩,০৪০ মিটার। ব্রহ্মদেশের সীমান্তে তুয়েন সাং জেলার এই শৃঙ্গের নাম সরমতি। কোহিমা শহর থেকে বারো কিলোমিটার দূরে জাপভো শৃঙ্গটিও তিন হাজার মিটারের বেশি উঁচু। পাহাড়ের উচ্চতা মিটারে বললে এখনও আমরা ভাল বুঝতে পারি নে। আমাদের পুরনো হিসাবে জাপভো ৯,৮৯০ ফুট উঁচু। হিমালয়ের সঙ্গে তুলনায় এ উচ্চতা কিছুই নয়। কিন্তু যখন আমরা দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করি, তখন এই পাহাড়কে নিচু ভাবতে পারি নে। নীলগিরির সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ ডোডাবেট্টা ৮,৭৬০ ফুট উঁচু। মোটরে চড়ে এখন এই শৃঙ্গে ওঠা যায়।

রাজ্যের আয়তন বললেও আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট হয় না। তাই হিসেব করে দেখেছি যে এই রাজ্য লম্বায় একশো ষাট মাইল ও চওড়ায় মাত্র নব্বুই মাইল। ন্যাশনাল হাইওয়ে কোহিমার উপর দিয়ে ইম্ফলে গেছে, আর স্টেট হাইওয়ে কোহিমা থেকে উত্তরে মোককচুঙের উপর দিয়ে উত্তরে সীমান্ত পেরিয়ে আমগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেছে। মরিয়ানি ছাড়িয়ে আমগুড়ি। মোককচুঙে কাজ থাকলে ডিমাপুর থেকে কোহিমা হয়ে যাবার দরকার নেই, আমগুড়ি থেকে এই শহর অনেক নিকটে। কোহিমা থেকে পূর্বে ফেক পর্যন্ত স্টেট হাইওয়ে আছে।

শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে এই পাহাড়ী রাজ্যটার কোনখানে একটি ঝর্ণা নেই, অথচ নদী আছে অনেকগুলো। ধনসিরির মতো দোয়াংও এ রাজ্যের একটি প্রধান নদী, দিখু তিজু ও মেলাখা নামেরও নদী আছে। লাচাম নামে একটি হ্রদ আছে ফেক থেকে কিছু দূরে, মেলুয়ির নিকটে।

হেমন্তের হাওয়ায় ভাল লাগছে এই যাত্রা। পাহাড়ী পথে পাক খেয়ে চলেছে আমাদের বাস। কোথাও বেগে চলেছে, কোথাও গতি মন্থর হচ্ছে। পথের শোভা দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি। ডিমাপুর থেকে মাইল দশেক দূরে চুমুকেডিমা পেরিয়ে এসেছি, ডিপু-পানির পুল পেরিয়েছি, ঘামপানিও ছাড়িয়ে এলুম।

শুনেছি এই রাজ্যে ন শোরও বেশি গ্রাম আছে। লক্ষ্য করে দেখলুম যে এই গ্রামগুলির কোনটাই সমতলভূমিতে নয়। পাহাড়ের চূড়ার আশেপাশে নির্মিত হলদে বাড়িঘরগুলো, আর পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে কেটে ক্ষেত তৈরি হয়েছে। এই ক্ষেতে তারা কী ভাবে জলসেচ করে তা নিজের চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না।

আমার মতো স্বাতিও এতক্ষণ নিঃশব্দে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিল। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল: একটা কথা ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগছে।

কী কথা বল তো!

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

স্বাতি বলল: এদের ঘর বাড়ি সব উঁচু জায়গায়। ক্ষেত খামার সব পাহাড়ের গায়ে ওপর থেকে ধাপে ধাপে খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই ক্ষেতে কাজ করতে কত পরিশ্রম হয় এদের।

আমি বললুম: আর এই ক্ষেতে জলসেচের কথা ভাব। কী ভাবে কোথা থেকে জল আনে তা এরাই জানে।

এরই নাম জীবন যুদ্ধ।

বললুম: শুধু জীবন ধারণের জন্যে যুদ্ধ নয়, জীবন রক্ষার জন্যেও এদের সর্বদা যুদ্ধ করতে হয়।

এখনও?

এখন আর বোধহয় আগের মতো নয়। তবে এদের জীবনযাত্রা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছে কিনা তা জানি না।

স্বাতি নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: পরে বলব

বাসের গতি হঠাৎ খুব মন্থর হয়ে গেল। চেয়ে দেখলুম যে অনেকটা পথ এখানে ভেঙে গেছে, মেরামত হচ্ছে পথ। তাই খুব সতর্ক ভাবে চলতে হবে। আগেও এ রকম ভাঙা পথ দেখেছি, কিন্তু এ জায়গাটা একটু ভয়াবহ। বাসের ড্রাইভার খুবই সন্তর্পণে এই পথটুকু পেরিয়ে গেল।

স্বাতি তার চারি ধারে একবার চেয়ে দেখল, তারপরে আস্তে আস্তে বলল: নাগাদের সম্বন্ধে কিছু বলবে না?

বললুম: তুমি তো তাদের কথা শুনতে চাও নি!

তাদের সামাজিক জীবনযাত্রার কথা কিছু বল।

বললুম: এই পথে আসতে আসতে তাদের গ্রামের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। গ্রামগুলো দেখেছি পাহাড়ের চূড়ায়। কঠোর পরিশ্রম করে গ্রামবাসীদের ওঠা-নামা করতে হয়। একটু ভাবলেই

বোঝা যাবে যে একসময়ে এর প্রয়োজন ছিল খুবই। এদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। মারামারি কাটাকাটি একটা দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। তাই এরা গ্রামগুলিকে দুর্গের মতো করে গড়ত। শুধু পাহাড়ের চূড়োয় থেকেই নিশ্চিন্ত হত না। গ্রামের চারি দিক ঘিরে পাথরের দেওয়াল দিত, পরিখার মতো গর্ত কাটত, ছুঁচলো করে বাঁশ পুঁতত, আর গ্রামে ঢোকবার পথটি হত কষ্টসাধ্য সরু পথ এক সঙ্গে একজন চলবার উপযোগী। কাঠের মজবুত দরজা থাকত পথের শেষ প্রান্তে। তার ফাঁক দিয়ে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করবার ব্যবস্থাও ছিল। যখন দুই গোষ্ঠীতে বিবাদ শুরু হত, তখন দিবারাত্রি পাহারা থাকত এই দরজায়।

স্বাতি বলল : এক একটা গ্রামে কত লোক বাস করে ?

বললুম : তার কোন ঠিক নেই। কুড়ি-পঁচিশটা বাড়ি নিয়ে গ্রাম আছে, আবার এমন গ্রামও আছে যেখানে এক হাজারেরও বেশি বাড়ি। তবে নতুন গ্রাম যে সব গড়ে উঠছে, তার কোনটাই দুর্গের মতো নয়।

কেন ?

নাগারা এখন শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তাই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে। সময় থাকলে কোহিমায় বা অনতিদূরে খোনোমায় গিয়ে আমরা একটা পুরনো গ্রাম দেখে আসতে পারি।

স্বাতি কিছুটা ভয় পেয়ে বলল : স্থানীয় বন্ধু না পেলে এ খুব দুঃসাহসের কাজ হবে।

তা হবে। কেননা এখনও আমরা এদের কাছে বিশ্বাসভাজন হতে পারি নি।

স্বাতি বলল : গ্রামে গেলে তুমি আর কী দেখতে ?

বললুম : একটা মোরাঙ্।

শব্দটা শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।

নিশ্চয়ই শুনেছ, কিংবা পড়েছ কোথাও। গ্রামের সমস্ত অবিবাহিত ছেলেদের বাসগৃহকে মোরাঙ্ বলে। কিন্তু শুধু বাসগৃহ বললে সব কথা জানা হবে না। একে তুমি গ্রামের ক্লাব বলতে পার, গ্রামরক্ষীদের ব্যারাক বলতে পার, গ্রামের দপ্তরও বলতে পার।

কেন ?

বলছি। ছেলেদের বয়েস ছ-সাত বছর হলেই তাকে এই মোরাঙে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সব ছেলেরা বড় হয়ে বিয়ে করে, সংসারী না হওয়া পর্যন্ত এই মোরাঙেই থাকে। এদের শিক্ষা দীক্ষা হয় এখানে, এখানেই তারা লোকগাথা ও নৃত্যগীত শেখে, নিজ নিজ গোষ্ঠীর বীরত্বের কথা শুনে যুদ্ধবিগ্রহে পটু হয়ে ওঠে। গ্রামের ঢাল বর্শা ও দা এই অস্ত্রগুলিও থাকে মোরাঙে, আর মানুষের মাথার খুলি সাজানো থাকে সারি সারি। গ্রামের এই ঘরটিই সব চেয়ে সুন্দর করে তৈরি করা হয়। কাঠের চৌকাঠে থাকে সুন্দর কারুকার্য। গ্রামে কোন বিপদ উপস্থিত হলে এই মোরাঙে মিটিং করেই কর্তব্য স্থির করা হয়। কাজেই বলতে পার যে নাগা ছেলেদের চরিত্র গঠন হয় এই মোরাঙে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে অঙ্গামি নাগাদের নাকি মোরাঙ নেই। অন্য জাতের নাগাদের আছে, আর এই মোরাঙের বাইরে থাকে একটা গাছের ফাঁপা গুঁড়ি। ছেলেরা দু-ধারে দাঁড়িয়ে হাতুড়ির মতো পিটে যখন এই কাঠের ড্রাম বাজায় তখন নাকি কয়েক মাইল দূর থেকেও তা শোনা যায়। শুধু যুদ্ধের জন্যে ডাক নয়, যুদ্ধ জয়ের বাজনাও বাজানো হয়। আবার উৎসবেও বাজানো চলে, তার আলাদা সুর।

স্বাতি বলল : এত কথা তুমি জানলে কোথায় ?

বললুম : প্রকাশ সিং এর বই পড়ে। ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসে কাজ করবার সময়ে এই রাজ্যে তিনি কিছু দিন কাটিয়েছিলেন। আর এমন কিছু কথাও লিখেছেন যা বলতে ভয় পাই।

স্বাতি তার চারি ধারটা আর একবার দেখে বলল : আস্তে আস্তে বল।

যতটা সম্ভব গলার স্বর নামিয়ে বললুম : এদের মধ্যে নাকি শিশুহত্যা দাসপ্রথা ও বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত ছিল। কুমারী মেয়েদের ছেলে হবার সময় অঙ্গামিরা তাদের বনে পাঠিয়ে দিত, আর শিশু ভূমিষ্ঠ হতেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলত। দাসপ্রথা ছিল আওদের মধ্যে, কিন্তু দাসদের সঙ্গে তারা দুর্ব্যবহার করত না। আর—

বল

কোহিমার পূর্বে চাখেলাংদের এলাকায় বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত ছিল। বিধবা ও অবিবাহিত মেয়েরা এই কাজে নামত।

স্বাতি চুপ করে রইল, কিন্তু আমি বললুম : প্রকাশ সিং আর একটা বীভৎস কথা লিখেছেন। নাগাদের নাকি খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই। সাধারণত তারা ভাত সব্জি ও গরু শুয়োর বা মুর্গির মাংস খায়। কিন্তু কোন মাংস খেতেই নাকি তাদের আপত্তি হয় না। কুকুর বেড়াল মাকড়শা প্রভৃতি যা পায় তাই খায়। আর শরীরের কোন অংশ বাদ দেয় না।

স্বাতি বলল : অবিশ্বাস্য কথা।

বললুম : এ তো আমার কথা নয়, আমি বই পড়ে এই কথা বলছি। হাতির মাংস তারা রেঁধে খায়, ধোঁয়ায় শুকিয়ে রেখে দরকার মতো রেঁধেও খায়। বাঘের মাংস খেতে হলে ঘরের বাইরে রেঁধে খেতে হয়। তবে মেয়েদের নাকি কোন কোন মাংস খাবার নিয়ম নেই, বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের।

স্বাতি চোখ বুজে রইল।

আমি বললুম : শুনে আশ্চর্য হবে যে দুধ এরা খেত না, এখন শুধু শহরের লোকেই খাচ্ছে। এখানকার ছেলে মেয়ে বুড়োর এক-মাত্র পানীয় হল ভাতের বীয়ার।

স্বাতি বলল : খাবার কথা আর শুনতে চাই নে। তুমি অন্য কিছু বল।

বললুম : তাহলে আর একটা বীভৎস ব্যাপারের কথা বলতে হয়।

কী?

হেড্-হান্টিং এর কথা।

চোখ বুজে স্বাতি শিউরে উঠল। তাই দেখে আমি বললুম ভয় পেও না। শিউরে উঠবার মতো কোন ঘটনা এখানে ঘটবে না।

স্বাতি বলল : খেলার ছলে মানুষের মুণ্ডু কী করে কাটে, আমি তা ভাবতে পারি না।

বললুম : খেলার ছলে তো কাটে না, এর পিছনে নানা রকমের আদর্শ আছে। আর এ কাজ শুধু নাগাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই নৃশংস কাজ প্রচলিত ছিল।

পৃথিবীর সর্বত্র

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এই প্রথা ইউরোপেও প্রচলিত ছিল।

কোথায়?

ভূমধ্য সাগরের তীরে বলকান উপদ্বীপে। আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও এশিয়ার বর্মা ও বোর্নিওতেও ছিল। আমাদের দেশের মিজোরাও কম যেত না। আর তান্ত্রিক বা কাপালিকদের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। সে কাজ তো আরও বীভৎস!

স্বাতি বলল : নরবলি তো ধর্মের নামে একটা কুসংস্কার ছিল।

বললুম : এই সব কাজের পেছনে এই রকমের কোন সংস্কার থাকেই। নাগাদেরও ছিল। তারা ভাবত, মানুষের আত্মা থাকে তার মাথায়, আর এই আত্মাকে এনে নিজেদের গ্রামে জড়ো করতে পারলে গ্রামের সমৃদ্ধি বাড়বে। জনসংখ্যা বাড়বে, গরু বাছুর বাড়বে,

ক্ষেতভরা ফসল হবে। তাই অন্য গ্রাম থেকে আত্মা আনতে হবে মাথা কেটে। দুই গ্রামে যুদ্ধ বাধলে মাথা চাই। শান্তির সময়েও হঠাৎ আক্রমণ করে মাথা কেটে আনতে আপত্তি নেই। শুধু পুরুষের মাথা নয়, মেয়ে ও শিশুদের মাথাও আনা যে· পারে। মাথা কেটে আনতে পারলে সমাজে প্রতিষ্ঠা ···ড়, জমকালো সাজসজ্জার অধিকারী হওয়া যায়, পছন্দমতো মেয়েকে বিয়ে করতে পারা যায়। আর তা না পারলে মেয়েরাও বিদ্রূপ করে, যুবকদের আইবুড়ো থাকতে হয়। এইবারে তুমিই বল, হেড হান্টিং বন্ধ হয় কী করে?

স্বাতি সবিস্ময়ে বলল : এখনও এই প্রথা চলছে?

বললুম : চলছে বলব না, আবার বন্ধ হয়েছে বললেও ভুল বলা হবে।

একটু বুঝিয়ে বল।

গত শতাব্দী থেকেই এই প্রথা বন্ধ করার জন্যে জোর চেষ্টা চলছিল। মিশনারীরাও এই কাজে নেমেছিলেন। গত শতাব্দীর শেষ দিকে রেঙ্গমা ও লোটারা এ কাজ ছেড়ে দিয়েছিল, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ছেড়েছে অঙ্গামি আও ও সেমারা, আর সাঙ্গটামরা ছেড়েছে দেশ স্বাধীন হবার সময়।

তবে এই প্রথা বন্ধ হয় নি বলছ কেন?

বলছি এই জন্যেই যে ১৯৬৩ ও ১৯৬৯ সালেও এ রকমের ঘটনা ঘটেছে তুয়েনমার জেলায়। একবার এক দলের তিন জন মেয়ে খুন হয়েছিল বলে তারা অন্য দলের সাঁইত্রিশ জনকে খুন করেছিল। আর একবার এক গ্রামের এক মোড়ল শিকারে গিয়ে খুন হয়েছিল বলে সেই গ্রামের একশো জন অন্য এক গ্রামে চড়াও হয়ে পুরুষ স্ত্রী ও শিশুর ত্রিশটা মাথা কেটে এনেছিল। এ তো মাত্র ন বছর আগের কথা। এ রকম ঘটনা যে আবার ঘটবে না তা কি হলফ করে বলতে পার?

স্বাতি নীরব আছে দেখে আমি বললুম: কিছুদিন আগে

কলকাতায় আমরা এ রকম ঘটনা শুনি নি কি। অন্ধ্রে ও কেরালাতেও ঘটেছে বলে কাগজে পড়েছি। তার পেছনে নাকি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। রাজনীতি বুঝি না বলে সব কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি।

স্বাতি বলল: রাজনৈতিক কারণে মানুষ নিষ্ঠুর হতে পারে, এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।

তবু তো নিষ্ঠুরতার শেষ হচ্ছে না।

কোহিমায় পৌঁছতে আর বোধহয় বেশি দেরি ছিল না। আর অল্প সময় আমাদের গল্প করে কাটাতে হবে। তাই স্বাতি বলল: এইবারে ভাল কিছু বল।

বললুম: তাহলে নাগাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়।

তাই বল।

নাগাদের মধ্যে এত জাত ও উপজাত আছে যে তাদের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বললে তা সব সময় সত্য নাও হতে পারে। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে এদের সব জাতের ধারণা এক রকম নয়। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে নাগা মেয়েরা লম্বায় কিছু খাটো হলেও দেখতে সুন্দর। সুগঠিত কর্মঠ দেহ ও গায়ের রঙ ফর্সা। সংসারের সমস্ত কঠিন কাজ সেরেও তারা পুরুষদের সাহায্য করে ক্ষেতের কাজে, আবার ঘরে বসে কাপড়ও বোনে। অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাধীন ভাবে মেলামেশার কোন বাধা নেই। ছেলেরা নিজেদের গোষ্ঠীতে বিয়ে করতে পারে না, বিয়ের জন্যে তাদের গ্রামের বাইরে যেতে হয়। কোন মেয়েকে পছন্দ হলে অভিভাবক এসে বলে। তারপরে বিয়ের কথা পাকা হয়। মেয়েদেরও মত দেবার অধিকার আছে।

স্বাতি বলল: নাগা ছেলেদের কথা বললে না?

তারাও মেয়েদেরই মতো কর্মঠ ও পরিশ্রমী। প্রসন্ন মেজাজের

ও অতিথিবৎসল। অনেকেই খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষার দ্রুত প্রসার হচ্ছে। আদিবাসী সমাজের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়েছে শিক্ষিত নাগারা। তাদের সম্বন্ধে পুরনো ধ্যান-ধারণা এখন ভ্রান্ত বলে মনে হবে।

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল: তাদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কিছু বল।

তাহলে আমাকে পুরনো পড়া কথা বলতে হবে।

তাই বল।

বললুম: অঙ্গামি মেয়েদের প্রেমিক থাকতে পারে, কিন্তু অসংযমী হবার অধিকার নেই। তারা একটা বিয়ে করে। কিন্তু সেমা মেয়েদের সে অধিকার নেই। কোন কলঙ্ক না হলে বাপে অনেক পণ পাবে বলে মেয়েকে কঠিন পাহারায় রাখে। কিন্তু সেমা পুরুষেরা পয়সা থাকলে বহু বিবাহ করতে পারে। আও মেয়েদের স্বাধীনতা বেশি। বড় হলে তারা দুজন সখীর সঙ্গে অন্য ঘরে শুতে পারে। আর সেখানে তার প্রেমিক রাতে এলেও দোষের বলে ধরা হয় না। কনিয়াক ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহের আগে যৌন স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তা একজনের সঙ্গেই। তা না হলে ব্যাপারটা খুব নিন্দার। এদের সর্দার ছাড়া আর কেউ একটার বেশি বিয়ে করতে পারে না।

স্বাতি বলল: বিবাহবিচ্ছেদ নেই?

বললুম: ছিল। আর এখনও যে নেই তা নয়। আর এ ব্যাপারটা খুবই সহজ। আওদের মধ্যে স্বামী স্ত্রী দুজনেই প্রথম পক্ষ, এমন দম্পতি নাকি কম দেখা যেত। কিন্তু বেশি কন্যাপণ দিতে হয় বলে সেমারা বিবাহবিচ্ছেদ পছন্দ করে না। খেমুঙ্গান নাগাদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহ প্রচলিত।

রাক্ষস বিবাহ!

মানে আমাদের পুরাকালের ব্যাপার। দলবল নিয়ে কোন

মেয়েকে কেড়ে আনলেই সে বউ হয়ে গেল। আর এই রকম বউএরও স্বাধীনতা অনেক। একদিন সকালে উঠে ঝাঁটপাট দিয়ে রান্নাবান্না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল।

যাত্রীদের মধ্যে খানিকটা তৎপরতা দেখা গেল। বুঝতে পারলুম যে কোহিমায় পৌঁছতে আর দেরি নেই।

## ১৬

পাহাড়ে পাক খেয়ে খেয়ে আমরা ৪,৮৬০ ফুট উঁচুতে উঠে এসেছিলুম। কোহিমা শহরটা সামনে বিস্তৃত দেখা গেল। পথ আর উপরে উঠছে না, সমতল পথে এগিয়ে চলেছে। দু ধারের ঘরবাড়ি কিছু উপরের দিকে উঠে গেছে, কিছু নেমে গেছে নিচের দিকে। দোকান-পাট আর পথচারীদের দেখে আধুনিক পাহাড়ী শহর বলে মনে হল। হুস-হাস করে জীপ আর মোটর গাড়ি বাসের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পথে ট্রাফিক পুলিস আছে স্থানে স্থানে। যেখানেই কোন নতুন পথ উঠে বা নেমে গেছে, সেখানেই পুলিস। কিন্তু কোথাও আমাদের থামতে হল না। আমরা শহরের ঠিক কেন্দ্রে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে থামলুম।

এখানে কুলি দাঁড়িয়ে ছিল অনেক। তাদেরই একজন আমাদের মালপত্র নামিয়ে নিল। আমি লক্ষ্য করলুম যে এরা কেউই নাগা নয়। মনে হল এরা বিহার থেকে এসেছে জীবিকার জন্য। স্বাতি বলল: তুমি একটু দাঁড়াও, আমি একটা খবর নিয়ে আসছি।

কী খবর, আমি তা জানতে চাইলুম না। আমি বুঝতে পেরেছি যে স্বাতি টেলিফোনে আমাদের বাসস্থানের খবর নেবে। অর্থাৎ এম. এল. এ. হস্টেলে জায়গা পাবে কিনা তা না জেনে সেখানে যাবার চেষ্টা করবে না। তার কারণ খুবই স্পষ্ট। বাস স্ট্যাণ্ডের সামনেই কয়েকটা হোটেল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এভারগ্রীন হোটেলের সাইনবোর্ডও দেখতে পাচ্ছি।

স্বাতি বাস স্ট্যাণ্ডেরই একটা অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। আর অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল: চল এইবারে।

কোথায় ?

এম. এল. এ. হস্টেলেই যেতে হবে।

ঘর পাওয়া গেছে বুঝি ?

স্বাতি বলল : না।

তবে ?

যে ভদ্রলোকের নামে চিঠি, তাঁর দপ্তরও হস্টেলের কাছে একই কম্পাউণ্ডে। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে হবে।

আমি বললুম : যোগাযোগ করলে কি টেলিফোনে ?

হ্যাঁ। ডিমাপুরের স্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেছিলেন কোহিমায় নেমে তাঁদের ইয়ার্ড মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোকের নাম সিজু। নাগা বলেই মনে হল। চিঠিখানা দেখেই তিনি টেলিফোনে কথা বলে আমাদের যেতে বললেন।

তার মানে, ঘর একখানা পাওয়া যাবে বলেই মনে হচ্ছে।

তা না হলে মালপত্র নিয়ে যেতে বলতেন না।

বললুম : আমাকে না পাঠিয়ে তোমার নিজে এগিয়ে যাবার কারণটাও বুঝতে পারি।

স্বাতি কোন প্রশ্ন না করে শুধু হাসল।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে এম. এল. এ. হস্টেল খুব বেশি দূরে নয়। যে পথে আমরা এসেছি সেই পথেই খানিকটা ফিরে যাবার পরে এম. এল. এ. হস্টেলের পথ বাঁ হাতে উপরের দিকে উঠেছে। মোটর চলাচলের উপযোগী বাঁধানো পথ, কিন্তু পায়ে হেঁটে উঠতে দম ফুরিয়ে যায়। পথের ধারে কিছু কিছু ফুলের গাছ আছে, আর দূরে দূরে বড় গাছপালা। শীতার্ত বাতাস শির শির করে বইছে। বাসেই আমি একটা স্লিপওভার পরে নিয়েছিলুম, আর স্বাতি একখানা ছোট শাল গায়ে জড়িয়েছিল। একটুখানি সমতল জায়গায় পৌঁছেই আমরা হস্টেল দেখতে পেলুম। দোতলা বাড়ি, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর।

ভিতরে একটি ছোট অফিস-ঘর ছিল। তারই সামনে মালপত্র

নামিয়ে রেখে স্বাতি ঘরে ঢুকে সেই চিঠিখানা দেখাল। যে অফিসার বসে ছিলেন তিনি তাকে বাইরের একটা অফিস দেখিয়ে সেখানে যেতে বললেন।

স্বাতি একাই গেল। তার অভিসন্ধি জানি বলে আমি তার অনুসরণ করলুম না। কিছুক্ষণ পরেই সে হাসিমুখে ফিরে এল। বুঝতে পারলুম যে ঘর পাওয়া গেছে। স্বাতি বলল: দুদিনের জন্যে।

আমি বললুম: একদিন হলেও চলত।

হস্টেলের পিছনের দিকে আমরা যে ঘর পেলুম সেখানা একটু স্যাঁৎসেঁতে। বাথরুমের জানালা দিয়ে ভিতরে জল আসছে, জানালায় কাঁচ নেই। ঘরে দুখানা খাট আছে, বেয়ারা চাদর বালিশ কম্বল আনতে গেল। এই সময়ে বাইরে বেরিয়ে ব্যাপারটা আমি বুঝে নিলুম। হস্টেলের এই দিকটা পুরনো। সম্প্রতি আর তিন দিক তৈরি হয়েছে চক-মিলানো বাড়ি, মাঝখানে ব্যাডমিন্টন খেলবার জন্যে বাঁধানো কোর্ট। নতুন বাড়ির দরজা জানালা সব ঝকঝক করছে, কিন্তু সব ঘরই বন্ধ। কোন ঘরেই লোক দেখতে পেলুম না। যে ঘরে আমরা স্থান পেয়েছি, তার দেওয়াল জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে, ভিতরে বাঁশের চাটাই দেখা যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে এই বাড়ি ইটের তৈরি ছিল না। চাটাইএর উপরে প্লাস্টার করে চুনকাম করা হয়েছিল।

এই দিকেই হস্টেলের রান্নাঘর। অর্ডার দিলে খাবার পাওয়া যায়। খাবারের দাম একটা লিস্টে টাঙানো আছে। এম. এল. এ দের জন্যে সস্তা, আমাদের বেশি দাম দিতে হবে। গরম জলেরও দুরকম দাম। স্বাতি এগিয়ে গিয়ে সব দেখছিল। বলল: দুপুরে আমরা নিরামিষ খাব। সব্জির মধ্যে যদি কিছু স্পেশাল থাকে তাই দিও।

তার বাঙলা কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়েছিলুম, পরে জানলুম,

যে রাঁধছে সে বাঙালী। বলেছে, শুয়োরের মাংস রান্না হচ্ছে, মুর্গি আজ নেই। রাতের জন্যে সে মুর্গির অর্ডার দিল। আর দু পেয়ালা গরম চায়ের কথা বলে ঘরে ফিরে এল।

বেয়ারা চাদর ও বালিশের ওয়াড় পাল্টে দিল। আর কম্বল দিল দুখানা করে। শীতের দাপট আছে বলেই বোধহয় এই ব্যবস্থা।

চা খেতে খেতে স্বাতি আমাদের বেড়ানোর সময় ঠিক করে ফেলল। বলল: বেলা এখন এগারোটা বেজে গেছে। সকালের ব্রেকফাস্ট হজম হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। তাই খালি পেটে না বেরিয়ে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরেই বেরনো ভাল। পাহাড়ের রোদটা ভালই লাগবে, তাই না!

বললুম: খাবার জন্যে ফেরার তাড়া তাহলে থাকবে না।

স্বাতি বলল: বাসে তুমি কী একটা কথা বলতে চাইলে না!

কথাটা এখনি আমার মনে পড়ল না দেখে স্বাতি নিজেই বলল: আমিই তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

বলে খানিকক্ষণ ভেবে বলল: মনে পড়েছে। এখনও নাগাদের সারাক্ষণ যুদ্ধ হয় কিনা জানতে চেয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে পরে বলবে।

বললুম: হ্যাঁ, ফিজোর কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। আর বিদেশীদের তৎপরতার কথা। বাসের যাত্রীদের সামনে সে সব কথা বলতে আমি চাই নি

স্বাতি বলল: এইবারে বল।

বললুন: নাগা বিদ্রোহের ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি কথা আছে। সে সব আমাদের কাছে অবান্তর। মূল কথা হল যে স্বদেশে ফেরবার পরে ফিজো প্রচার করে বেড়াতে লাগল যে নাগাল্যাণ্ড ভারতের অংশ নয়, কোন দিন ছিল না। নাগাল্যাণ্ড ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সরল নাগারা তার কথা বিশ্বাস করে তার দলে যোগ দিয়েছিল। নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল নামে একটি সংস্থা ছিল।

ফিজো তা দখল করতে না পেরে নিজে আর একটা দল গড়ে জেলে যায় কিছু দিনের জন্যে। তারপর ১৯৪৯ সালে ছাড়া পেয়ে আবার আন্দোলন শুরু করে। দু বছর পরে নাগা জনমত সংগ্রহ করে প্রচার করে যে শতকরা নিরানব্বুই জন নাগা স্বাধীন নাগা রাজ্য চায়। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গেও দেখা করে, কিন্তু কোন সুবিধা হচ্ছে না দেখে ১৯৫৪ সাল থেকে হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। একবার বর্মার ভিতর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, কিন্তু সফল হয় ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। ফিজো পাকিস্তানে পৌঁছে বিদেশী সাহায্যের চেষ্টা শুরু করে।

বিদ্রোহীরা আত্মগোপন করে নাগাল্যাণ্ডে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। থুঙ্গটি চাং কাইতো সেমা প্রভৃতি অনেক নাম শোনা যেত। তারা শুধু সমতলের লোকদেরই ক্ষতি করত না,—দেশবাসীরও অনেক ক্ষতি করেছে। পূর্ব পাকিস্তান তখনও বাঙলা দেশ হয় নি। সেই সময়ে নানা রকমের সাহায্য পেয়েছিল নাগারা। তারা পালিয়ে দলে দলে যেত সে দেশে, নানা রকমের যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার শিখত, আর অর্থ ও নানা অস্ত্রসম্ভার নিয়ে দেশে ফিরত। এক সময় চীনারাও পাকিস্তানে তাদের গেরিলা যুদ্ধ শেখাত বলে শোনা যায়। ১৯৬২ সালে ফিজো করাচী যায় এবং সেখান থেকেই লণ্ডনে চলে যায়। এখনও সে লণ্ডনে আছে এবং স্বাধীন নাগারাজ্যের স্বপ্ন সে এখনও দেখছে।

স্বাতি বলল : বিদ্রোহীদের কী হল ?

তারা দেশেই আছে। বছর দশেক ধরে তারা এমন সব কাজ করেছে যে শান্তি রক্ষার জন্যে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে হয়েছিল। কিন্তু সব নাগাই তো বিদ্রোহী নয়, আর ফিজোর সঙ্গে একমতও নয়। লেখা পড়া জানা শিক্ষিত নাগারা দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। যে অবস্থা ছিল তার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় যে সফল হয়েছেন নিশ্চিত ভাবে।

বিদ্রোহীরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ?

তা বলতে পারব না। বিদ্রোহী নেই, এমন দেশ কি আছে !

স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল : একটু অপেক্ষা কর, রান্নাঘরে আমি একটু তাড়া দিয়ে আসি।

বলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফিরতে তার দেরি হল। আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম তার দেরি দেখে। সেখানে সে কি রান্না দেখাতে শুরু করেছে, না নতুন কোন রান্না শিখছে! কিন্তু আমি কিছু করবার আগেই সে হাসতে হাসতে ফিরে এল, বলল : ওধারের ঘরে একটি বাঙালী পরিবার আছে কিন্তু আমাদের মতো বেড়াতে আসে নি।

তবে ?

চাকরি করতে এসেছে, আসাম সরকার থেকে ডেপুটেশন।

তারাও কি এই হস্টেলে থাকে ?

স্বাতি বলল : না, সরকারী কোয়ার্টার পেলেই তারা চলে যাবে। আমরা এ দিকের ঘরে কেন এলাম তাই জানতে চাইল। নতুন ঘরও তো অনেক খালি ছিল!

বললুম : তুমি কি উত্তর দিলে ?

সত্যি কথাই বললাম : একটা ঘর যে পেয়েছি, তাতেই আমরা খুশী।

তারপরেই বলল : এখানে দেখবার জায়গাগুলোও তার কাছে জেনে নিলাম। বৃটিশ সেনার সিমেট্রি খুব কাছে। নিচে নেমে একটু-খানি এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে। আর মিউজিয়ম অন্য ধারে। শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে। হেঁটে অত দূরে যাবার মজুরি নাকি পোষাবে না।

আর কিছু দেখবার নেই ?

পাহাড়ী শহরে দেখবার আর কী আছে! খানিকটা হাঁটলেই শহর সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে যাবে। তবে রোদ পড়লে শীত করবে খুব। গরম জামা কাপড় পরে বেরোতে হবে।

তাহলে এখানে এক দিনই যথেষ্ট। কী বল!

স্বাতি বলল: কিন্তু নাগাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে এক দিন যথেষ্ট নয়। তাদের নাচ গানের কথা শুনেছি, ছবিও দেখেছি অনেক। কত রকমের পোশাক, কত বিচিত্র অলঙ্কার, জীবনযাত্রার কত বৈচিত্র্য—এ সব কিছুই দেখা সম্ভব হবে না। পথে আমরা কিছু শহুরে নাগা দেখতে পাব, তারা হয়তো আমাদেরই মতো।

বললুম: সত্যিকার নাগা দেখতে চাওয়ার বিড়ম্বনা আছে। এক দিন যারা সরল বিশ্বাসী অতিথিবৎসল হাসিখুশি মানুষ ছিল, এখন হয়তো তারা আমাদের সন্দেহের চোখে দেখবে।

কেন?

নাগা বিদ্রোহীরাই তাদের বিশ্বাস কেড়ে নিয়েছে। নতুন মানুষকে তারা নিশ্চয়ই এখন ভয়ের চোখে দেখছে। এ হল আধুনিক সভ্যতা, আমরা এই সভ্যতারই বড়াই করি।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বললুম: কী হল?

স্বাতি বলল: সেবারে হিমালয়ে গিয়ে আমরা এই রকমেরই কথা শুনেছিলাম। সেই সরল সৎ বিশ্বাসী পাহাড়ী মানুষেরা নাকি সমতল-বাসীর সংস্পর্শে এসে বদলে গেছে। সভ্যতা কি আমাদের উপরে উঠতে দিচ্ছে না, টেনে নামাচ্ছে নিচের দিকে!

আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না।

স্বাতি সামলে নিয়ে বলল: তুমি নাগাদের কথা বলছিলে।

বললুম: সে কথা তো ফুরিয়ে গেছে!

আর কিছু বলবে না?

বললুম: একটা কথা আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে।

কী?

নাগাদের আমরা সাহসী যুদ্ধপটু বলি। কিন্তু তারা কখনও সামনা-সামনি যুদ্ধ করে না। যতক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ চালাতে

পারে, ততক্ষণই তারা সাহসী। পাল্টা আক্রমণের জন্যে শত্রু তৈরি আছে দেখলে পালিয়ে আসতে তারা একটুও দ্বিধা করে না।

স্বাতি বলল : সত্যি!

বললুম : সাহেবরা তাদের চরিত্র আলোচনায় এই কথা বলেছে। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসার জন্যে নাকি তাদের ভীরু বলা হয় না, বরং শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসতে পারলে তা বীরত্বের কথা বলেই মনে করা হয়। সম্মান করে গান বাঁধা হয় সেই ঘটনা নিয়ে। সাহেবদের লেখা আর একটি ঘটনার কথা পড়ে আমার খুব খারাপ লেগেছিল।

স্বাতি নিঃশব্দে আমার দিকে তাকাল।

বললুম : একশো বছর আগের এক প্রত্যক্ষদর্শী সাহেবের লেখা। কোহিমায় তখন দুটো খেল ছিল। খেল মানে উপজাতির পাড়া। একই গ্রামের দুটো পাড়া। অন্য গ্রাম থেকে চল্লিশজন এক একটা খেলে, তারা তাদের বন্ধু স্থানীয়। হঠাৎ তারা খেলার ছলে একজন পুরুষ পাঁচজন মেয়ে ও কুড়িটি শিশুকে হত্যা করল। অন্য খেলের লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সেই বীভৎস দৃশ্য। তার পরে সাহেবকে বলল, এমন সুন্দর খেলা তারা আগে কখনও দেখে নি। ঠিক যেন কয়েকটা মুর্গি মারল এরা।

স্বাতি চোখ বন্ধ করেছিল, বলে উঠল : থাক, আর বলতে হবে না।

কিন্তু আমি থামতে পারলুম না, বললুম : এবারে একটা মজার কথা বলব।

স্বাতি চোখ খুলে বলল : বল।

বললুম : কথাটা লিখেছেন প্রকাশ সিং। একজন বিদ্রোহী রেঙ্গমা নাগা নাকি তাঁকে নাগাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছিল, অঙ্গামি হল ফুটানি, সেমা চোর পার বাহাদুর, আও মাইকি, চাকেসাঙ্গ আধা মগজ আর লোটা লেথ্রা।

স্বাতি বলল : একটা কথারও মানে বুঝলাম না।

এ নাগাদের কথা নয়। এ হল হিন্দী কথা। একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে।

বুঝিয়ে বল।

বললুম : ফুটানি মানে বোঝ, কিন্তু প্রকাশ সিং ফুটানির মানে বলেছেন ঝগড়াটে। আমি বলি, অঙ্গামিদের ফুটানি আছে। সেমারা চোর পার বাহাত্বর। আমার মনে হয় যে তারা চোর পালালে বাহাত্বর কিন্তু প্রকাশ সিং বলেছেন, চোর কিন্তু বাহাত্বর। আওরা মেয়েলি স্বভাবের, আর অর্ধেক মগজ চাখেসাংদের। লেথ্‌া শব্দটার মানে নাকি অচল, লোটারা তাই।

স্বাতি হেসে বলল : বোলো না এসব কথা, মার খেয়ে যাবে।

বললুম : এ তো আমার কথা নয়, আমি যাঁর কথা বলছি তিনি এখানে পুলিস সাহেব ছিলেন, আর বই লিখেছেন ছ-সাত বছর আগে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সেই বই ছেপে বিক্রি করছে।

## ১৭

আমাদের পাশের একটি ছোট ঘরে খাবার ব্যবস্থা আছে। একটা বড় ডাইনিং টেবল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। এই অন্ধকার ঘরে বাতি জ্বেলে আমরা দুপুরের আহার সেরে নিলুম। তারপরে বেরিয়ে পড়লুম।

স্বাতি তার নিজের হাতে বোনা একটা মোটা সোয়েটার আমাকে সযত্নে পরিয়ে দিয়েছিল। নিজেও পরেছিল একটা উলের কার্ডিগান। মধ্যাহ্নের সূর্য তখন মাথার উপরে। তবু এই গরম জামা কাপড় আমাদের ভাল লাগছিল। মাঝে মাঝে বাতাস আসছে, সেই বাতাসে শির শির করে উঠছে শরীর। স্বাতি বলল: অন্ধকার হবার আগেই আমাদের ফিরতে হবে।

বললুম: কেন, অন্ধকারে কি ভয় করবে?

স্বাতি বলল: ভয়ের চেয়ে শীত করবে বেশি।

ভয় কিসের?

ডিমাপুরে শুনে এসেছি, অন্ধকার হবার পরে কোহিমার পথে চলাফেরা নিরাপদ নয়।

কেন?

ডিমাপুরের লোকের তাই ধারণা।

বললুম: এ ভয় আমার অমূলক বলে মনে হয়।

স্বাতি বলল: হয়তো তাই, কিন্তু প্রয়োজন না থাকলে আমরা অকারণে বাইরে থাকব কেন!

সে অন্য কথা।

ইম্ফলেও আমাদের এ নিয়ম মানতে হবে। বোধহয় মিজোরামেও।

সেও কি ভয়ের জন্যে?

মণিপুরের সম্বন্ধে একটা কথা শুনেছি। সন্ধ্যে বেলায় নাকি মস্তান ছেলেরা পথে মাতলামি করে।

বললুম : এ কথাও কি বিশ্বাস করতে হবে?

স্বাতি বলল : থাক এ সব কথা। তার চেয়ে আমরা শহরটা ভাল করে দেখে নিই।

কথা বলতে বলতেই আমরা প্রধান রাজপথে নেমে এলুম। স্বাতি বলল : আমাদের সোজা যেতে হবে, মানে ডিমাপুরের দিকে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে দোকানপাট দেখতে দেখতে আমরা এগোলুম। এক জায়গায় একদল ভুটিয়া মেয়ে পুরুষ দেখতে পেলুম পথের ডান ধারে একটা উঁচু জায়গায়। রঙবেরঙের উলের জিনিস নিয়ে বেচতে বসেছে। এদের আমরা আজকাল প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাই। কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ধর্মতলা স্ট্রীটের ফুটপাথেও বসতে দেখি। ভারতের অনেক শহরেই এদের দেখেছি। এক রকমের খসখসে উলের সোয়েটার এরা খুব সস্তায় বিক্রি করে। হাতে বোনার মতো, কিন্তু সত্যিই হাতে বোনা কিনা জানি না। এদের জিনিস দেখতে হলে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরের উঁচু জায়গায় উঠতে হবে। আমরা সোজা এগিয়ে গেলুম।

ওয়ার সিমেট্রি জায়গাটা এমন যে কাউকে চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। একটা তেমাথায় পৌঁছেই থমকে দাঁড়ালুম। অনেকটা উঁচুতে সেই সমাধি-প্রস্তরটি দেখা যাচ্ছে। ছবিতে আমরা দেখেছিলুম। একটা বেদীর উপরে বিরাট উঁচু একখণ্ড পাথর, তার উপরের দিকে একটি ক্রশ চিহ্ন, আর মাঝখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা—

When you go home
Tell them of us and say
For your tomorrow
We gave our today.

কিন্তু এই দিক থেকে উপরে উঠবার কোন পথ নেই। আর ভিতরে আরও কিছু দ্রষ্টব্য আছে কিনা, তাও আমরা জানি না। তাই স্বাতি এক পথচারীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করল।

ইংরেজীতে প্রশ্ন, ভদ্রলোক উত্তরও দিলেন ইংরেজীতে। বললেন: এই পথেই এগিয়ে যান খানিকটা, তারপরেই পথের ডান ধারে বড় গেট দেখতে পাবেন। ভিতরে নিশ্চয়ই যাবেন। সুন্দর বাগান আছে ধাপে ধাপে, আর সারি সারি সমাধি। ওপর থেকে কোহিমা শহরটাও দেখতে পাবেন।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা এগিয়ে চললুম। অল্প একটুখানি চলবার পরেই প্রশস্ত গেট দেখতে পাওয়া গেল। পথ উপরের দিকে উঠে গেছে। মোটর চলাচল করতে পারে এই রকম ব্যবস্থা। আমরা ধীরে ধীরে হেঁটেই উপরে উঠে গেলুম। সারি সারি কবর, আর তারই সঙ্গে সারি সারি ফুলের গাছ। অজস্র গোলাপ ফুটে আছে, তারই মাঝে মাঝে মরসুমি ফুল। এই টিলার উপরেই ছিল ডেপুটি কমিশনারের বাংলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানীরা এই পর্যন্তই এসেছিল, আর ইংরেজের রয়াল ওয়েস্ট কেণ্ট বাহিনী তাদের বাধা দিয়েছিল এইখানে। এক জায়গায় উৎকীর্ণ আছে—Here around the tennis court of the Deputy Commissioner lie men who faught in the battle of Kohima in which they and their comrades finally halted the invasion of India by the forces of Japan in April, 1944.

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে ইংরেজ বহু যত্নে ও বহু অর্থব্যয়ে মৃত ইংরেজ সৈনিকদের এই সমাধি নির্মাণ করে গেছে। প্রত্যেক সৈনিকের নাম ধাম বয়স ও মৃত্যুর তারিখ একটি করে ধাতুর ফলকের উপরে উৎকীর্ণ আছে। আর সমগ্র এলাকাটি প্রচুর যত্নসহকারে এখনও সংরক্ষিত হচ্ছে।

ঘুরে ঘুরে সব দেখবার পরে আমরা একটি পছন্দ মতো জায়গায় এসে বসলুম। বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রোদ এসে ছড়িয়ে পড়ছে, আবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে খানিকক্ষণের জন্য। আকাশের ঘন মেঘ লুকোচুরি খেলছে সূর্যের সঙ্গে। পাহাড়ের গায়ে কোহিমা শহরের অনেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম। শহরের ছবি তোলবার চেষ্টা করে স্বাতি বার্থ হয়েছে কয়েকবার। রৌদ্র তার সঙ্গে রসিকতা করেছে। শেষ পর্যন্ত আমাকে বলেছে তাকে সাহায্য করবার জন্যে। সূর্য এবারে দেখা দিলে আমাকে সে দিকে চেয়ে থাকতে হবে, আর সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হলে বলতে হবে তাকে। কিংবা আবার ঢেকে যাবার আগেই নোটিশ দিতে হবে।

বসে বসেই স্বাতি বলল: এই সমাধিক্ষেত্রে একটিও ভারতীয় সৈনিকের নাম নেই।

বললুম: তার চেয়েও দুঃখের কথা এই যে দেশ স্বাধীন হবার পরেও ইতিহাস এখানে বিকৃত অবস্থায় আছে।

কী রকম?

জাপানীরা তো কোহিমা আক্রমণ করে নি!

তবে?

নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রচণ্ড যুদ্ধ করে এই শহরের কিছু অংশ অধিকার করেছিল। অসংখ্য ইংরেজ সেনা মারা পড়েছিল এই যুদ্ধে। এখানে তাদেরই কবর। কিন্তু ইংরেজ সত্য কথা স্বীকার করে নি, বলে নি যে নেতাজীর ফৌজ মণিপুরের পথে ভারত জয়ে এসেছিল কোহিমা পর্যন্ত। জাপানীরা সহায় ছিল নেতাজীর, কিন্তু জাপানীরা এ দেশে প্রবেশ করে নি।

স্বাতি সবিস্ময়ে বলল: এত দূর এগিয়ে নেতাজী থেমে গিয়েছিলেন কেন?

থামতে বোধহয় বাধ্য হয়েছিলেন। জাপানে অ্যাটম বোমা ফেলেছিল অ্যামেরিকা। সেই ধ্বংসস্তূপ দেখে জাপানীরা হার স্বীকার

করেছিল। এ দিকের যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার আগেই নেতাজী মণিপুর রাজ্যে এসে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়িয়েছিলেন। পতাকা উড়িয়েছিলেন আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে। তারা এই স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করছে, কিন্তু কোহিমায় আমরা নেতাজীর নাম শুনি না।
স্বাতী বলল: তুমি তো বলেছিলে ফিজোও নেতাজীর সেনাদলে ছিল?

বললুম: শুধু এইটুকুই জানি। দলে থেকে দেশোদ্ধারের কী করেছিল তা জানি না। এ সব কথা পুরোপুরি জানবার সুযোগ এখনও পাই নি।

স্বাতি বলল: মণিপুরে আমরা খোঁজ নেব। তোমার পরিচিত প্রফেসর—

আছৌবি সিং!

হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।

বললুম: বলতে পারবেন কিনা জানি না।

কেন পারবেন না?

নেতাজীর দুর্ভাগ্য যে তিনি বাঙালী ছিলেন। বাঙালীর অবদান স্বীকার করতে ভারতবাসী এখনও রাজী নয়। নেতাজীও এই বাঙালী বিদ্বেষ থেকে অব্যাহতি পান নি।

স্বাতি কোন কথা বলল না, কিন্তু আমি বললুম: বাঙালী চিরকাল একটা দুর্বলতায় ভুগছে। মনে-প্রাণে বাঙালী হয়েও তারা চিরকাল ভারতীয় বলে স্বীকৃতি চেয়েছে, দেখাতে চেয়েছে যে তারা প্রাদেশিক নয়। এ দোষ বাঙালীর আজও যায় নি। আজও তারা বাঙলার জন্যে দরদ গোপন করে ভারতীয় সম্মান লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত। চিৎকার করে কেউ বলতে চান না, আমি বাঙালী, বাঙলার দুঃখ দূর করবার জন্যে প্রাণ দিতে আমি প্রস্তুত।

স্বাতি হেসে বলল: এ তোমার অভিমানের কথা।

শুধু আমার নয়, এ অভিমান সমস্ত বাঙলার, সমস্ত বাঙালীর।

নেতাজী বাঙালী না হলে এই কোহিমায় তাঁর স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা হত।

অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল মেঘ কেটে যাচ্ছে, আবার রোদ উঠবে। স্বাতি সচকিত হয়ে উঠল। আমারও মনের মেঘ হাল্কা হল খানিকটা।

সামনে খানিকটা ঝকঝকে রোদ ছড়িয়ে পড়তেই স্বাতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল: এইবারে একটু সূর্যের দিকে নজর দাও।

বলে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে তার ক্যামেরা খুলল। আর আমি খানিকটা সরে গিয়ে পিছনের দিকে তাকালুম। একখণ্ড ঘন কালো মেঘ সূর্যকে এতক্ষণ ঢেকে রেখেছিল। পাশ থেকে আর এক পুঞ্জ মেঘ এসে তাকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এ মেঘ তত ভারি নয়। তাই সূর্যকে পুরোপুরি ঢাকতে পারছে না। বুঝতে পারছিলুম যে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সূর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তাই স্বাতিকে বললুম: রেডি হও। ওয়ান—টু—থ্রি।

দূর থেকে স্বাতি বলল: থ্যাঙ্ক ইউ।

ক্যামেরা বন্ধ করে স্বাতি ফিরে এল। বলল: এখানে আর ভাল লাগছে না।

বললুম: সত্যিই ভাল লাগবার কথা নয়। এ যদি আজাদ হিন্দ ফৌজের সমাধিক্ষেত্র হত, তাহলে একটা তীর্থ মনে হত এই জায়গা। গর্বে বুক ভরে উঠত।

তবু—

বলে স্বাতি থেমে গেল।

আমি বললুম: কী বলতে চাও, বুঝি। তবু আমাদের জওয়ানদের কথা মনে পড়ছে, তাদের সাহসের কথা, বীরত্বের কথা, আত্মত্যাগের কথা। দেশ স্বাধীন করার বুকভরা আশা নিয়ে তারা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছিল, জাপানীরা হেরে না গেলে আরও এগিয়ে যেত, ভারতের এই পূর্বাঞ্চলকে তারা স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে পারত।

কিন্তু যারা প্রাণ দিয়েছিল এই যুদ্ধে, তাদের আমরা ভুলে গেছি। ইংরেজের মতো তাদের আমরা অমর করে রাখতে পারি নি। সেই চেষ্টা কেউ করেছিল কিনা, তাও আমাদের জানা নেই।

বললুম: স্বাধীনতার জন্যে আমাদের প্রথম যুদ্ধকে ইংরেজ সিপাহী বিদ্রোহ বলেছে। নেতাজীর অভিযানকে তারা জাপানী অভিযান বলেছে।

কিন্তু এর প্রতিবাদ কেউ করে নি?

বোধহয় না। যে দুখানা বই আমি পড়েছি, তাতে নেতাজীর নামেরই উল্লেখ নেই। একখানা ১৯৭০ সালে লেখা, আর একখানা ১৯৭২ সালে। নরি রুস্তমজী আর প্রকাশ সিং দুজনেই এ বিষয়ে নির্বাক।

একটু থেমে বললুম: কিন্তু প্রকাশ সিং ফিজোর মেয়ের কথা লিখেছেন যত্ন করে। মেয়ের নাম টুটু। ভালো নাম রথিভোনৌ ফিজো। ভারতীয় সেনা বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনের প্রেমে পড়েছে শুনে ফিজো খুব রেগে গিয়েছিল, ঘোরতর আপত্তি করেছিল বিয়েতে, ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু টুটু নির্ভয়ে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছিল দেখে তার দলের লোকেরা তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে এক বছরেরও বেশি লুকিয়ে রাখে। কিন্তু ছাড়া পেয়েই টুটু সবার চোখে ধুলো দিয়ে পাঞ্জাবে পালিয়ে যায়, আর হিন্দু হয়ে বিয়ে করে তার প্রেমিককে।

স্বাতি বলল: এ কত দিন আগের ঘটনা?

ঠিক দশ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। টুটুর নাম এখন রাধিকা।

ধীরে ধীরে উপর থেকে নেমে এসে আমরা ফেরার পথ ধরলুম। সেই পুরনো পথ। এই পথে এগিয়ে গেলেই আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে যাব। দুধারের ঘর বাড়ি দোকান পাট দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললুম।

স্বাতি এক সময়ে বলল : ইভার কথা ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। তার খবরটা সংগ্রহ করতে হবে।

কিন্তু তার সঙ্গে কি আমাদের আবার দেখা হবে!

হয়তো হবে না। কিন্তু তোমার কোন কৌতূহল হচ্ছে না কি!

বললুম : কৌতূহল হবার কারণ আছে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে বলল : কেন বল তো!

বিদ্রোহী নাগাদের পিঠে কোন ছাপ নেই, তারা তো পথে ঘাটে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা পুলিসের নজরে আছে, তারাই শুধু আত্মগোপন করে আছে। ইভার স্বামীর ভয় কী! সে তো নিজে নাগাও নয়, বিদ্রোহীও নয়। সে কি নিজেকে মুক্ত করে ফিরে আসতে পারছে না! না, সে নিজের ইচ্ছাতেই জড়িয়ে পড়েছে!

স্বাতি বলল : তার সঙ্গে দেখা না হলে এ সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু দেখা পাওয়া যাবে কি!

এই পথের ধারেই দু-এক জায়গায় আমরা অনুসন্ধান করলুম। কিন্তু কোন খোঁজ পেলুম না। বাস স্ট্যাণ্ডে এসেও আমরা খোঁজ করলুম, কিন্তু সেখানেও কোন খবর পাওয়া গেল না। যে ভদ্রলোকের খোঁজ আমরা করছি, তাঁকে কেউ চেনে না। আমি জানতুম যে ডাক-পিওনের সঙ্গে দেখা হলে খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু তাকে কোথায় পাব! ডাকঘরে গিয়ে কোন লাভ নেই।

এইবারে স্বাতি একটা অন্য ভাবনার কথা বলল। ইম্ফলের বাস কোহিমা থেকে ছাড়ে না। যে বাসটা ডিমাপুর থেকে আসে, সেই বাসই যায়। কোহিমার যাত্রী থাকলে এখানে নেমে যায়। কিন্তু আজ সকালে আমরা ছাড়া আর কেউ এখানে নামে নি। কালও যদি কেউ না নামে তো আমরা বাসে জায়গা পাব না।

স্বাতি বলল : আমাদের কথা ভুলে গিয়ে থাকলেই বিপদ। কোহিমায় পড়ে থাকতে হবে।

বললুম : পরের দিনও পড়ে থাকতে হতে পারে, কিংবা অনির্দিষ্টকাল।

স্বাতি বলল : না, তা করলে চলবে না।

তবে কী করবে?

ডিমাপুরে ফিরে গিয়ে পরদিন সকালের বাস ধরব। আর অন্যকে বলব, মণিপুর দেখে ফেরার সময় কোহিমায় নামতে।

তাকে ভরসা দিয়ে বললুম : ভাবছ কেন, ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে।

আমরা পথের অন্য ধারে এম্পোরিয়ামে গিয়ে ঢুকলুম। এ একটি দোকান, নাগাল্যাণ্ডের কুটির শিল্পের নমুনা এখানে অনেক রকমের আছে। একজন লোক আছে দেখাবার জন্যে, কিন্তু ক্রেতা একজনও নেই। দু-একটা জিনিসের দাম আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু তা সস্তা নয়, আর এমন কিছু লোভনীয়ও নয়। পথে নাগা ছেলেমেয়েদের গায়ে যে টকটকে লাল রঙের শাল দেখেছি, তা অনেক সুন্দর। এই গরম কাপড়ের শালের দামও অনেক। সুতোর শাল সস্তা, অনেকে তাই গায়ে দিচ্ছে।

বাজারের মধ্য দিয়ে আমরা আরও অনেক দূরে এগিয়ে গেলুম। একটা মোড়ের কাছে এসে দেখলুম একটা বাঙালীর দোকান। বেশ বড় দোকান, তাতে সব রকমেরই জিনিস পাওয়া যায়। সেখান থেকে কোন্ পথ ধরব বুঝতে না পেরে আমরা খানিকক্ষণ ইতস্তত ঘুরে বেড়ালুম।

একটা ব্যাপার দেখে আমাদের ভাল লাগল। নাগা ছেলে-মেয়েদের বেশ হাসিখুশি ভাব। তাদের দিকে তাকালে একটু হাসে। কথা বললে উত্তর দেয় দাঁড়িয়ে, সাহায্য করতে চেষ্টা করে। তাই স্বাতি আবার ইভার কথা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল।

একজন বয়স্ক ব্যক্তি খুব মনোযোগ দিয়ে নামটা পড়লেন, তারপর বললেন : এ নাম তো কোন নাগার নয়, বোধহয় মিজো নাম। আপনারা এক কাজ করবেন ?

বলুন।

ঐদিকে মিজোদের একটা দোকান আছে, সেখানে একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

বলে আঙুল দিয়ে সেই দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলুম। সেই দোকানে যাঁর দেখা পেলুম, তিনি বললেন : তাঁকে কী দরকার আপনাদের ?

বললুম : তাঁর কাছে আমাদের এক বন্ধুর খবর নেব।

আপনাদের বন্ধু !

হ্যাঁ, তিনি চেনেন তাঁকে।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন : আপনারা যাঁকে খুঁজছেন, তিনি তো এখানে থাকেন না। তাঁর বাড়ি আইজলে, মাঝে মাঝে এখানে আসেন কাজে। এর পর কবে আসবেন তার ঠিক নেই।

স্বাতি বলল : খুব ভাল কথা। আমরা কাল ইম্ফলে যাচ্ছি। সেখান থেকে আইজলেও যাব বেড়াতে। তাঁর ঠিকানাটা দিতে পারেন ?

ভদ্রলোক বললেন : বাড়ির ঠিকানা তো জানি নে, তিনি যে অফিসে কাজ করেন তাই লিখে দিচ্ছি।

বলে আমাদের কাগজখানার পিছনেই একটা অফিসের নাম লিখে দিলেন।

ভদ্রলোককে নমস্কার করে আমরা ফেরার পথ ধরলুম।

খানিকটা এগোবার পরে স্বাতি বলল : রহস্যটা ঘন হয়ে উঠছে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম : তাই দেখছি।

হেরে গেলে আমাদের চলবে না।

আমি হেসে বললুম: গোয়েন্দারা কিছুতেই হার মানতে চায় না।

আমরা কি গোয়েন্দা?

গোয়েন্দা না হয়েও সেই কাজে হাত দিয়েছি।

আকাশের রৌদ্রে তখন আর তেজ নেই, বাতাস আরও শীতার্ত হয়েছে। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে আমরা একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লুম।

## ১৮

চায়ের টেবিলে এক নাগা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। ভদ্রলোক খাঁটি বিলেতি পোশাক পরেছেন, কিন্তু গলার টাই দেখেই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। এ রকমের টাই আমরা দোকানে দেখেছিলুম। নাগা মেয়েরা ঘরে বসে এই রকমের টাই তৈরি করে। স্বাতি চোখের ইশারায় যা বলল, তার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম।—এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে নাগাদের সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যাবে। আমি তাই এক মুহূর্তও বিলম্ব করি নি। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁরই টেবিলে গিয়ে বসলুম।

ভদ্রলোকের মুখখানি ভারি প্রসন্ন, কিন্তু অন্যমনস্ক ছিলেন। তাই একটু চমকে উঠেছিলেন। পরে আমাদের দেখে সামলে নিয়ে বললেন: টুরিস্ট ?

বললুম: হ্যাঁ।

কদিন থাকবেন এখানে ?

কাল সকাল পর্যন্ত আছি।

সব দেখা হয়ে গেছে ?

বললুম: কিছু দেখবার সুযোগ তো পেলুম না।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন: কেন ?

আমরা বাসে এসেছি। আর এখানে নেমে দেখছি যে শহরে বেড়াবার জন্যে কোন যানবাহন পাওয়া যায় না।

ভদ্রলোক ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন: ঠিক কথা। আমিও বাসে এসেছি, বাসেই ফিরে যাব।

স্বাতি বলল : কিন্তু শহরে জীপ আর মোটর গাড়ির কোন অভাব দেখছি না।

সে সব সরকারী, কিছু বেসরকারীও আছে। কিন্তু আপনারা কিছু সংগ্রহ করতে পারবেন না। একটা টুরিস্ট বাংলো নাকি তৈরি হচ্ছে, শিগগিরই খোলা হবে। সেখানে সরকারী ব্যবস্থায় যদি কোন টুরিস্ট রাখা হয়, তবেই আপনাদের সুবিধে হবে।

স্বাতি বলল : আমাদের অনেক কিছু জানার কৌতূহল ছিল, কিন্তু কিছুই জানা হল না।

ভদ্রলোক যেন খানিকটা লজ্জিত বোধ করলেন, বললেন : আমি আপনাদের কোন কৌতূহল মেটাতে পারব কি ?

আমি বললুম : নিশ্চয়ই পারবেন।

কী জানতে চান বলুন।

আমি স্বাতির মুখের দিকে তাকাতেই স্বাতি বলল : ভাষা সাহিত্য —নাচ গান—

বুঝেছি।

একটু থেমে বললেন : আমি এই রাজ্যেরই মানুষ, নাম টোশি। কিন্তু লজ্জা হয় এই জন্যে যে এ রাজ্যের অনেক কথাই আমি জানি নে। জানা সম্ভব নয়। কিছু দিন আগেও এ রাজ্যে ভাল পথঘাট ছিল না, এক এলাকার সঙ্গে আর এক এলাকার যোগাযোগ দুঃসাধ্য ছিল। পরস্পরকে আমরা চিনতাম না।

টোশির চা শেষ হয়ে গিয়েছিল, আমাদের চা আসতেই স্বাতি আর এক পেয়ালা চা তাঁকে ঢেলে দিল। ভদ্রলোক সেই চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন : আমি কোন দলেই নেই, রাজনীতিতেও বিশ্বাস করি না। আমি লেখাপড়া শিখেছি শিলঙে, বিলেতেও কিছু দিন কাটিয়ে এসেছি। আমি যা বলব, তা আমার ব্যক্তিগত মত। কারও সঙ্গে না মিললে আমাকে দোষ দেবেন না।

বললুম : পরের মত নিজের বলে চালানোর চেয়ে নিজের মত থাকাই তো ভাল।

টোশি বললেন : ফিজোর মন্দ কাজের সমালোচনা আমি করব না। সে একটি কাজ নিঃসন্দেহে ভালো করেছে—এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নাগাদের মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ এনেছে। আগে আমরা অঙ্গামি সেমা রেঙ্গমা আও ছিলাম, এখন হয়েছি নাগা। তুয়েনসাং মোকক্‌চুং কোহিমা আমাদের দেশ নয়। আমাদের দেশ নাগাল্যাণ্ড। জনসাধারণ এ কথা বুঝতে শিখেছে ফিজোর প্রচারের গুণে। এই কৃতিত্বটুকু আমি তাকে চিরকাল দেব। বিদেশী মিশনারীদেরও আমি শ্রদ্ধা করি।

কেন ?

যে স্বার্থেই হোক, তারা আমাদের অনেক উপকার করেছে। অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অনেক অধ্যবসায়ে একটু একটু করে তারা আধুনিক সভ্যতার আলো এ দেশে এনেছে। অন্তত আমাদের দেশের বাইরে যে একটা বিরাট বিশ্ব আছে, তাদের চেষ্টাতেই সেকথা আমরা বুঝতে শিখেছিলাম। তারপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেও আমরা ঋণী।

এবারে আমি আর কোন প্রশ্ন করলুম না। টোশি নিজেই বললেন : স্বাধীনতার নামে অন্তর্ঘাতে বিবাদে রক্তপাতে আমরা যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছি, তখন এ রাজ্যের শান্তি স্থাপনে ভারতীয় সেনাবাহিনী অসাধ্য সাধন করেছে। আজ এই রাজ্য উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু নিজেদের স্বার্থপরতার জন্যেই আমাদের অগ্রগতি বারে বারে ব্যাহত হচ্ছে।

কিসের স্বার্থপরতা ?

দু রকমের। কিছু লোক দেশের জন্যে না ভেবে শুধু নিজের লাভের কথাই ভাবছেন। জল ঘোলা করে মাছ ধরছেন তাঁরা। আর

দ্বিতীয় হল পুরনো গোষ্ঠীদের মধ্যে রেষারেষি। কাঁকড়ার মতো সবাই সবাইকে টেনে রাখতে চাইছে।

বললুম: এ তো সব দেশেই আছে। এই ভাবেই দেশকে এগোতে হয়।

টোশি এবারে স্বাতির দিকে চেয়ে বললেন: আপনি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের কথা জানতে চেয়েছিলেন না?

মাথা দুলিয়ে স্বাতি বলল: হ্যাঁ।

বলতে লজ্জা করে আমাদের নিজস্ব কোন ভাষা নেই।

সে কি!

এই ছোট্ট রাজ্যে কম করেও গোটা তিরিশেক ভাষা ও উপভাষা আছে। আর আশ্চর্যের বিষয় যে এক গোষ্ঠীর ভাষা আর এক গোষ্ঠী বোঝে না। আর এই সব ভাষা লেখবার জন্যে আমাদের কোন বর্ণমালাও নেই। মিশনারীরা আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে শিখিয়ে গেছে।

তবে আপনারা কাজ চালান কী করে?

সেকথা ভাবলেই আশ্চর্য হতে হয়। আমরা যারা লেখাপড়া শিখেছি, তারা ইংরেজী জানি। হিন্দীও জানি। যাদের আমরা আণ্ডার-গ্রাউণ্ড বা বিদ্রোহী বলি, তাদের মধ্যে হিন্দীর প্রচলনই বেশি। তার একটা কারণ অনুমান করা যায়। এদের মধ্যে আসাম রেজিমেণ্টের নাকি অনেক লোক আছে। সত্য মিথ্যা জানি না। তবে সম্প্রতি একটা বর্ণসঙ্কর ভাষা দ্রুত প্রসার লাভ করছে। তার নাম নাগামিজ। নাগা শব্দের সংমিশ্রণে অসমীয়া ভাষার একটা রূপান্তর। কিন্তু এর কোন বর্ণমালা না থাকায় এটা লিখিত ভাষা হবার সুযোগ পাচ্ছে না।

বললুম: ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার তো।

টোশি বললেন: এত দিন এ রাজ্যের অঞ্চলগুলো বিচ্ছিন্ন ছিল বলে আমরা কোন সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি নি। বড় গোষ্ঠীগুলির কিছু কিছু শব্দ বুঝতে পারতাম বলে কাজ চালিয়ে

নিতে অসুবিধা হত না। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন : বোধহয় জানেন যে পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব ভাষাই টিবেটো-বর্মান ফ্যামিলির। যে কোন একটা শব্দ নিন, তাহলেই দেখতে পাবেন যে শব্দটা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। জল শব্দটাই নিতে পারেন। অঙ্গামীরা বলে জু dzu, আজু azu বলে সেমারা, আর আওরা বলে জু tzu.

টোশির উচ্চারণে dzu ও tzu-এর প্রভেদ আমি ধরতে পারলুম না। ডিমাপুরে একজনের কাছে শুনেছিলুম কোহিমার পথে জুজা Dzuza নদীতে হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে। সে নাকি বিরাট ব্যাপার। কিন্তু আর একজন এই নদীকে জুজা না বলে জিজা বলেছিলেন। কিন্তু এই উচ্চারণ নিয়ে আমি তাঁকে কোন প্রশ্ন করলুম না।

টোশি নিজেই বললেন : আর এই জলকে সেমারা কী বলে জানেন ? বলে ওচু। শুনেছি ভুটানে নাকি শুধু চু বলে, চু মানে নদী।

তারপরেই বললেন : এ নিয়ে কচকচি আপনাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগছে না। তার চেয়ে আমাদের মধ্যে প্রচলিত একটা লোককথা আপনাদের বলি।

স্বাতি আগ্রহ দেখিয়ে বলল : বলুন।

টোশি বললেন : সমস্ত গোষ্ঠীর নাগারা একবার ঠিক করল যে সবাই মিলে একটা খুব উঁচু টাওয়ার তৈরি করে আকাশটা ছোঁবে। একথা ঠিক করেই তারা টাওয়ার তৈরির কাজে লেগে গেল। তাদের কাজ দেখে ভগবান ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন এদের সব গোষ্ঠীর ভাষা আলাদা আলাদা করে দেওয়া যাক, তাহলে এরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে না পেরে সম্মিলিত ভাবে এ কাজ করতে পারবে না। ভগবান তাই করলেন, আর ফলও পেলেন। পরস্পরের ভাষা

বুঝতে না পেরে কাজের গোলমাল হয়ে গেল। টাওয়ার তৈরি হল না। আকাশেও আর পৌঁছনো গেল না।

স্বাতি হেসে বলল : ভারি সুন্দর গল্প তো!

টোশি বললেন : এই রকমের গল্প অনেক আছে। শিশুদের উপযোগী গল্প। কিন্তু সে সব গল্প বলে আপনাদের সময় নষ্ট করব না।

স্বাতি বলল : তাহলে আপনি নাচ গানের কথা কিছু বলুন।

টোশি বললেন : নাগাদের নানা রকম নাচের ছবি বোধহয় দেখেছেন ?

দেখেছি।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন কি ?

কী বলুন ?

সবই পুরুষদের নাচ নয় ? মেয়েদের নাচের ছবি দেখেছেন ?

আমি যে কখানা ছবি দেখেছি, তা মনে করবার চেষ্টা করলুম। টোশির কথা ঠিকই মনে হল। সবই পুরুষের ছবি, নানা সাজসজ্জায় সজ্জিত পুরুষ, কখনও খালি হাতে, কখনও বর্শা বা ঢাল হাতে। এই সব নাচের ছবিতে একটিও মেয়ে দেখেছি বলে মনে হল না।

আমাদের নিরুত্তর দেখে টোশি বললেন : না, দেখেন নি। নাগাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হল জেলিয়াং। শুধু এই জাতের মেয়েরাই পুরুষদের সঙ্গে নাচে যোগ দেয়। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার। সেটা হল, একক নৃত্যের প্রচলন নাগাদের মধ্যে নেই। নাচ মানেই একটা জাতের অনেকগুলি পুরুষ কোন খোলা জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে নাচবে। আসরে নেমে আস্তে আস্তে নাচ শুরু হবে, তারপর তালে তালে নাচের গতি বাড়বে, নাচ থামবে গতি সব চেয়ে বাড়বার পরে। নাচের সঙ্গে যে শব্দ শুনবেন তাকে গান বলা যায় না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : আপনাদের মধ্যে গানের প্রচলন নেই ?

নেই তা বলব না, তবে নাচের সঙ্গে গানের প্রচলন দেখি নি।

আমরা তখন চা শেষ করে পথে নেমে পড়েছিলুম। সূর্য অস্ত গেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু পথের উপরে ছায়া নেমেছে। আরও বেশি শীতবোধ হচ্ছে। টোশি আমাদের সঙ্গেই এগোচ্ছিলেন। হঠাৎ স্বাতি বলল: আপনি গান জানেন?

টোশি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল: হঠাৎ এ কথা জানতে চাইছেন কেন?

স্বাতি বলল: এখানে তো নাচ দেখা সম্ভব হল না, একটা গান শুনতে ভারি ইচ্ছা হচ্ছে।

টোশি হেসে বলল: আপনাকে নিরাশ হতে হবে।

কেন?

গান আমি জানি নে। তবে যদি বলেন তো গানের কথা শোনাতে পারি।

তাই বলুন।

টোশি বললেন: কোলিয়াকদের মোরাঙে মেয়েরা আসে আর ছেলেরা তাদের বান্ধবীদের কোমর জড়িয়ে ধরে গায়—

ওগো আমাদের অন্য মোরাঙের মেয়ে বন্ধুরা,
তোমাদের মায়ের হাতে আছে অনেক ধনরত্ন.
আর তোমাদের স্বামীদের হাতে সামান্য,
কিংবা কিছুই না।
দু তিনটে সন্তান হলেই তোমাদের রূপ যাবে ফুরিয়ে।
তাই ভালবাসো তোমাদের বন্ধুদের,
তোমাদের যৌবনের এই বন্ধুদের।

মেয়েরা এর উত্তর দেবে—

যখন তোমরা আমার সঙ্গে আছো,
তখন তোমাদের চোখে শুধু জল।
যখন তোমরা থাক তোমাদের স্ত্রীর সঙ্গে,

তখন তোমরা হাসো।

তোমাদের স্ত্রীদের ছেড়ে কেন তোমরা আসো আমার কাছে?

তাদেরই তো তোমরা বেশি ভালবাসো,

তোমাদের যৌবনের বন্ধুদের চেয়ে বেশি।

টোশি থামতেই আমি বললুম: ভারি সুন্দর।

নিঃশব্দে খানিকটা পথ চলবার পরে টোশি বলল: এখানে আপনারা কোথায় উঠেছেন?

বললুম: এম. এল. এ. হস্টেলে।

টোশি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন: আপনাদের অনেক সময় আমি নষ্ট করেছি, এবারে বিদায় দিন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: আসবেন না আমাদের সঙ্গে?

টোশি সবিনয়ে বললেন: আমার কিছু কাজ আছে।

বলে নমস্কার করে পিছনে ফিরলেন।

আরও খানিকটা এগোবার পরে স্বাতি বলল: এম. এল. এ. হস্টেলের কথা শুনেই ভদ্রলোক থেমে পড়লেন কেন বুঝতে পারছি নে।

আমি বললুম: বললেন তো কাজ আছে।

তবে আগেই বিদায় নেন নি কেন?

ভেবেছিলেন কিছু পথ এগিয়ে দেবেন।

কিন্তু স্বাতি বলল: এ কথা মেনে নিতে আমার মন চাইছে না। মনে হল, সরকারী কোন সংস্থার মধ্যে ভদ্রলোক যেতে চান না।

তবে কি তুমি—

হ্যাঁ, ভদ্রলোককে বিদ্রোহী নাগা বলেই আমার সন্দেহ হচ্ছে।

এমন শিক্ষিত সদালাপী মার্জিত রুচির ভদ্রলোক—

স্বাতি বাধা দিয়ে বলল: বিদ্রোহী মানে তো বন্য নয়।

স্বাতির কথার প্রতিবাদ করবার মতো আমি কোন যুক্তি খুঁজে পেলুম না। নিঃশব্দে আমরা ফিরে এলুম।

## ১৯

ডিমাপুর থেকে ইম্ফলের বাস কোহিমার বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছবে সকাল দশটা নাগাদ। কিন্তু স্বাতি বলল: না, আমরা সাড়ে নটার মধ্যেই বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছতে চাই।

আমি কিছু আশ্চর্য হয়ে বললুম: কেন বল তো!

স্বাতি বলল: ইয়ার্ড মাস্টারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনিও আমাকে দশটা নাগাদ তাঁর কাছে পৌঁছতে বলেছেন।

তবে!

ইম্ফলের আরও যাত্রী থাকতে পারে, বুকিং অফিসে লাইন দিতে হতে পারে, বলা যায় না তো, বাস এক দিন আগেই এসে পড়তে পারে—

হেসে বললুম: অনেক কিছু হতে পারে।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল: ঘরের ভেতর বসে থেকেই বা করবে কী! তার চেয়ে বাইরে বেরোলে অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যাবে।

এইটেই খাঁটি কথা। দেশ দেখতে বেরিয়ে ঘরে বসে থাকতে মন চায় না, বাইরের বিশ্ব আমাদের টানে। সেই টানেই আমরা সকাল সকাল তৈরি হয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম। হস্টেলেরই একজন কর্মী আমাদের মালপত্র বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দিল।

স্বাতি ইয়ার্ড মাস্টার মিস্টার সিজুর সঙ্গে দেখা করে এসে বলল: ভদ্রলোক আমাদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলছেন, কিন্তু—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললুম: কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে।

কেন বল তো?

ডিমাপুরের স্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট যে আমাদের কথা মনে রেখে দুজন কোহিমার যাত্রীকে ইম্ফলের বাসে বসিয়ে দিয়েছেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

স্বাতি বলল: হয়তো ভুলেই গেছেন আমাদের কথা।

বিচিত্র নয়।

আর মণিপুর স্টেটের বাসগুলো এই বাস স্ট্যাণ্ডে আসে না, কোহিমার যাত্রীও বোধহয় নেয় না। সরাসরি চলে যায় এই শহরটাকে পাশ কাটিয়ে।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম: তাহলে এখন আমাদের কী করা উচিত?

স্বাতি বলল: এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না।

বললুম: তুমি দাঁড়াও। আমি একটু খোঁজ খবর নিই।

কিসের খোঁজ খবর?

কোহিমা থেকে ইম্ফলে যাবার আর কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। এই ধর জীপ বা ট্যাক্সি, ভাড়া কত, শেয়ারে যায় কিনা। নানা রকম প্রয়োজনেও তো লোকে ইম্ফলে যায়, কিংবা ফেরে। সব সময়েই কি তারা এই অনিশ্চিত বাসের জন্যে অপেক্ষা করে!

স্বাতি বলল: ঠিক বলেছ। হাতে যখন সময় আছে, তখন খবর নিলে লোকসান হবে না।

একটুখানি এগিয়েই দেখতে পেলুম যে বুকিং অফিসের সামনে এক বাঙালী ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। তিনিও ইম্ফলে যাবেন। ইম্ফল থেকে শিলচরে যাবেন প্লেনে। জিজ্ঞাসা করলুম: বাসে জায়গা পাবেন?

ভদ্রলোক কতকটা নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন: তা পেয়ে যাব।

না পেলে?

কাল আবার চেষ্টা করব।

আমি হতাশ হয়ে সরে গেলুম সেখান থেকে।

হঠাৎ একটা কুলি এসে আমাকে প্রশ্ন করল: ইম্ফল যায়গা?

বললুম: হ্যাঁ।

দো সীট?

এবারে আমি কোন উত্তর দেবার আগেই সে ছুটে গিয়ে আমাদের মালপত্র নিয়ে টানাটানি শুরু করল। স্বাতি বাধা দিল তাকে। আমি ফিরে গিয়ে বললুম: ব্যাপারখানা কী তা বলবে তো!

লোকটা সংক্ষেপে বলল: প্রাইভেট গাড়ি।

বলে একটা ঝকঝকে অ্যামবাসাডার গাড়ি দেখিয়ে দিল।

বললুম: কার গাড়ি, ভাড়া কত নেবে, এসব বলবে কে?

আমি হিন্দীতে এই কথা বলেছিলুম। কিন্তু যে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, তিনি ইংরেজীতে উত্তর দিলেন: গাড়িটা আমার। বাসে গেলে আপনাদের তো পনের টাকা করে তিরিশ টাকা ভাড়া লাগবে, আপনারা চল্লিশ টাকা দেবেন।

বললুম: পথে গাড়ি আটকাবার ভয় নেই তো?

ভদ্রলোকের চেহারা ভাল, দামী স্যুট পরে আছেন, চোখে সোনার চশমা। হেসে বললেন: নতুন মার্ক-থ্রি। আশা করি লাঞ্চের আগেই ইম্ফলে পৌঁছে যাবেন।

স্বাতি বলল: তাহলে তো ভালই হয়।

যে লোকটি আমাদের মালপত্র এনেছিল, সে তখনও অপেক্ষা করছিল। অন্য লোকটির অনেক চেষ্টাতেও সে তা হাতছাড়া করে নি। এইবারে দু হাতে দুটো জিনিস নিয়ে রাস্তার অন্য ধারে চলে গেল। পিছনে কিছু মালপত্র ছিল। সেগুলি নামিয়ে কোন রকমে আমাদের জিনিসও ঢোকানো হল। স্বাতি পিছনে উঠে বসল, কুলিকে বিদায় দিয়ে আমি বসলুম তার পাশে। আর একজন ছিপছিপে ভদ্রলোক গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বসলেন ধারে।

তারপর দুজন মোটাসোটা ভদ্রলোক সামনে বসলেন, আর যিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি বসলেন ড্রাইভারের সীটে। দশটার আগেই আমরা মণিপুর যাত্রা করলুম।

নিঃশব্দে আমাদের গাড়ি চলছিল। এম. এল এ. হস্টেল ছাড়িয়ে সিমেট্রির পাশ দিয়ে আমরা ইম্ফলের পথ ধরলুম। ইম্ফল এখান থেকে উননব্বুই মাইল দক্ষিণে। ডিমাপুর থেকে দূরত্ব একশো পঁয়ত্রিশ মাইল। ভোর ছটায় যে বাস ছাড়ে তা ইম্ফলে পৌঁছয় দুপুর দুটোয়। পথ খারাপের জন্যে পৌঁছতে কিছু দেরি হয়।

ইম্ফল শহরও সমতল ভূমিতে নয়। তার উচ্চতা ২,৬০০ ফুট। কিন্তু কোহিমা থেকেই এই পথ নেমে যায় নি। ৬,৭০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত উঠতে হয়। শেষ পনেরো মাইল সমতল এক সুন্দর উপত্যকার পথ। তার দুধারের দৃশ্য নাকি ভারি সুন্দর।

পথে নাগাল্যাণ্ডের আরও তিনটি বড় গ্রাম পড়বে—বিশ্বেমা খুজামা ও মাও। তার পরে মণিপুরের সীমান্ত। ইম্ফলে পৌঁছবার আগে পাওয়া যাবে তাহবে মারাম কারং কাংপোক্‌পি। এই সমস্ত নাম আমরা ফণি সিং এর কাছে জেনেছিলুম। ফণি সিং আমাদের গাড়ির চালক। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দুপুরের আহারের সময়ে। ইম্ফলে পৌঁছতে দেরি হবে বলে আমরা পথেই একটা হোটেলে খেয়েছিলুম বেলা বারোটার সময়ে। বাসের যাত্রীরা এখানেই খায়। ভাত ডাল তরকারি আর মাছের ঝোল পাওয়া যায়। ফণি সিং এর খাতিরে আমরা মাছ ভাজাও পেলুম।

যে গাড়িতে আমরা চলেছিলুম তার মালিকানা জানবার জন্যে যে স্বাতি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল তা আমি বুঝতে পারছিলুম। কিন্তু কোন প্রশ্ন করা অসৌজন্য হবে ভেবে চুপ করে ছিলুম। যে দুজন ভদ্রলোক সামনে বসেছিলেন, তাঁরা পুরোদস্তুর সাহেব। তাঁদের একজনকে বাঙালী বলে মনে হচ্ছিল। আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি যে বাঙালী তা তিনি নিজেই বললেন।

এক সময়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা কত দিলেন?

বললুম: এখনও দিই নি।

কত চেয়েছে?

কুড়ি টাকা করে।

ইস্, আমার কাছে দু টাকা বেশি নিয়েছে দেখছি।

তারপরেই ভদ্রলোক বললেন: আগে টাকা দিয়ে খুব ভুল করেছি দেখছি। তা না হলে এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে দিতাম না।

এই ভদ্রলোকের নাম চ্যাটার্জি। একটি কমার্সিয়াল ফার্মের রিপ্রেজেণ্টেটিভ। সেই ফার্মের নাম আমাদের জানা ছিল না, কিন্তু তাঁদের তৈরি একটি জিনিস আমাদের ঘরে ঘরে। এ কথা জানবার পরে ভদ্রলোককে খুব আপন মনে হল।

তিনিও আমাদের সামনের তিন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী ছিলেন। এক সময়ে আমাকে বললেন: ব্যাপারখানা ঠিক বুঝতে পারছি না।

কী ব্যাপার?

চ্যাটার্জি আরও চুপি চুপি বললেন: গাড়িটা কার, আর যে চালাচ্ছে সেই বা কে?

ঠোঁটের উপরে আঙুল চেপে আমি তাঁকে নিরস্ত করলুম। সামনে যে ভদ্রলোক একেবারে ধারে বসেছিলেন, তাঁকে বাঙালী মনে হচ্ছিল বলেই আমি সর্তক হয়েছিলুম। তবে ওঁরাও আমাদের মতো যাত্রী হতে পারেন। আবার নাও হতে পারেন। তাঁরাও পরস্পরের মধ্যে কথা কইছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ফণি সিংএর কাছ থেকেই সব খবর পাওয়া গেল। দুপুরের আহারের পর আমরা যখন একটু আড়াল খুঁজছিলুম, আর সামনের দুই ভদ্রলোক পান খেতে গিয়েছিলেন একটা দোকানে,

সেই ফাঁকে স্বাতি ফণি সিংএর কাছেই ব্যাপারটা জেনে নিয়েছিল। গাড়িটা একটা সরকারী প্রতিষ্ঠানের। নূতন গাড়ি। সামনে যে তিনজন বসেছেন, তাঁরা কোন না কোন ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। যাঁকে আমরা বাঙালী ভেবেছি, তিনি অফিসের বড় কর্তা। একটা কাজে কোহিমা এসেছিলেন গতকাল, আজ ফিরে যাচ্ছেন। আমাদের তিনজনকে সঙ্গে নেবার জন্যে তাঁদের কোহিমায় রাত্রিবাসের খরচটা উঠে যাবে।

আমি স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করলুম: তাঁদের কাজটা সরকারী, না ব্যক্তিগত?

স্বাতি বলল: তা জিজ্ঞেস করি নি।

বললুম: সরকারী কাজ হলে তো রাত্রিবাসের খরচটা সরকারই দেবেন। মনে হয় নিজেদের কাজেই এসেছিলেন।

বাঙালী ভদ্রলোক বোধহয় জানতে পেরেছিলেন বা সন্দেহ করেছিলেন যে গাড়ির ব্যাপারটা আমরা জেনে ফেলেছি। তাই আর আমাদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা কইলেন না, নিজেদের মধ্যেও না। লজ্জা বোধহয় আমরা বাঙালী বলেই।

কোহিমা থেকে ইম্ফলের পথে গাড়ি খুব বেগে চালানো যাচ্ছিল না। পথ মাঝে মাঝে ভাঙা এবং মেরামত চলছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে পথ, কোনখানে সমতল নয়। এক জায়গায় আমরা নাগাল্যাণ্ডের সীমান্ত পেরিয়ে মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছিলুম। মাও নামের জায়গাটি সীমান্তের ধারেই। কোহিমা ও ইম্ফলের ঠিক মাঝখানে এই শহরটি প্রায় ছ হাজার ফুট উঁচু। এখানে মাও নাগাদের বাস। ভারি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান।

ভারতের মানচিত্র সব সময়ে আমার চোখের সামনেই থাকে। চোখ বন্ধ করলেই তা দেখতে পাই। নাগাল্যাণ্ডের পশ্চিম ও উত্তর জুড়ে আছে আসাম রাজ্য, পূর্বে উত্তরের দিকে অরুণাচল প্রদেশের এক অংশ এবং তার দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ নাগাল্যাণ্ডের

পূর্ব সীমানায়। আর দক্ষিণে এই মণিপুর রাজ্য। কোহিমা থেকে আমরা দক্ষিণে ইম্ফলের দিকে এগিয়ে চলেছি।

মণিপুর রাজ্যের পূর্ব সীমানাতেও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণেরও অনেকটা অংশ আছে। বাকিটা মিজোরাম। মণিপুর থেকে আমরা মিজোরামে যাব, কিন্তু পথ ভাল নয়। পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা তাও জানি না। মিজোরাম যেতে হয় আসামের শিলচর থেকে। মণিপুরের পশ্চিমেও আসাম।

ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছিলুম যে মণিপুর রাজ্যের মাত্র এক-দশমাংশ সমতল ভূমি। ভারতের সিন্ধু-গঙ্গার শস্যশ্যামল উপত্যকা মেঘালয় রাজ্যে এসে দু ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এক ভাগ ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা, আর এক ভাগের নাম সুর্মা উপত্যকা। সুর্মা নদীর উপত্যকা বাঙলা দেশ ও আসামের কাছাড় জেলায় বিস্তৃত। এই উপত্যকার শেষ অংশটুকু মণিপুর রাজ্যে ঢুকে পড়েছে, তার নাম জিরিবামের সমতল ভূমি। জিরি নদী আসাম ও মণিপুরের সীমান্তে প্রবাহিত হচ্ছে, তার পূর্বে বরাক নদী। জিরির সঙ্গে মিলিত হয়ে বরাক বাঙলা দেশে সুর্মা উপত্যকায় প্রবেশ করেছে। জিরিবাম নামে একটি জায়গাও আছে। মাঝে মাঝে শুনতে পাই শিলচর থেকে জিরিবাম পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হবে। পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণের সময়ে প্রধানমন্ত্রীও এই আশ্বাস দিয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে এই রেলপথ নির্মিত হলে জিরিবাম থেকে ইম্ফলে যাওয়া সম্ভব হবে। দূরত্ব কত তা জানি নে। তবে এখনও যে যাতায়াত করা যায় তা শুনেছি।

মণিপুর রাজ্যের মাঝখানেও একটি উপত্যকা আছে, তার নাম মণিপুর উপত্যকা। ইম্ফল নামে একটি নদী এই উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ইম্ফল শহর পেরিয়ে এই নদী দক্ষিণে লোগতাক হ্রদের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদী আমরা কখন পেরিয়ে মণিপুর উপত্যকায় পৌঁছেছিলুম তা বুঝতে পারি নি। কাংপোকপি নামে একটি ছোট শহরে কিছুক্ষণের

বিরতির সময়ে এই কথা জানলুম। অনেকেই চা খেলেন এখানে। বিশেষ করে একটি কালো অ্যাম্বাসাডার গাড়ি অনেকক্ষণ থেকেই আমাদের অনুসরণ করছিল। এক সময়ে আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে এইখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা নেমে দেখলুম যে সেই গাড়ির যাত্রীরা সবাই চা খেতে নেমেছেন। চায়ের সঙ্গে মিষ্টিও খাচ্ছেন। শুনলুম যে এঁরাও সরকারী কাজে সপরিবারে এসেছিলেন, এইবারে ফিরে যাচ্ছেন।

স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল : তুমিও কি চা খাবে ?

বললুম : একটু আগেই তো ভাত খেয়েছি। ইম্ফলের হোটেলে উঠেই চা খাব।

স্বাতি বলল : সেই ভাল।

পথে নেমে আমরা যখন পায়চারি করছিলুম, ফণি সিং তখন গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন। বললুম : কোথায় গিয়েছিলেন ?

ফণি সিং বললেন : খানিকটা পেট্রোল নিয়ে নিলাম।

এর পরে আমাদের আর পাহাড়ের পথ নেই। দুধারের পাহাড় এখন অনেকটা দূরে সরে গেছে, উপত্যকাটি প্রশস্ত বলে মনে হচ্ছে।

এক সময়ে স্বাতি বলল : অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ছে। কাংড়ায় আমরা 'এই রকমের উপত্যকা দেখেছিলুম। সমতল পথ ছিল অনেকটা।

কিন্তু পাহাড় আরও উঁচু ছিল, আর সেই পাহাড়ে বরফ জমে থাকত শীতের পরে।

এখানে বোধহয় বরফ পড়ে না।

বলে স্বাতি নীরব হল।

গাড়ি এখন খুব দ্রুত গতিতে চলেছে। দুটো বেজে গেছে অনেকক্ষণ আগে। এইভাবে চললে আমরা তিনটের আগেই পৌঁছতে পারব।

পাশে থেকে চ্যাটার্জি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : ইম্ফলের বাসগুলো আমরা কোথায় পেরিয়ে এলাম বলুন তো।

আমি কতকটা হকচকিয়ে বললুম : পেরিয়ে এসেছি কি ?

তাহলে কি মণিপুর স্টেটের বাস আমাদের আগেই ইম্ফলে পৌঁছবে?

তা জানি নে তো!

স্বাতি বলল : পথের ধারে কোন গ্রামে বা শহরে দু-একখানা বাস দাঁড়িয়ে ছিল বলে মনে পড়ছে।

বললুম : সত্যিই আমরা অনেক কিছু লক্ষ্য করি না। সব জিনিস লক্ষ্য করবার চোখ আমাদের নেই। একজোড়া চোখ থেকেও আমরা অন্ধের মতো চোখ বুজে চলি। কেউ দেখিয়ে দিলে দেখি, না দেখালে না দেখাই থেকে যায়।

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

## ২০

আমরা যে ইম্ফল শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছি, তা অনুমান করতে পারছিলুম। ফণি সিং হঠাৎ সামনে থেকে প্রশ্ন করে বসলেন: ইম্ফলে আপনারা কোথায় থাকবেন?

বলে চকিতে একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: একটা ভাল হোটেলে উঠব ভাবছি।

স্বাতি বলল: পছন্দ মতো একটা হোটেলের সামনে নামিয়ে দিলে আমাদের খুব উপকার হত।

আপনি?

বলে ফণি সিং এবারে মিস্টার চ্যাটার্জির দিকে তাকালেন।

মিস্টার চ্যাটার্জি অবিলম্বে বললেন: মারবাড়ী ধর্মশালায়।

ফণি সিং তাঁর পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু আলোচনা করে বললেন: ভাল হোটেল বলতে সবই দেশী হোটেল। ব্যবস্থা মোটামুটি একই রকম।

একেবারে ধারের বাঙালী ভদ্রলোক বললেন: টুরিস্ট লজ ওঁদের ভাল লাগবে।

কিন্তু ফণি সিং তাঁকে বললেন: ভাড়া বড্ড বেশি।

কত?

এক বন্ধুর জন্যে খোঁজ করতে গিয়ে পালিয়ে এসেছি। একজনের পঁয়ত্রিশ, আর দুজনের পঁয়তাল্লিশ টাকা।

খাওয়াদাওয়া সুদ্ধ?

ফণি সিং বললেন: তা আর জানতে চাই নি।

স্বাতি চুপি চুপি আমাকে বলল: ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ভাল।

আমার মনে হল যে ফণি সিং এই কথা শুনতে পেলেন, আর গাড়ির গতি কমিয়ে বললেন : টুরিস্ট লজে থাকবেন ?

বলে রাস্তার ধারেই একটা সুন্দর বাড়ি দেখিয়ে দিলেন। বাহিরটা দেখে মনে হল যে ভিতরটা নিশ্চয়ই আরও সুন্দর। কিন্তু হতাশ হলুম অন্য কারণে। আশেপাশে ঘর বাড়ি বেশ দূরে দূরে, আর পথে যানবাহন একটিও নেই। নিজেদের গাড়ি না থাকলে এখান থেকে শহরে যাতায়াত একটা সমস্যার ব্যাপার হয়ে উঠবে ভেবে বললুম : এখানে থাকা চলবে না।

কেন ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : আমরা তো শহর দেখতে এসেছি। শহর দেখা হয়ে গেলে এ রাজ্যের অন্য দর্শনীয় স্থানগুলোও দেখব। কিন্তু এখানে থাকলে যাতায়াত করব কী করে!

ফণি সিং আমার কথা মেনে নিয়ে বললেন : তা একটু অসুবিধা হবে বৈকি ! শহর থেকে ফেরার অসুবিধা হবে না, অসুবিধা হবে এখান থেকে যাবার।

বলে গাড়ির গতি আবার বাড়িয়ে দিলেন।

ফণি সিংএর পাশের ভদ্রলোক বললেন : পাওনা বাজারে অনেক হোটেল আছে—রাজ রাজস্থান টুরিস্ট গ্র্যাণ্ড গেস্ট হাউস—

ফণি সিং বললেন : এ সবের চেয়ে বীর টিকেন্দ্রজিৎ রোডের হোটেল ডিপ্লোম্যাট ভাল হবে।

কথায় কথায় আমরা শহরে পৌঁছে গেলুম। দু-একটা মোড় নিয়ে ফণি সিং আমাদের একটা হোটেলের সামনে নিয়ে এলেন। আমরা নামতে যাচ্ছিলুম জিনিসপত্র নিয়ে, কিন্তু ফণি সিং বাধা দিয়ে বললেন : আগে দেখে নিন ঘর, পছন্দ হলেই মাল নামিয়ে দেব।

হোটেলের উপরতলায় উঠে আমরা একটি ঘর দেখলুম। অন্ধকার ঘর, এক নজরে অপরিচ্ছন্ন বলেই মনে হল। পছন্দ হল না। ফণি

সিং আমার মুখের দিকে চেয়েই বোধহয় বুঝতে পারলেন, বললেন: আর দু-একটা হোটেল দেখা যাক।

বলে আমাদের আর একটা হোটেলে নিয়ে এলেন। এটাও আমাদের পছন্দ হল না দেখে বললেন: এই হোটেল তো আমি ভাল বলেই জানতাম। আর সত্যি কথা কি, আমাদের তো হোটেলে থাকবার দরকার হয় না।

গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কোন হোটেলের নাম শুনেছেন?

স্বাতি বলল: কোহিমার সেই ভদ্রলোক একটা হোটেলের নাম বলেছিলেন—

বললুম: নটরাজ হোটেল।

তাহলে সেখানেই দেখা যাক।

বলে ফণি সিং সেই দিকেই অগ্রসর হলেন। আর খানিকটা চলবার পরে চ্যাটার্জিকে বললেন: আপনি মারবাড়ী ধর্মশালায় উঠবেন বলেছিলেন!

চ্যাটার্জি বললেন: আমাকে নামিয়ে দিন না এখানে।

আমরা তখন ধর্মশালার সামনেই পৌঁছে গিয়েছিলুম। কিন্তু সামনে ফুল পাতা বাতি দিয়ে সাজানো গেট দেখে তিনি ভয় পেয়ে বললেন: একটু দাঁড়ান। ব্যাপারটা কী আগে জেনে আসি।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ফিরে এসে তিনি গাড়িতে বসলেন, বললেন: এক মারবাড়ীর বিয়ে বলে পুরো ধর্মশালা ভাড়া হয়ে গেছে।

তবে?

আমি আপনাদের হোটেলেই নামব।

ইম্ফলে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম। হোটেলগুলো পথের ধারে হয়েও যেন পথের ধারে নয়। একতলায় দোকানপাট গুদামঘর, হোটেল দোতলা বা তিনতলায়। নটরাজ হোটেলে খাবার ও

রান্নাঘরটিই দোতলায়, থাকবার ঘর তিনতলা থেকে ছতলা পর্যন্ত। অথচ লিফ্‌ট নেই। ঘরগুলি মন্দ নয়, ছোট খাট দুখানা করে, ডানলোপিলোর গদি ও বালিশ, ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। কিন্তু সব ঘরে জানালা নেই বলে একটু অন্ধকার, সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়েও সদর রাস্তা দেখা যায় না।

হোটেলের যে বেয়ারা আমাদের ঘর দেখাতে এনেছিল, সে বলল : এই ঘরের ভাড়া পঁচিশ টাকা। সকালে গরম জল আর মর্নিং টি ফ্রী।

স্বাতি বলল : এর চেয়ে ভাল ঘর নেই ?

বেয়ারা বলল : আছে বৈ কি। ভি. আই পি. রুম সব ওপর তলায়।

আমি বললুম : থাক, ভি. আই. পি. রুমে ওঠা-নামা করতে আমাদের দম বেরিয়ে যাবে। এই আমাদের ভাল।

স্বাতি বলল : তবে চাদর বালিশের ওয়াড় বদলে দাও।

ফণি সিং যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন : হোটেলের ম্যানেজারকে আমি চিনি। এখন তো তাঁকে দেখছি না। পরে এসে আপনাদের দেখাশুনো করতে বলে যাব।

নিচে নেমে আমাদের মালপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলুম। হোটেলের বেয়ারারাই তা আমাদের ঘরে নিয়ে গেল। ফণি সিংকে তাঁর প্রাপ্য ভাড়া মিটিয়ে দিতেই তিনি বললেন : আপনারা বিশ্রাম করুন, পরে আসব। কিছু প্রয়োজন থাকলে বলতে সঙ্কোচ করবেন না।

চ্যাটার্জিও আমাদের সঙ্গে নেমে পড়লেন। ধন্যবাদ জানিয়ে সবাইকে আমরা নমস্কার করে বিদায় দিলুম।

কিন্তু এবারে উপরে উঠবার সময়ে এক নতুন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন : আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন ?

উত্তরে আমি বললুম : হ্যাঁ, মণিপুর দেখতে এসেছি।

টুরিস্ট।

চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি বললেন: আমি টুরিস্ট নই, আমাদের মেস আছে। আমি সেখানেই চলে যাব।

বললুম: আপনার নাম কি চঞ্চল সিং?

ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বললেন: আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

আমি সহাস্যে বললুম: আপনার সব খবরাখবর নিয়েই আসছি।

ভদ্রলোকের বিস্ময় তাতে কাটল না দেখে বললুম: জহরবাবুকে চেনেন?

উনি আপনাদের বন্ধু বুঝি!

তার পরেই ভদ্রলোক বললেন: কোন্ ঘর আপনাদের দিয়েছে? ইস্! না না, ও ঘরে আপনারা থাকতে পারবেন না। চার তলায় চলুন।

স্বাতি সহাস্যে বলল: হোটেলে বাস করতে তো আমরা আসি নি, এসেছি মণিপুর দেখতে। অত ওঠা-নামা করতে আমরা পারব না।

ভদ্রলোক বললেন: তবে আসুন আমার সঙ্গে।

বলে উপর তলায় এসে শেষ ঘরখানি থেকে এক ভদ্রলোককে টেনে বার করে আমাদের ঘরটায় ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর জিনিসপত্র সরিয়ে দিলেন নিজেই। বেয়ারা ধোয়া চাদর ও বালিশের ওয়াড় এনেছে দেখে বললেন: এই ঘরে দাও, আর ঝাঁট দিয়ে মুছে দাও ঘরটা। মশারি আনো ভি. আই. পি. রুমের।

ভদ্রলোক হাঁক ডাক করে ঘর পরিষ্কার করালেন। চা আনালেন নিচে থেকে, আর মশারি আনালেন ওপর থেকে। হাল্কা গোলাপী রঙের বিদেশী নাইলনের মশারি। স্বাতি সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলল: এখানে এই রকম মশারি পাওয়া যায় বুঝি?

ভদ্রলোক বললেন : এখানে পাওয়া যায় না, আনাতে হয় বাইরে থেকে। আপনাদের জন্যে আনিয়ে দেব ?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতেই আমি বললুম : আমরা তো এখানে দু তিন দিন থাকব, এর মধ্যে আনিয়ে দিতে পারবেন কি ?

ভদ্রলোক বললেন : তার জন্যে ভাববেন না, আমি জহরবাবুর হাতে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব।

তাহলে টাকা দিয়ে যাব আপনাকে।

দাম আপনি জহরবাবুর হাতেই দেবেন।

এই ঘরে একটি জানালা ছিল, পূর্ব দিকের জানালা। আলো ও বাতাস আসছিল, কিন্তু রোদ আসছিল না। এই একটি জানালাই ঘরে প্রসন্নতার আমেজ এনেছিল। আমরা তিনজনে চা খাচ্ছিলুম, কিন্তু চঞ্চল সিং খাচ্ছিলেন না। কথা প্রসঙ্গেই জানতে পারলুম যে তিনি মণিপুরবাসী নন। তাঁর দেশ হিমাচল প্রদেশে। শৈশবে বর্মায় ছিলেন, বাল্য কালে অনাথ অবস্থায় এসে নিজের চেষ্টায় এই অবস্থায় উঠেছেন।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল : ইম্ফলে দেখবার কী আছে ?

চঞ্চল সিং বললেন : দেখবার আর কী আছে ! একটা শহর, এই পর্যন্ত। এ রকম শহর আপনারা অনেক দেখেছেন।

তবু—

পুরনো রাজপ্রাসাদের বাইরে গোবিন্দজীর মন্দির দেখতে পারেন, আর খৈরামবান্ধ্ বাজারে গিয়ে মেয়েদের হাট।

মেয়েদের হাট !

এটা দেখবার মতো। নানা বয়সের শয়ে শয়ে মণিপুরী মেয়ে নানা পণ্যসম্ভার নিয়ে এই বাজারে জাঁকিয়ে বসে। মেয়েদের এত বড় বাজার নাকি এ দেশে নেই।

স্বাতি বলল : এ দিকে তো শুনেছি মেয়েরাই বাজারে বসে।

চঞ্চল সিং খুব রহস্যজনক ভাবে হাসলেন। তাই দেখে আমি বললুম : হাসলেন যে!

একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বললুম : বলুন না।

চঞ্চল সিং একটু দ্বিধা করে বললেন : মণিপুরে একাধিক বিয়ের চল আছে। মানে পুরুষরা ইচ্ছে মতো বিয়ে করতে পারে। আমার এক মণিপুরী বন্ধু, অনেক বয়স হয়েছে তাঁর, সম্প্রতি আবার বিয়ে করেছেন একটি অল্প বয়সের মেয়ে।

স্বাতি হাসল। তাই দেখে চঞ্চল সিং বললেন : হাসবেন না, কথাটা দুঃখের। নতুন বউএর জন্যে ভদ্রলোকের খরচ এমন বেড়ে গেছে যে আগের পাঁচ-ছটি বউকে আর দেখেন না। জীবিকার জন্যে তাঁরাও এখন ঐ বাজারে কাপড় বেচছেন। আর এরকম ব্যাপার যে কত পরিবারে আছে, তা জানি নে।

আমি বললুম : এ রাজ্যে কি পুরুষের সংখ্যা বেশি ?

চঞ্চল সিং বললেন : না, সে রকম কোন সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। এ সবই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

স্বাতি তার পুরনো কথায় ফিরে গেল। বলল : ইম্ফলে তাহলে আমরা কী করব ?

ভদ্রলোক বললেন : আপনারা টুরিস্ট বলেই বলছি, এক দিন ইম্ফলের বাইরে যান।

কোথায় ?

মইরাঙে। নেতাজীর আই. এন. এ. মেমোরিয়াল দেখবেন ? দেখবেন লোকতাক লেক, আর খাম্বা-থইবির গল্প শুনে ফিরে আসবেন।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাতেই আমি বললুম : সে গল্প আমরা আপনার কাছেই শুনব।

এখন আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না।

বলে ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

চ্যাটার্জি এতক্ষণ নীরবে ছিলেন, বললেন: আপনারা কিছুক্ষণ হোটেলে আছেন তো?

বললুম: হ্যাঁ।

আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ঘুরে এসে আমার জিনিসপত্র নিয়ে যাব।

বলে তিনিও তাঁর ছোট সুটকেশটি রেখে চলে গেলেন।

চঞ্চল সিংএর কথায় আমরা বেশ নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলুম। ইম্ফল শহরে একটা মন্দির আর বাজার দেখতে আমাদের অল্প সময় লাগবে। ইচ্ছে করলে আজই দেখে ফেলতে পারি, আর কাল বেরিয়ে পড়তে পারি মইরাঙে। তারপর?

স্বাতি তার ব্যাগ থেকে টুরিস্ট লিটারেচার বার করে বলল: তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

বলে পড়তে লাগল: ইম্ফল···গোবিন্দজীর সোনার মন্দির আর খৈরামবান্ধ্ বাজার···বিষেণপুর সাতাশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে পঞ্চদশ শতাব্দীর বিষ্ণু মন্দিরের জন্যে বিখ্যাত। তারপর মইরাঙ আর লোকতাক লেক। এখানে আমরা কাল যেতে পারি।

বললুম:: তাড়াতাড়ি দেখে আসাই ভাল।

স্বাতি বলল: আর একটি দর্শনীয় স্থান হল কৈনা। এখান থেকে উনত্রিশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপর। নশো একুশ মিটার কত উঁচু বল তো?

আন্দাজে বললুম: তিন হাজার ফুটের মতো।

এই তো, বাস যায় দেখছি। এখানেও যাওয়া যেতে পারে।

কী আছে সেখানে?

সবটা পড়ে নিয়ে স্বাতি বলল: একটা তীর্থস্থান মনে হচ্ছে। মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নে গোবিন্দজীকে দেখেছিলেন। গোবিন্দজী তাঁকে বলেছিলেন, কৈনার একটা কাঁঠাল গাছ কেটে

তাঁর মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করতে। কই, মন্দির আর মূর্তির কথা তো কিছু নেই! জায়গাটার প্রাকৃতিক শোভা আর পবিত্র আবহাওয়ার কথা আছে।

বললুম : বাদ দাও তাহলে।

স্বাতি পড়ে গেল : ইম্ফল থেকে আট কিলোমিটার দূরে লাঙ্গথাবল। একটা পুরনো প্রাসাদ, আর বোঝা যাচ্ছে না কোন মন্দির আছে কিনা।

তারপর পড়।

ইম্ফো-বার্মা রোডে উনসত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে টেঙ্গনৌপাল। এই উঁচু জায়গা থেকে মণিপুর উপত্যকা খুব ভাল দেখা যায়।

বললুম : ইম্ফলে আসবার পথে দেখেছি।

ঐ পথেই এগিয়ে গেলে একেবারে বর্মার সীমান্তে মোরে মণিপুরের শহর। এখানে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করা যায়।

কী?

বর্মার দিকে লতা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে জড়ায় গাছকে, আর মণিপুরে তার উল্টো।

বললুম : প্রকৃতিতে এ রকম কোন নিয়ম থাকতে পারে না। দু-একটা গাছে এই রকম দেখেই কেউ হয়তো এ কথা রটিয়েছে।

স্বাতি বলল : ইম্ফো-বর্মা রোডের ওপরেই সাঁইত্রিশ কিলোমিটার দূরে খঙ্গজাম একটি ঐতিহাসিক স্থান। ১৮৯১ সালে মণিপুরের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে এবং মণিপুরের বীর মেজর জেনারেল পাওনা এইখানে প্রাণ দিয়েছিলেন। ইম্ফল শহরের পাওনা বাজার বোধহয় তাঁরই নামে।

বাধা দিয়ে আমি বললুম : এইবারে জায়গাগুলো বুঝে নিতে দাও।

স্বাতি বলল : পড়া তো এখনও শেষ হয় নি।

বললুম : না হোক। বর্মা রোডের ওপরে তিনটি জায়গার নাম পাওয়া গেছে—প্রথম হল খঙজাম, দ্বিতীয় টেঙনৌপাল আর তৃতীয় হল সীমান্ত শহর মোরে, ওপারে বোধ হয় টামু।

জানলে কী করে ?

বললুম : ওটা ন্যাশনাল হাইওয়ে তো, ঐ পথের কথা কোথাও পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।

স্বাতি বলল : একখানা ম্যাপ থাকলে খুব সুবিধে হত।

কিন্তু দুখানা ম্যাপ যে মেলে না।

তাহলে বাকিটুকুও পড়ে ফেলি।

বলে স্বাতি পড়তে লাগল : লোগতাক হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক প্রজেক্ট, চল্লিশ মাইল দূরে একটা পাহাড়ের নিচে।

বললুম : সে নিশ্চয়ই ওই লেকের ধারেই হবে।

কাঙচুপ ষোল মাইল পশ্চিমে একটি স্বাস্থ্য নিবাস। মণিপুর উপত্যকা দিয়ে তামেঙলং যাবার পথে একটা গিরিপথের ওপরে এই জায়গা। কিন্তু মণিপুরের সব চেয়ে উঁচু পার্বত্য শহর হল উখরুল। এখান থেকে তিরাশি কিলোমিটার দূরে এই শহরের উচ্চতা হল উনিশ শো মিটার। ফুটের হিসেবে কত বলতে পার ?

মনে মনে হিসেব করে বললুম : ছ হাজারের বেশি।

স্বাতি বলল : এখানে লিখেছে সিমলার ম'তো উঁচু, আর শীতও ঐ রকম। টাঙখুল নাগাদের বাস এই পাহাড়ে। আর একটা জায়গার কথা বাদ গেছে। নিউ চুড়াচাঁদপুর ষাট কিলোমিটার দূরে। নাগা ছাড়া আর সব উপজাতিদের বাস সেখানে। মাও তো আমরা কোহিমা থেকে আসবার পথেই দেখেছি।

বলে তার কাগজপত্র মুড়ে রেখে দিল।

পরে আমি ফণি সিংএর কাছে এ রাজ্যের অনেক কথা জেনে নিয়েছিলুম। ইণ্ডো বর্মা রোড লোগতাক লেক পশ্চিমে রেখে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্মার সীমান্তে গেছে পালেল নামে একটা শহরের উপর

দিয়ে। অন্য পথ লোগতাক লেকের পশ্চিম দিয়ে চূড়াচাঁদপুর গেছে। এই পথের উপরেই বিষেণপুর ও মইরাঙ। এই দুই পথের মাঝখান দিয়ে আরও একটি পথ আছে, সেটির দুধারেই লোগতাক লেক। থৌবল নামে একটি নদী এসে এই লেকে পৌঁছেছে। আবার ইম্ফল নদীও এই লেকের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে বর্মায় প্রবেশ করেছে।

মইরাঙ থেকে একটি পথ পূর্ব দিকে আসাম সীমান্তে বরাক ও মরো নদী পেরিয়ে জিরি নদীর ধার পর্যন্ত গেছে। শিলচর থেকে জিরিবাম পর্যন্ত রেলপথ বসলে এই পথেই ইম্ফলে আসা যাবে। দূরত্ব বোধহয় একশো কিলোমিটার হবে না।

আমরা যে পথে এসেছি, সেই পথের কাঙ্গপোকপি থেকে একটা পথ তামেঙ্গলং গেছে। এই পথের উপরেই পাহাড়ী শহর কাঙ্গচুপ। উখরুলের অন্য পথ, এই পথটি পশ্চিমে ঘুরে মাওএর দক্ষিণে কোহিমার পথের সঙ্গে মিলেছে।

ফণি সিংএর কাছেই শুনলুম যে মণিপুর রাজ্যে পাঁচটি জেলা। তাদের নাম মণিপুর সেণ্ট্রাল ও ঈস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ। ইম্ফল সেণ্ট্রালের প্রধান শহর। রাজ্যেরও। ঈস্টের উখরুল, ওয়েস্টের তামেঙ্গলং ও নর্থের কেরঙ—কোহিমা রোডের উপরে, আর স উথের প্রধান শহর চূড়াচাঁদপুর।

রাজ্যের আয়তন বাইশ হাজার তিনশো ছাপান্ন স্কোয়ার কিলোমিটার, জনসংখ্যা দশ লাখ বাহাত্তর হাজার সাতশো তিপ্পান্ন। রাজ্যের শতকরা ছেষট্টি জন কৃষিজীবী, তাঁত শিল্পই সবচেয়ে বড় কুটিরশিল্প। রাজ্যের ভাষা মণিপুরী একটি স্বতন্ত্র ভাষা।

স্বাতি প্রশ্ন করেছিল: মণিপুর তো চিরকাল স্বাধীন রাজ্য ছিল?

বললুম: স্বাধীনই বলতে পার। ইংরেজ অধিকারের আগে দেশীয় রাজ্যগুলিকে আমরা স্বাধীন বলতাম। মণিপুর বৃটিশের পদানত হয়েছিল ১৮৯১ সালের যুদ্ধের পরে। স্বাধীন ভারতে মণিপুর

পূর্ণ রাজ্যের সম্মান পেয়েছে ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী। আর সবচেয়ে আশার কথা যে মণিপুরীরা নাগা ও মিজোদের মতো ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে গোপনে আন্দোলন করছে বলে শোনা যায় না।

তারপরেই বললুম : এইবারে কি আমরা বেরোব ?

স্বাতি বলল : মিস্টার চ্যাটার্জির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

তারপর ?

প্রথমেই যেতে হবে তোমার সেই বন্ধুর কাছে। কী নাম যেন তাঁর ?

বললুম : অধ্যাপক আছৌবি সিং।

স্বাতি বলল : মেয়েদের বাজার আর গোবিন্দজীর মন্দির দেখে সেখানে গেলে কি ভাল হয় না ?

বললুম : সকলের আগে শিলচরের জন্যে প্লেনের টিকিট কেটে নিলেই ভাল হয়।

কাল পরশু আমরা এখানেই থাকব।

তাহলে তার পরের দিনের জন্যে কাটব প্লেনের টিকিট।

ঠিক এই সময়েই চ্যাটার্জির গলা শোনা গেল, বাইরে থেকে বললেন : আসতে পারি ?

আমি উঠে গিয়ে তাঁকে ভিতরে আনলুম। কিন্তু তিনি আর বসতে রাজী হলেন না। বললেন : নিচে আমার রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।

দরজায় তালা দিয়ে আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

## ২১

দোতলায় ম্যানেজারের কাউণ্টারেই চঞ্চল সিংএর দেখা পেয়ে গেলুম। তাঁর কাছে খবর পেলুম যে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, সকাল বেলায় খুলবে। হোটেলের খুব কাছেই অফিস। ব্রেকফাস্টের পরে সেখানে গিয়ে টিকিট কেটে আমরা যেখানে খুশি যেতে পারব।

টিকিট পেতে অসুবিধা হবে না তো?

অসুবিধে হয় না বলেই জানি। আর আমি আপনাদের সঙ্গে লোক দিয়ে দেব।

বলে চঞ্চল সিং আমাদের আশ্বাস দিলেন।

আমি বললুম: একবার মইরাঙে যাবার ইচ্ছা আছে।

চঞ্চল সিং তখুনি বললেন: নিশ্চয়ই যাবেন।

কিন্তু যাতায়াতের কী ব্যবস্থা আছে জানি নে তো!

চঞ্চল সিং এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপরে বললেন: একদিন অপেক্ষা করতে পারেন?

কেন বলুন তো!

আমার গাড়ি কারখানায় আছে, কাল বিকেলে পাবার কথা। আপনারা অপেক্ষা করলে আমিই আপনাদের সব দেখিয়ে আনতে পারব।

কিন্তু—

এতে আবার কিন্তু কী আছে! ভাড়ার কথা ভাবছেন? ভাড়া তো আমি আপনাদের কাছে নিতে পারব না, তার জন্যেই যদি আপত্তি হয় তো পেট্রোলের দামটা দিয়ে দেবেন। বিনে পয়সায় আমার গাড়ির ট্রায়াল হয়ে যাবে।

বলে হাসতে লাগলেন।

স্বাতিও হেসে বলল: খুব ভাল প্রস্তাব। আমরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করব।

চঞ্চল সিং বললেন: আমাদের বাঙালী মিস্ত্রি। আপনাদের কথা বললে কাল নিশ্চয়ই গাড়ি পাওয়া যাবে।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন: এখন কোথায় যাচ্ছেন?

লেডিজ মার্কেট দেখে গোবিন্দজীর মন্দিরে যাবার ইচ্ছা ছিল। এখন ভাবছি, কাল সকালেই যাব।

সেই ভাল। অন্ধকার হবার পরে এখানকার পথে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়।

কেন?

চঞ্চল সিং এক নজরে তাঁর সামনেটা দেখে বললেন: এ শহরে আপনারা নতুন মানুষ—

বুঝতে পারলুম যে কথাটা ভদ্রলোক চেপে গেলেন। তাই দেখে বললুম: তবে একটা উপকার করুন।

কী?

প্রফেসর আছৌবি সিংএর দেখা কোথায় পাব—

বলে ঠিকানা লেখা কাগজখানা পকেট থেকে বার করে তাঁর হাতে দিলুম।

কাগজের উপরে চোখ বুলিয়ে চঞ্চল সিং বলে উঠলেন: এ তো কাছেই। সামনের রাস্তা থেকে একটা রিক্সা নিয়ে চলে যান।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা নেমে গেলুম। রিক্সাও পাওয়া গেল। কিন্তু ঠিকানাটা যত সোজা মনে হয়েছিল তত নয়। বেশ বেগ পেতে হল বাড়ি খুঁজে পেতে। কিন্তু প্রফেসরকে পাওয়া গেল না। তিনি বাড়ি নেই। কোথায় গেছেন তা বলে যান নি। কাজেই অপেক্ষা করার সার্থকতা নেই। একখণ্ড কাগজ চেয়ে নিয়ে আমি নিজের নাম ঠিকানা লিখে রেখে হোটেলে ফিরে এলুম।

ঘরে এসে স্বাতি বলল : আজকের দিনটি আমাদের কাজে লাগল না।

বললুম : কপাল ভাল হলে দিনটা নষ্ট হবে না।

স্বাতি বিছানায় আয়েশ করে বসে বলল : তাহলে তুমি নিজেই কিছু বল।

ইতিহাস।

ইতিহাসের কথাটাই তোমার আগে মনে পড়ে তো!

বললুম : ঐটেই তো সকলের আগের কথা। আর ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোন দেশের কথা সম্পূর্ণ হয় না।

স্বাতি বলল : কিছু নতুন কথা বল।

বললুম : এই মণিপুরকে আমরা মহাভারতের মণিপুর বলে ধরে নিয়েছি।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : ধরে নিয়েছি মানে! এ তো মহাভারতেরই মণিপুর।

হেসে বললুম : সাহেবরা এ কথা মেনে নেন নি কানিংহাম সাহেব বলেছিলেন, মহাভারতের মণিপুর ছিল মধ্যপ্রদেশে রতনপুরের উত্তরে এক মণিপুরে। কেউ ম্যাড্রাসের মায়লাপুরে, কেউ মাদুরার কাছে, কেউ বা উত্তরপ্রদেশে সীতাপুরের কাছে একটি গ্রামকে প্রাচীন মণিপুর বলেছেন।

স্বাতি বলল : এই মণিপুরের বিপক্ষে কি কোন প্রমাণ আছে?

বললুম : গোলমাল বাধিয়েছে মহাভারতেরই একটি শ্লোক। চিত্রাঙ্গদার পিতা ছিলেন কলিঙ্গের রাজা এবং তাঁর রাজধানী ছিল সমুদ্রতীরে। এই মণিপুর কখনই কলিঙ্গের অধীন ছিল না। আর দেশটাও ছিল না সমুদ্রের ধারে।

স্বাতি বলল : এইটেই আপত্তির কথা হলে তোমার মধ্যপ্রদেশ বা উত্তর প্রদেশেও মণিপুর হতে পারে না, আর ম্যাড্রাসের মায়লাপুরও কখনও কলিঙ্গের ছিল না। কাজেই এই মণিপুরকেই মহাভারতের

মণিপুর বলে মেনে নেওয়া ভাল। তুমিই বলেছিলে যে মণিপুর নাগরাজ্যের সংলগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

হেসে বললুম : এবারে তাহলে পুরনো কথা বলি।

বল।

বিধবা উলূপী গঙ্গাদ্বার থেকে বনবাসী অর্জুনকে এই দেশে টেনে এনেছিলেন। অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, সুভগে, তুমি কে? এ কোন্ দেশে আমাকে টেনে আনলে?

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে উলূপী বলেছিলেন,

ঐরাবত কুলে জাতঃ কৌরব্যো নাম পন্নগঃ।

তস্যাস্মি দুহিতা রাজন্নুলূপী নাম পন্নগী॥

ঐরাবত বংশজাত নাগরাজ কৌরব্য আমার পিতা, আমি তাঁর কন্যা উলূপী।

একটু থেমে বললুম : এইবারে আমার যুক্তি শোন। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদী আছে, আর নাগা অঞ্চলে ঐরাবতী নদী নামেও নাকি একটি নদী আছে। না থাকলেও পুরাকালে এই অঞ্চলবাসীরাই যে ঐরাবত বংশোদ্ভব বলে নিজেদের পরিচয় দিত, তা মেনে নিতে আপত্তি কী!

স্বাতি বলল : ইরাবতী নদী থেকে ঐরাবত বংশ, এ কোন যুক্তির কথা নয়।

বললুম : এ রকম অনুমানের একটা সমর্থন পাওয়া যায়। অর্জুন উলূপীকে বিবাহ করেছিলেন, তারপরে এসেছিলেন মণিপুরে। আর এখানেই তিনি মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। নাগরাজ্য ও মণিপুর যে পাশাপাশি দুটি রাজ্য ছিল, এই কথাই কি প্রথমে মনে হয় না? পরবর্তী কালে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার পিছনে অর্জুন মণিপুরে এসেছিলেন, পুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন, আর এই সংবাদ পেয়ে উলূপী এসে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। কাছাকাছি না

থাকলে কি উলূপী এই সংবাদ পেতেন, না ছুটে আসতেই পারতেন! দ্রৌপদী তো আসেন নি, আসেন নি আর কোন পাণ্ডব! এই সব কারণেই আমরা নাগাল্যাণ্ডকে প্রাচীন নাগরাজ্য ও মণিপুরকে মহাভারতের মণিপুর বলে মেনে নিতে চাই।

স্বাতি হেসে বলল: সেই ভাল।

বললুম: নাগকন্যা উলূপীর কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নানা তীর্থ দর্শন করলেন। তারপর মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্রতীর ধরে মণিপুরে এলেন। এখানে এসে তিনি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখলেন। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী। অর্জুন মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁকে দেখে। তাই রাজা চিত্রবাহনের নিকটে নিজের পরিচয় দিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। রাজা বলেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ প্রভঞ্জন তপস্যা করে শিবের বর পেয়েছিলেন যে এই বংশে একটি মাত্র সন্তান হবে। এই প্রথমবার এই বংশে কন্যাসন্তান হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে পুত্র বলে মনে করি। তার সন্তান আমার বংশধর হবে, এই প্রতিজ্ঞা করে তুমি আমার কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করতে পার।

অর্জুন তাই করেছিলেন। চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করে তিন বৎসর বাস করেছিলেন মণিপুরে। বভ্রুবাহনের জন্মের পরে আবার বেরিয়ে ছিলেন তীর্থ পর্যটনে। কিন্তু এ অঞ্চল থেকে বিদায় নেবার আগে আর একবার গিয়েছিলেন মণিপুরে। চিত্রাঙ্গদাকে বলেছিলেন, এখন তুমি আমাদের পুত্রকে পালন কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবেন, তখন তুমি তোমার পিতার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে যেয়ো। আমার মা ও ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি আনন্দ পাবে। বিরহে এখন কাতর হয়ো না। তারপর অর্জুন মণিপুর থেকে পশ্চিম সীমান্তের তীর্থ প্রভাসে গিয়েছিলেন।

স্বাতি বলল: কিন্তু আমরা যে চিত্রাঙ্গদার কাহিনী জানি, সে তো অন্যরকম

বললুম: সে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু সেই চিত্রাঙ্গদাই যেন

সত্য। সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা এক দিন অনুভব করেছিলেন যে যৌবনের মায়া দিয়ে তিনি প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছেন, তাঁর 'স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতীন বলে ধিক্কার' দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী ছিলেন না। তাঁর রূপ ছিল 'ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে।' ঘন বনে পূর্ণা নদী তীরে ব্রহ্মচারী অর্জুনকে দেখে তিনি নিজেকে চিনলেন।—

'শিখে পুরুষের বিদ্যা, পরে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলেছিনু যাহা, সেই মুখে চেয়ে, সেই
আপনাতে আপনি অটল মূর্তি হেরি,
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।'

পরদিন প্রাতে পুরুষের বেশ ফেলে দিয়ে চিত্রাঙ্গদা রক্তাম্বর পরলেন। কনক কিঙ্কিনী কাঞ্চি। কিন্তু অর্জুনকে ভোলাতে পারলেন না। অর্জুন বললেন—

'ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'

চিত্রাঙ্গদা নিজেকে তাই ধিক্কার দিয়েছেন—

'পুরুষের ব্রহ্মচর্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে!'

তাই মদনকে বলেছিলেন—

'এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।'

বসন্তকে বলেছিলেন—

'ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার
বিনা দোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ।
করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী।'

বসন্ত বলেছিলেন—

'তথাস্তু। শুধু একদিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।'

এই ধার করা রূপ নিয়ে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তাই এক গভীর বেদনা তাঁর নারী হৃদয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। অন্তরে যদি যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে 'তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়। এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। অভ্যাসের ধূলি প্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই।'

চিত্রাঙ্গদাও তাই শেষ রাত্রির সূর্যোদয়ে তাঁর অবগুণ্ঠন খুলে ফেললেন, বললেন—

'প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,

যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীর শিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম।'

'এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ, এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।'

স্বাতি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল: চিত্রাঙ্গদার কথাই ভাবছ তো! কিন্তু এই চিত্রাঙ্গদা বা বভ্রুবাহনকে আমরা ইন্দ্রপ্রস্থ বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় দেখতে পাই নে তো!

বললুম: উলূপীকেও দেখতে পাই নে। তবে তাঁর পুত্র ইরাবান কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। অষ্টম দিনে শকুনির ছয় ভ্রাতাকে বধ করবার পরে অলম্বুষ নামে এক রাক্ষসের হাতে নিহত হন।

বভ্রুবাহন এই যুদ্ধে যোগ দেন নি কেন?

তা জানি নে।

তবে এইবারে মণিপুরের ইতিহাস বল।

বললুম: এ খুব বেশি দিনের ইতিহাস নয়। এই স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। মণিপুরের অধিবাসীরা বিশ্বাস করেন যে হর-পার্বতী যখন মণিপুরে আসেন লীলার জন্য, তখন তাঁদের নৃত্য দেখতে সমস্ত দেবতারাও এসেছিলেন। সাত দিন সাত রাত্রি নৃত্য হয়েছিল। আর নাগরাজ অনন্ত তাঁর মাথার মণির আলোয় দেশটা উদ্ভাসিত করেছিলেন। এই কারণেই দেশের নাম হয়েছে মণিপুর, আর অনন্ত নাগকেই মহাদেব রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: এ তো ইতিহাস নয়, এ বোধহয় কিংবদন্তী।

বললুম: এর থেকে একটি ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যাচ্ছে। সেটি হল যে মণিপুরও এক সময়ে নাগরাজ্য ছিল, অর্থাৎ এ রাজ্যেও ছিল নাগাদের প্রভুত্ব।

তারপর?

দেবতারা সে সময়ে কয়েক রকমের খেলা খেলেছিলেন।

কী খেলা?

পোলো বাচ আর দড়ির বদলে বাঁশের টাগ অব ওয়ার।

স্বাতি হেসে বলল: এ নিশ্চয়ই তুমি নিজের মাথা থেকে বার করেছ।

বিশ্বাস কর, এ আমার পড়া কথা। কিন্তু কোথায় পড়েছি এখন তা মনে পড়ছে না। মণিপুরে এখনও এই সব খেলা প্রচলিত আছে।

তারপর?

বললুম: অনন্ত নাগ এখানে বেশি দিন রাজত্ব করেন নি। কিছু কাল পরেই তিনি নিজের রাজ্য পাতালে ফিরে গিয়েছিলেন।

রাজা হয়েছিলেন কে?

গন্ধর্ব চিত্রভানু।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: চিত্রভানু!

কিন্তু আমি হেসে বললুম: চিত্রাঙ্গদার বাবার সঙ্গে ভুল কোরো না যেন, তাঁর নাম ছিল চিত্রবাহন।

তিনি কি গন্ধর্ব ছিলেন?

বোধহয় না। তাঁর সম্বন্ধে বা তাঁর পরেরও কোন কথা আর জানা যায় না।

## ২২

মণিপুরের ইতিহাসের আরম্ভ ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই উপত্যকা তখন সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে সাতজনের অধীনে ছিল। পাখাঙ্গবা নামে একজন একটি সিংহাসন দখল করে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই রাজবংশই শেষ পর্যন্ত মণিপুর শাসন করেছেন। এই তথ্য জানা গেছে বছর চল্লিশেক আগে। মাটির নিচে থেকে এই সময়ের কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে সংস্কৃতে লেখা। পাখাঙ্গবার বংশধররাই মণিপুরকে সুসংহত করে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।

এর পরেই ৭৯৯ সালের কথা। খঙ্গটেক্‌চা নামে একজন যোগ্য রাজা হঠাৎ মারা গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে তেষট্টি জন পারিষদ শিকারে গিয়ে জলে ডুবে মারা পড়লেন। এই ঘটনার পরেই দেশ আবার পরাধীন হয়েছিল এগার বছরের জন্য এবং এই ধাক্কা সামলে উঠতে আরও দশ বছর সময় লেগেছিল।

মণিপুরের প্রথম লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় রাজা ইরেঙ্গবা ওরফে ইন্দিবরের সময়ে। তাঁর সময় ৯৮৪ থেকে ১০৭৪ সাল। বুড়ো বয়সেও তিনি লেখাপড়া করতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে রাণী তাঁর একটি তামার মূর্তি তৈরি করান। তাঁর পরে লইয়াম্বা ছিলেন একজন বিজ্ঞ ও শক্তিশালী রাজা। তিনি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার অনেক উন্নতি করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজা থুমোম্বার রাজত্বকালে শানদের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয়। শানদের বাস ছিল ব্রহ্মদেশে চিন্দুইন নদীর উপত্যকায়। মণিপুরীরা এই নদীকে বলে নিঙ্গতি, ইরাবতীর উপনদী। রাজা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ছুশো

বছর পরে কিয়াম্বা নামে তাঁর এক বংশধর এদের জয় করে মণিপুর রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করেছিলেন নিঙ্গতি নদীর তীর পর্যন্ত।

এই ঘটনা ১৪৭০ সালের এবং এই সালটি আর একটি ঘটনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজা কিয়াম্বা তখন থেকে বিষ্ণুর উপাসনা শুরু করেন। এঁরই রাজত্বকালে বাঙলায় আবির্ভাব হয় চৈতন্যদেবের এবং বাঙলার ব্রাহ্মণরা ছোট ছোট দলে মণিপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। ভারতের সংস্কৃতির যে পথ এত দিন রুদ্ধ ছিল, তা খুলে যায় এই সময়ে এবং শানদের প্রভাব ক্রমে ক্রমে খর্ব হতে থাকে। এই শানরাই উত্তর আসামে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় গিয়ে অহোম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৩৬ সালে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা থেকে মণিপুরে আসবার বর্তমান পথ তৈরি করেছিল অহোমরাই। এই দুই রাজার মধ্যে তখন উপহার বিনিময় ছিল।

এর কিছু দিন পরেই মণিপুরীদের বিবাদ শুরু হয় চীনাদের সঙ্গে। মণিপুরীরা মঙ্গোলীয় জাতির ভোটব্রহ্ম শাখার কুকি-চীন গোষ্ঠীর মানুষ, এরা মৈতেই নামে পরিচিত। নিঙ্গতি নদী পার হয়ে উত্তর-পূর্বের আরও কিছু জায়গা দখল করতেই এদের বিবাদ শুরু হয়। ১৬৩১ সালে মণিপুরের একজন শক্তিশালী রাজা চীন সীমান্তে গিয়ে চীনাদের পরাজিত করেন। আর এই বিজয়ের পরে খগেম্বা উপাধি নেন। এ কথাটার মানে চীনা বিজয়ী। এই রাজার সময়েই মণিপুরে পোলো খেলা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য বর্তমান ধারায় খেলা হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দী থেকে।

আর একটি কথা শোনা যায়। চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধে অনেক চীনা সৈন্য বন্দী হয়েছিল। মণিপুরে তারাই গুটিপোকার চাষ ও ইঁট তৈরি করার পদ্ধতি শিখিয়েছিল।

চরই রাঙ্গবা ওরফে পিতাম্বর সিং সিংহাসনে বসেন ১৬৯৮ সালে। এঁর রাজত্বকালও স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ ঘটনায়। রায় বনমালী নামে একজন ব্রাহ্মণ ১৭০৩ সালে পুরী থেকে মণিপুরে এসে

বসবাস শুরু করেন। রাজাকে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং রাজা কৃষ্ণের একটি মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটি নাকি ইম্ফলের ব্রহ্মপুরে এখনও আছে।

১৭০৯ সালে ইনি মারা গিয়েছিলেন। অনেকে বলেন যে বজ্রাহত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে ছিল। তাঁর পুত্র পেনহেইবার রাজা হয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে। লোকে বলে যে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁর সভায় এসে বলেছিলেন, তুমি চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়। অর্জুন তোমার আদিপুরুষ।

এই কথায় তিনি গৌরবান্বিত হয়ে বাঙালী বৈষ্ণবদের কাছে দীক্ষা নিলেন। তাঁর নাম হল গোপাল সিং এবং উপাধি নিলেন গরিব নেওয়াজ। ইতিহাসে তিনি গরিব নেওয়াজ নামেই পরিচিত। তিনি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁর চল্লিশ বছরের রাজত্বকালে নানা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থেকেও তিনি দেশের উন্নতি বিধানে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু একটি মারাত্মক ভুল করে গৃহবিবাদের সূত্রপাত করে যান। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে সন্দেহ করে ১৭৪৮ সালে তিনি রাজ্যত্যাগ করে অজিত শাহ নামে এক রাজকুমারকে সিংহাসনে বসান। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। জ্যেষ্ঠার পুত্রের নাম শ্যাম শাহ এবং কনিষ্ঠার দুটি পুত্রের মধ্যে অজিত শাহই বড়। লোকে বলে যে কনিষ্ঠা পত্নীর অনুরোধে এবং গুরুর প্রভাবে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যাম শাহকে বঞ্চিত করেছিলেন। শ্যাম শাহ এতে আপত্তি করেন নি, কিন্তু অজিত শাহ নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন।

অজিত শাহ রাজা হবার আড়াই বছর পরে গরিব নেওয়াজ শ্যাম শাহকে নিয়ে ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন। কিছু রাজনৈতিক মীমাংসা করাই উদ্দেশ্য ছিল। এই কাজে সফল হয়ে যখন তিনি ফিরছিলেন, তখন অজিত শাহ খবর পেলেন যে তাঁর পিতা এখন শ্যাম শাহকে বঞ্চিত করার জন্য অনুতপ্ত এবং তাঁকেই এখন সিংহাসনে বসাতে চাইছেন। এই খবর পেয়ে অজিত শাহ পথে তাঁদের হত্যা

করলেন এবং এঁদের সঙ্গে মণিপুরের জন কুড়ি পারিষদেরও প্রাণ গেল।

এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কথা মণিপুরে গোপন রইল না। অজিত শাহর পঞ্চম ভ্রাতা ভরত শাহ একটি শক্তিশালী দল গঠন করে রাজাকে নির্বিবাদে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হুকুম করলেন। প্রাণের ভয়ে অজিত শাহ পালাতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু রাজ্য উদ্ধারের জন্য ইংরেজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ভরত শাহর মৃত্যুর পরে শ্যাম শাহর পুত্র জয় সিংহ তখন মণিপুরের রাজা। ইংরেজ জয় সিংহকে সমর্থন করল। জয় সিংহের রাজত্ব কালেই বৈষ্ণবধর্ম রাজধর্ম বলে মেনে নেওয়া হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নতি হয় তাঁরই আমলে।

জয় সিংহের মৃত্যুর পরে আবার শুরু হল ষড়যন্ত্র। পর পর দুজন রাজা নিহত হবার পর তৃতীয় রাজাকে হত্যা করতে না পেরে অন্য এক ভ্রাতা খাল কেটে ব্রহ্মদেশের কুমীরকে ডেকে আনলেন। অন্য দিকে কাছাড় ও ইংরেজ। ব্রহ্মরাজ মণিপুর দখল করেছিল। ইংরেজ যুদ্ধ করল ব্রহ্মদেশের সঙ্গে। সন্ধি হল ইয়ান্দাবোর। এদিকে মণিপুরের এক রাজপুত্রও মণিপুর দখল করে রাজা হয়ে বসলেন। তাঁর নাম গম্ভীর সিংহ। বীর নর সিংহ তাঁর সেনাপতি হলেন।

নর সিংহ যোগ্য সেনাপতি ছিলেন। মণিপুরকে শত্রুমুক্ত করে তিনি রাজ্যের সীমা প্রসারিত করলেন। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হল। কিন্তু দীর্ঘ দিন এই শান্তি স্থায়ী হয় নি। গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর সময়ে তাঁর পুত্র চন্দ্রকীর্তি ছিলেন এক বৎসরের নাবালক। রাজা তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিকে পুত্রের অভিভাবক করে গেলেন এবং নর সিংহ এই বিশ্বাস সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদে আবার ষড়যন্ত্র শুরু হল। নর সিংহের এক ভাই দেবেন্দ্র সিংহ নবীন সিংহ নামে এক অনুচরের পরামর্শে রাণীকে

বোঝালেন যে চন্দ্রকীর্তির বিপদ আসন্ন। কাজেই রাণীও ফাঁদে পা দিলেন। নর সিংহ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন, কিন্তু নেপথ্যে যে দেবেন্দ্র সিংহ ও নবীন সিংহ আছেন তা জানতে পারেন নি। ভয় পেয়ে রাণী চন্দ্রকীর্তিকে নিয়ে কাছাড়ে পালিয়ে গেলেন। নরসিংহ তখন নিজে রাজ্যের রাজা হয়ে বসলেন।

কিন্তু তিনিও বেশি দিন রাজত্ব করতে পারলেন না। বীর ধার্মিক প্রজানুরঞ্জক রাজা যখন সন্ধ্যাবেলায় দেবতার মন্দিরে বন্দনারত, তখন অতর্কিতে নবীন সিংহ তাঁকে খড়্গ হাতে আক্রমণ করলেন। রাজা তাঁর জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর ডান হাতটা কাটা গিয়েছিল। সেই ক্ষত থেকেই তাঁর মৃত্যু হল।

এর পরে দেবেন্দ্র সিংহ রাজা হয়েছিলেন, কিন্তু বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। চন্দ্রকীর্তি কাছাড়ে আত্মগোপন করে ছিলেন, যৌবনে পদার্পণ করেই ফিরে এলেন মণিপুরে। একাকী পদব্রজে নিঃসম্বল অবস্থায় এসে পৌঁছলেন, কিন্তু নিজের পরিচয় দিতেই মণিপুরীরা দলে দলে এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হল। অত্যাচারী দেবেন্দ্র সিংহকে তারা চায় না। চন্দ্রকীর্তিকেই তারা রাজা বলে মেনে নিল। যুদ্ধে জয় হল চন্দ্রকীর্তির, দেবেন্দ্র সিংহ পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন।

এই চন্দ্রকীর্তিরই তৃতীয় পুত্র টিকেন্দ্রজিৎ ছিলেন মণিপুরের সমস্ত প্রজার প্রিয় রাজকুমার। তাঁর মৃত্যুতেই মণিপুরে স্বাধীনতার দীপ চিরদিনের মতো নির্বাপিত হয়েছে।

চন্দ্রকীর্তি রাজত্ব করেছিলেন পঁয়ত্রিশ বছর। মৃত্যুর পূর্বে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্রকে রাজপদে ও দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র কুলচন্দ্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে যান। প্রবীণ সেনাপতির মৃত্যুর পরে টিকেন্দ্রজিৎ নিযুক্ত হলেন সেনাপতির পদে। যেমন সুন্দর সুগঠিত তাঁর দেহ, তেমনি রূপ। সেনাপতির পদে তাঁর নিয়োগের সংবাদ পেয়ে প্রজাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। টিকেন্দ্রজিৎ চারি

দিকের বিদ্রোহ দমন করলেন। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি দিকে দিকে প্রসারিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু ঈর্ষায় জ্বলে উঠলেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই পাক্কাসেনা। টিকেন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। বিরোধ ঘোরালো হয়ে উঠল মণিপুরের এক সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে। টিকেন্দ্র-জিৎ তাকে বিয়ে করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু পাক্কাসেনা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন। যুবরাজ নিলেন টিকেন্দ্রজিতের পক্ষ, আর রাজা পাক্কাসেনাকে সমর্থন করলেন। সমস্ত রাজ পরিবার দু দলে বিভক্ত হয়ে গেল।

এ দিকে তরুণ রাজকুমার জিন্না সিংহের সঙ্গে পাক্কাসেনার ঝগড়া চলছিল। পাক্কাসেনার পরামর্শে রাজা একদিন রাজকুমারকে দরবারে অপমান করলেন। আর যায় কোথা! এক দিন মধ্যরাত্রে রাজকুমার রাজপুরী আক্রমণ করলেন। চারিদিক থেকে গুলি বর্ষণ হচ্ছে দেখে ভীরু রাজা খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন, আশ্রয় নিলেন বৃটিশ রেসিডেন্সীতে। ইংরেজ এই রেসিডেন্সী প্রতিষ্ঠা করেছিল চন্দ্রকীর্তির নাবালক আমলে।

রাজা শূরচন্দ্র শুনেছিলেন যে টিকেন্দ্রজিৎ রাজকুমারের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। ভয়ে তিনি রেসিডেন্ট গ্রিমউড সাহেবকে দেশ-ত্যাগের সংকল্প জানালেন, বললেন যে বাকি জীবন তিনি বৃন্দাবনে কাটাবেন। গ্রিমউড দম্পতি টিকেন্দ্রজিতের পরম বন্ধু ছিলেন, কাজেই তাঁরা সহজেই রাজার প্রস্তাবে রাজী হয়ে রাজাকে রাজ্যের বাহিরে পৌঁছে দিলেন। কুলচন্দ্র এবারে রাজপ্রতিনিধি হলেন, আর টিকেন্দ্রজিৎ পেলেন যুবরাজ্যের পদ।

এই গোলমালে রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত হয় নি। প্রকৃত প্রস্তাবে টিকেন্দ্রজিৎ ছিলেন দেশের শাসনকর্তা, আর তাঁর সুশাসনে প্রজাদের সুখশান্তির কোন অভাব ছিল না। কিন্তু গোলমাল বাধাল ইংরেজ। শূরচন্দ্র বৃন্দাবনে যান নি, কলকাতা থেকে ইংরেজের কাছে তাঁর

নির্বাসনের কথা জানিয়েছিলেন। বড়লাট ল্যান্সডাউন এই গোলমালের মূলে টিকেন্দ্রজিৎ আছেন ভেবে তাঁকেই নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। বড়লাটের আদেশ নিয়ে আসামের চীফ কমিশনার কুইন্টন সাহেব কয়েকশো সেনা ও সেনাপতি নিয়ে মণিপুরে এসে রেসিডেন্সীতে আশ্রয় নিলেন। ঠিক করলেন যে এক দরবারে টিকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করে নির্বাসনে পাঠাবেন।

কুইন্টন সাহেব দরবার ডাকলেন, কিন্তু তাঁদের দুরভিসন্ধি সফল হল না। টিকেন্দ্রজিৎ ইংরেজের ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে দরবারে এলেন না। দরবার পিছিয়ে দেওয়া হল, তবু তিনি এলেন না। বলে পাঠালেন, তাঁর শরীর অসুস্থ। নিরুপায় হয়ে ইংরেজ রাতে রাজপুরী আক্রমণ করল। কিন্তু কোথায় টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ ও তাঁর পরিবারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

ইংরেজ ফিরে যেতেই মণিপুর দুর্গ থেকে মণিপুরীরা বেরিয়ে রেসিডেন্সী আক্রমণ করল। সারাদিন যুদ্ধের পরে ইংরেজ সন্ধি করল। রাত্রে আবার রাজপুরীতে এল সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। টিকেন্দ্রজিৎ বললেন, অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করলেই সন্ধি হতে পারে। কিন্তু ইংরেজ বলল, সে বড় অসম্মানের কথা। কাজেই সন্ধি হল না। টিকেন্দ্রজিৎ ভিতরে চলে গেলেন এবং মণিপুরীরা আবার আক্রমণ করল সাহেবদের। একজন মণিপুরীর বর্শার আঘাতে গ্রিমউড সাহেব মারা পড়লেন, আর বাকি চারজনের মুণ্ড কাটলেন দুর্ধর্ষ সেনাধ্যক্ষ থঙ্গাল জেনারেল। গোলমালের সময় থঙ্গাল তোপখানায় কর্মরত ছিলেন। আচম্বিতে একজন মণিপুরী বৃদ্ধ এসে তাঁকে শাস্ত্রের নির্দেশ শুনিয়ে দিয়েছিল—মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য শত্রুর পাঁচটি মাথা চাই। টিকেন্দ্রজিৎ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, আর থঙ্গালের আদেশে এক ঘাতক সাহেবদের মাথা কেটে নিল।

উত্তেজিত মণিপুরীরা তার পরেও গোলাগুলি চালিয়ে রেসিডেন্সীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বিদেশীরা অনেক দুঃখ-

কষ্টে পায়ে হেঁটে মণিপুর ত্যাগ করেছিল। মিসেস গ্রিমউড তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ভদ্রমহিলাই লিখেছেন My three years in Manipur। তাঁদের নবীন দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি হয়েছিল এই মণিপুরে। তবু তিনি টিকেন্দ্রজিৎকে দায়ী করেন নি তাঁর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য।

কিন্তু ইংরেজ এ অপমান সহ্য করে নি। তারা সৈন্য সামন্ত নিয়ে চারি দিক থেকে মণিপুর আক্রমণ করেছিল। মণিপুরীরা যুদ্ধ করেছিল বীর বিক্রমে, কিন্তু প্রবল ইংরেজ শক্তির সামনে বেশি দিন দাঁড়াতে পারে নি। রাজধানী ইম্ফল জয় করে তারা রাজাকে পায় নি, পায় নি টিকেন্দ্রজিৎ ও থঙ্গাল জেনারেলকে।

এঁদের ধরে দেবার জন্য ইংরেজ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। ধরা পড়েছিলেন রাজা যুগচন্দ্র ও থঙ্গাল জেনারেল, কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ ধরা পড়েন নি। অসুস্থ অবস্থায় তিনি এক গ্রামবাসীর আশ্রয়ে নিরাপদেই ছিলেন। দীর্ঘদিন তাঁর এই পলাতক জীবন ভাল লাগে নি। শেষে তিনি নিজেই ধরা দিয়েছিলেন।

ইংরেজদের বিচারে রাজার নির্বাসন হল, আর ফাঁসি হল টিকেন্দ্রজিৎ ও থঙ্গাল জেনারেলের। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের তেরই অগস্ট বিকেল বেলায় ইম্ফলের পোলো খেলার মাঠ লোকে লোকারণ্য হল। কাতারে কাতারে লোক এল—মণিপুরী আর নাগা কুকি উপজাতীয়রা। বত্রিশ বছরের বীর টিকেন্দ্রজিৎকে তারা শেষ দেখা দেখবে। আর দেখবে অশীতিপর বৃদ্ধ থঙ্গাল জেনারেলকে, একদা যাঁর নামে মণিপুরের মেয়ে পুরুষ আতঙ্কে আত্মগোপন করত। এই জনতার মধ্যেই টিকেন্দ্রজিতের আটজন পত্নী ও একমাত্র পুত্র চৌবারও ছিলেন। সে ছেলের বয়স তখনও দশ বছরও হয় নি।

পাশাপাশি দুটি ফাঁসির মঞ্চ। একজন স্মিত হাস্যে এগিয়ে

গেলেন, আর একজনকে আনা হল ধরাধরি করে। দুজনেই নির্ভীক, মৃত্যুকে তাঁরা হাসি মুখে বরণ করবেন।

আকাশে সূর্যাস্ত হল। স্বাধীন মণিপুরের শেষ সূর্য। মাটি হল অশ্রুসিক্ত আর বাতাস ভারি হল রোদন-রবে।

গৃহ-বিবাদেই মণিপুর রাজসিংসহাসন কলঙ্কিত হয়েছে এবং স্বাধীনতাও লুপ্ত হয়েছে এই গৃহ-বিবাদের জন্য।

## ২৩

আমরা আশা করেছিলুম যে রাতেই আছৌবি সিংএর খবর পাব। হয় তিনি নিজেই চলে আসবেন, নয় একটা খবর পাঠাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা নিরাশ হয়ে রাতের আহার সেরে শুয়ে পড়লুম।

ভোর বেলাতেই মর্নিং টি পাওয়া গেল, তারপর স্নানের জন্যে গরম জল। স্নান সেরে আমরা প্রাতরাশ খেয়ে নিলুম। কাল সন্ধ্যেটা আমরা ঘরে বসে কাটিয়েছি বলে আজ সকালে আমরা একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম।

চঞ্চল সিং কাউন্টারে বসে ছিলেন। আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন: এখনই বেরোচ্ছেন?

বললুম: ঘরে বসে থেকে কী করব!

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: তাহলে চলুন। এই সময়ে আমার গাড়ির জন্যেও তাগাদা দিয়ে আসি।

বলে আমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লেন।

একটুখানি পথ এগিয়েই আমরা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের অফিস দেখতে পেলুম। গেট খোলা আছে, বাস দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীদের নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবার জন্য। যাত্রীরাও এসে গেছেন। সকাল নটা নাগাদ শিলচরের প্লেন ছাড়বে। স্বাতি বলল: এখন কি আমরা টিকিট পাব?

কেন পাবেন না?

বলে চঞ্চল সিং ভিতরে ঢুকে পড়লেন। তিনি এখানে সকলেরই পরিচিত। সবার সঙ্গেই হেসে কথা কইলেন। অল্প সময়েই আমরা দুখানা টিকিট পেয়ে গেলুম। চল্লিশ টাকা করে টিকিট, কুড়ি মিনিটেই ইম্ফল থেকে শিলচরে পৌঁছে দেবে। এর চেয়ে কম দামের টিকিট

নাকি এ দেশে আর নেই। একজন বললেন: এ টিকিট আপনারা কলকাতাতেও পেতেন।

আমি বললুম: তাহলে কি আমরা আগরতলা থেকে কলকাতার টিকিট এখানেই কাটব?

স্বাতি বলল: সেটা সুবুদ্ধির কাজ হবে না।

কেন?

ফেরার তাড়ায় আমাদের বেড়ানোর আনন্দ কিছু খর্ব হবে। আগরতলায় পৌঁছবার পরে আমরা কলকাতার টিকিট কাটব।

চঞ্চল সিং বললেন: সেখানে টিকিট পেতে কোন অসুবিধা হবে না। বড় বোয়িং প্লেন এখন যাতায়াত করছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমাদের আর একটুখানি হাঁটতে হল। বড় রাস্তা থেকে একটা গলির ভিতরে ঢুকেই গ্যারেজ। গাড়ি দেখে চঞ্চল সিং চমকে উঠলেন: আজও সব খোলা আছে!

কিন্তু মিস্ত্রী নির্বিকার ভাবে বলল: কাজ তো কম নয়!

আমাদের দেখিয়ে চঞ্চল সিং অনেক বোঝালেন যে গাড়িটা আজ খুবই দরকার, দুপুরবেলায় মইরাঙে যেতে হবে। কিন্তু মিস্ত্রী বলল, কাল দুপুরের আগে কিছুতেই হবে না।

অনেক দরাদরি হল। কিন্তু মিস্ত্রী অটল। সে বলল: এ হল গাড়ির কাজ, ফাঁকির কাজ নয়।

চঞ্চল সিংও নাছোড়বান্দা। সে বলল: আমার ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে সাহায্য করবে। কিন্তু গাড়িটা কাল সকালেই দিতে হবে।

তারপরে বড় রাস্তায় এসে আমাদের বললেন: এদের কথার কোন ঠিক নেই, আর সব সময়েই দাম বাড়ানো কথা।

আমি বললুম: আমরা তাহলে মইরাঙ ঘুরে আসি।

না না, আজ যাবেন না। কালকের দিনটা যখন আছেন, তখন কালকের অবস্থা দেখে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

চঞ্চল সিংহ একটা সাইকেল রিক্সা ধরে আমাদের গোবিন্দজী ও হনুমানজীর মন্দির দেখিয়ে খৈরামবান্ধ্ বাজারে আসবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম।

গোবিন্দজীর মন্দিরে পৌঁছতে আমাদের অনেকটা সময় লাগল। শহরটা যত ছোট মনে হয়েছিল তা নয়, বেশ ছড়ানো শহর। প্রশস্ত পথগুলো পরিচ্ছন্ন। প্রধান রাজপথের একধারে বড় বড় ঘর বাড়ি সরকারী দপ্তর ব্যাঙ্ক ট্রেজারি রাজভবন, আর অন্য ধারে সরু একটি নদীর মতো জলধারা বয়ে যাচ্ছে সরল রেখায়। অনেকটা পথ এগিয়ে যাবার পরে পুলের উপর দিয়ে এই জলধারা পেরিয়ে মন্দিরের পথ ধরতে হয়!

এ শুধু মন্দিরের পথ নয়, এ হল মণিপুর রাজপ্রাসাদের পথ। একটি প্রশস্ত ময়দানের এক পাশ দিয়ে আমাদের রিক্সা এসে একটা বড় গেটের সামনে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম।

রিক্সাওয়ালা বলল: এখানে চটি জুতো খুলে ভেতরে যান।

গুম্‌টির পাশে যে প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল সে নির্বিকার ভাবে সমর্থন করল তাকে। আমরা তাদের নির্দেশ পালন করে ভিতরে প্রবেশ করলুম।

বিশাল এক মাঠ পেরিয়ে অনেক দূরে যে প্রাসাদ দেখা গেল, সেটিই মণিপুরের রাজপ্রাসাদ। কিন্তু এই প্রাসাদ পরিত্যক্ত বলে মনে হল। বাঁ দিকে গোবিন্দজীর মন্দির দেখা যাচ্ছিল। প্রভাতের প্রসন্ন রৌদ্রে মন্দিরের স্বর্ণ শিখর দুটি এখন ঝকমক করছে। সেও খানিকটা দূরে। পথের দিকে চেয়েই বোঝা যায় এ পথে যাত্রীর আনাগোনা কম। গেটের বাহিরে জুতো রেখে যাবার নিয়ম হয়েছে কেন, তা বোঝা গেল না।

ছোট একটি গেট দিয়ে আমরা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলুম। মূল মন্দিরে রাজপরিবারের ইষ্ট দেবতা গোবিন্দজীর মূর্তি, অন্য মন্দিরে গৌর নিতাই প্রভৃতির মৃন্ময় মূর্তি আছে। এরই মুখোমুখি

বিরাট নাটমন্দির। নৃত্যগীত ধর্মালোচনার উপযুক্ত জায়গা। মন্দিরটি প্রাচীন বলে মনে হল না।

স্বাতি বারান্দায় উঠে প্রণাম করে এল। আমি প্রণাম করলুম নিচে থেকে। তারপরে বেরিয়ে এলুম।

ফেরার পথে স্বাতি বলল: এ-ই গোবিন্দজীর মন্দির!

বললুম: আমিও হতাশ হয়েছি।

কেন?

মণিপুরের ইতিহাসে পড়েছিলুম যে দুশো বছর আগে গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গরিব নেওয়াজের নাতি রাজা জয় সিং। এ মন্দির কি দুশো বছরের পুরনো বলে বিশ্বাস হয়?

স্বাতি বলল: হয় না বলব না। সংস্কার করে রাখলে এ রকম হতে পারে।

সহসা আমার মনে পড়ে গেল যে ইম্ফলের উপকণ্ঠেই আছে কাঞ্চীপুর নামে একটি জায়গা। ইণ্ডো-বার্মা রোডের ধারে। জয় সিংহের আমলে মণিপুরের রাজধানী ছিল সেখানে এবং গম্ভীর সিংহের আমলেও ছিল। সেই এলাকাতেই মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে বলে স্থির হয়েছে।

আরও একটি কথা আমার মনে পড়ে গেল। নলিনীকুমার ভদ্রের লেখা 'বিচিত্র মণিপুর' গ্রন্থে পড়েছিলুম যে বর্তমান রাজার প্রাসাদ থেকে সিকি মাইল দূরে ছিল মণিপুরের প্রাচীন প্রাসাদ ও দুর্গ। বৃটিশ রেজিমেণ্টের ময়দানের সামনে দিয়ে এই পুরনো রাজপ্রাসাদের দিকে যেতে হয়। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি বিরাট দুর্গ, দরবার-গৃহ ঠিক প্রবেশ পথের মুখেই, খড় দিয়ে ছাওয়া তার ছাদ। এক সময়ে নাকি সামনে পাথরের দুটি বিরাট ড্র্যাগন ছিল, এই মূর্তির সামনেই অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হত। জল্লাদের কাজ করত ভীমদর্শন নাগারা। ড্র্যাগনকে এরা বলে নংসা, আর দরবারকে বলে কংলা। এখন আর নংসা দুটো সেখানে নেই। কংলার সামনে হয় লামচেন। লামচেন

মানে সিধে সড়কের উপরে আধ মাইল লম্বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা। দুর্গের পিছনে আছে শুষ্ক পরিখা, তারও পিছনে ক্ষীণস্রোতা ইম্ফল নদী। মণিপুরের রাজারা যখন এই দুর্গ সংলগ্ন প্রাসাদে বাস করতেন, পিছনের পরিখা তখন জলে পূর্ণ থাকত, আর বাচ খেলার উৎসব হত প্রতি বছরে। রাজা নিজে এসে নৌকোর হাল ধরতেন।

মণিপুরের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ দেখে নাকি আশ্চর্য হতে হয়। খড়ের চালের রাজপুরী, তার পাশেই গোবিন্দজীর মন্দির আর নাট-মন্দির। মন্দিরের দেওয়াল থেকে এখন চুন বালি খসে পড়ছে।

এই বর্ণনা দিয়েছেন নলিনীকুমার ভদ্র। আমার মনে হল যে জয়সিংহের নির্মিত মন্দির আছে পুরনো প্রাসাদের সংলগ্ন। এ নূতন মন্দির, পরবর্তী কোন রাজা এই প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করেছেন।

জয়সিংহ খুব ঘটা করে গোবিন্দজীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের রাস-পূর্ণিমায়। সে দিন তাঁর নাট-মন্দিরে যে রাস-নৃত্য হয়েছিল তা জয়সিংহেরই পরিকল্পনা। গানের নট পালা তাঁরই কীর্তি, তাঁরই সময়ে মণিপুরী সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ হয়। তিনি চন্দ্রাব্দের প্রতিষ্ঠাতা এবং মণিপুরী পঞ্জিকাও প্রবর্তন করেন।

আমি কথা বলছিলুম না দেখে স্বাতি প্রশ্ন করল: তুমি কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে!

বললুম: এ মন্দির পরবর্তী কালে তৈরি বলে মনে হয়। জয়সিংএর মন্দির আছে পুরনো রাজপ্রাসাদে। তার এখন জীর্ণ দশা বলে পড়েছি।

তাহলে এসো না, সে মন্দির কোথায় তা এদের কাছে জেনে নিই।

আমরা গেটের বাহিরে চলে এসেছিলুম। সামনে আমাদের রিক্সাওয়ালাকে দেখে স্বাতি তাকেই কথাটা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু সে তাকে কিছুতেই কথাটা বোঝাতে পারল না। প্রহরী এগিয়ে

এসেছিল, সে হিন্দীতে বলল: ও আপনাদের ভাষা বুঝতে পারছে না।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: সে কি, নিজের কথা তো সে আমাদের বলতে পেরেছিল! জুতো খুলে যাবার কথা! ' ·

সে কথা সে আদৌ বলেছিল কিনা তাতেই আমার সন্দেহ হল। ঠিক কী বলেছিল তা মনে পড়ল না। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট মনে পড়ল যে চঞ্চল সিং তার সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলেছিলেন তা বাঙলা নয়, হিন্দীও নয়। তাঁর কথাও আমরা বুঝতে পারি নি।

স্বাতি বলল: হিন্দী জানে এ রকম একটা লোক আমাদের নেওয়া উচিত ছিল।

বললুম: এখন আর আপসোস করে লাভ নেই।

তারপরে আমাদের প্রশ্নটা জানালুম সরকারী প্রহরীকে। সে হিন্দী জানে, কিন্তু মণিপুরের কোন খবর রাখে না। বলল: আমি তো আর্মির লোক, নতুন এসেছি ইম্ফলে।

কাজেই আর উপায় নেই, সাইকেল রিক্সায় বসে ফিরতে হবে। কিন্তু রিক্সাওয়ালা ফেরার পথ না ধরে মাঠের অন্য ধার দিয়ে অগ্রসর হল। কোথায় যাচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করেও লাভ নেই। সে আমাদের প্রশ্নটা বুঝতেই পারবে না।

স্বাতি বলল: তোমার কি আরও কিছু জানবার ছিল?

বললুম: ছিল বৈকি। পুরনো রাজবাড়ি থেকে রাজকুমার টিকেন্দ্রজিতের পরিত্যক্ত বাড়িটিও নাকি দেখা যায়। তারপর বৃটিশ রেসিডেন্সী তো ছিল শহরের মাঝখানেই। তারই কাছে পোলো খেলার মাঠ। পোলো আর হকি শুনেছি মণিপুরেরই খেলা।

স্বাতি বলল: দুটোই এক রকম। তফাৎ শুধু এইটুকু যে পোলো খেলা হয় ঘোড়ায় চেপে।

হেসে বললুম: তার মানে পোলো বড়লোকের খেলা, আর

হকিটা গরিবের। কিন্তু মণিপুরী কায়দায় হকি খেলা বোধহয় আর কোনখানে হয় না।

কী রকম?

একটা ছবি দেখেছিলুম। তাতে একটা ছোট বল নিয়ে দু দলে ছুটোছুটি হয় না। খেলা হয় জোড়ায় জোড়ায় এক সঙ্গে। দুজনের হাতেই হকি স্টিক থাকে। কিন্তু ছবিতে কোন বল দেখতে পাই নি। খেলোয়াড়দের খালি গা আর খালি পা। কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়ানো। হাতে লাঠি নিয়ে দুজনে যেন লড়ছে এমনি ভাব।

স্বাতি বলল: কিন্তু পোলো খেলাটা নিশ্চয়ই এক রকম।

পোলো খেলা নিঃসন্দেহে মণিপুর থেকেই বাইরে গেছে। মণিপুরে এই খেলার নাম কাঞ্জাই। মণিপুরীরা এক সময়ে অপরাজেয় ছিল এই খেলায়।

আমাদের রিক্সাওয়ালা বেশ কষ্ট করে রিক্সা টানছিল। পথ ভাল নয়। তারপর বড় রাস্তার কাছে এসে রিক্সা থেকে নামতে হল। তাকে টেনে তুলতে হবে রিক্সা। উপরে উঠে সে শহরের দিকে না গিয়ে অন্য দিকে চলল। স্বাতি কিছু ভয় পেয়ে বলল: কোথায় নিয়ে চলল আমাদের?

বললুম: বোধহয় হনুমানের মন্দিরে। চঞ্চল সিং তো তাই বলেছিলেন!

বেশি দূর আমাদের যেতে হল না। অল্প একটু এগিয়েই রিক্সাওয়ালা আমাদের হনুমানের মন্দির দেখিয়ে দিল।

রাস্তার অন্য ধারে মন্দির। এ মন্দিরও বেশি পুরনো নয়। কিন্তু অসংখ্য বাঁদর আছে এই মন্দিরে। তাই অনেকেই এই মন্দিরকে মাঙ্কি টেম্পল বলে। তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সেরে আমরা পালিয়ে এলুম।

এবারে আর ঘোরা পথে নয়। সোজা পথেই আমরা ফিরতে লাগলুম। এক সময়ে আমরা পুরনো রাস্তায় এসে পৌঁছে গেলুম।

পুল পেরিয়ে এলুম শহরের বড় রাস্তায়। মাঝে মাঝে ট্র্যাফিক পুলিস আছে, সেখান থেকে নতুন রাস্তা বেরিয়েছে। কিন্তু কোন্ দিকে গেছে তা জানবার উপায় নেই। রিক্সাওয়ালা আমাদের প্রশ্ন বুঝতেই পারবে না। পথের ধারে শীর্ণ নদীর মতো যে জলধারা দেখতে পাচ্ছি, তাতেই বাচ খেলা হত কিনা কে জানে! এখন কি আর সে খেলা হয় না? কখন হয়?

নতুন জায়গায় এলে আমার অনেক প্রশ্ন মনে আসে। কিন্তু সঙ্গে গাইড থাকে না বলে জেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। পরে এ সব কথা ভুলে যাই। মনে পড়লেও বোঝাতে পারি না, উত্তর পেলেও তা নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে পারি না।

রিক্সাওয়ালা আমাদের খৈরামবন্ধ্ বাজারে নিয়ে এল। আমরা নেমে পড়লুম। চঞ্চল সিং আমাদের চার টাকা দিতে বলেছিলেন, আমরা তাই দিলুম।

প্রশস্ত পথের উপরে ছোট বড় অনেক দোকান। পথের নাম বোধহয় বীর টিকেন্দ্রজিৎ রোড। কিন্তু মেয়েদের কোথাও দেখতে না পেয়ে স্বাতি বলল: লেডিজ মার্কেটটা কোথায়?

পথচারীকে প্রশ্ন করে সে কথা জেনে নিতে হল। পথ ছেড়ে দিয়ে ভিতরের একটা বাজারে ঢুকে আমরা হতবাক হয়ে গেলুম। একটা বিরাট এলাকায় সারি সারি দোকান। কেউ উপরে বাঁধানো জায়গায় বসেছে, কেউ নিচে মেঝের উপরে। সবাই মেয়ে, নানা বয়সের মেয়ে, পুরুষ নেই একজনও। ক্রেতারাও দেখছি মেয়ে। হঠাৎ এক-আধজন পুরুষ দেখছি বাজারের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে। তারা ক্রেতা নয়, এক ধার দিয়ে ঢুকে অন্য ধার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পথ সংক্ষেপের জন্য। বিক্রেতারা সবাই মণিপুরী তাঁত বস্ত্র নিয়ে বসেছে। মণিপুরী মেয়েরা লুঙ্গির মতো যে বস্ত্র ব্যবহার করে, ফালেক নামের সেই লুঙ্গি আছে নানা রঙের নানা ডিজাইনের। ভাল ফালেকের অনেক দাম। এ ছাড়া গায়ের চাদর বা শাল আছে নানা

ধরনের—নাগা ও মণিপুরী ডিজাইনের। নাগারা লাল ও কালো রঙ বেশি পছন্দ করে। বড় চাদর ব্লাউন পিস গামছা বেড কভার আরও কত কি।

স্বাতি যখন এই সব দেখছিল, আমি তখন অন্য কথা ভাবছিলুম। মণিপুরে কি মেয়ের সংখ্যা বেশি! তা না হলে মেয়েরা এত বড় একটা বাজার চালাবে কেন? পুরুষরা কী করে? শহরের ধারে কাছে তো কোন বড় কলকারখানা নেই, নেই অন্য কোন জীবিকার উপায়! পুরুষরা তাহলে কোথায় গেল!

হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। মণিপুর নামে ইংরেজী একটি পুস্তিকায় ঝালাজিৎ সিং লিখেছিলেন যে পুরাকালে নাকি মেয়েরা এ সব কাজ করত না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দে বর্মার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকলে রাজা দেশের পুরুষদের সেনাদলে টেনে নিতে লাগলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনেই তখন দেশের মেয়েদের এ কাজে নামতে হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন আর এর প্রয়োজন রইল না, তখনও এই ব্যবস্থা রয়ে গেল।

এ দেশের পুরুষেরা তাহলে কী করছে! অলস ও বিলাসী হয়ে কি পড়ছে না! এদের সমাজব্যবস্থা জানি নে বলেই এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা আমার উচিত হবে না।

স্বাতি হঠাৎ পিছন ফিরে বলল: কিছু পছন্দ হয় তোমার?

আমি কিছু না দেখেই বললুম: না।

ঠিক বলেছ।

বলে স্বাতি এগিয়ে চলল।

আমি বললুম: তোমার কিছু পছন্দ হয় নি?

স্বাতি বলল: হবে কী করে! আমার কথা এরা বোঝে না, আর আমি বুঝি না এদের কথা।

লোকে তাহলে কেনাকাটা করে কী করে?

এ বাজার তো টুরিস্টদের জন্যে নয়, এ বাজার এদের নিজেদের জন্যে।

বলে স্বাতি অন্য ধার দিয়ে আর একটা বাজারে ঢুকে পড়ল। এ বাজার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজার। এখানেও সব মেয়ে। তারা মাছ তরকারি সুঁটকি মাছ নিয়েও বসেছে। দুটো বড় বড় রুই মাছ দেখে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল দাম কত?

কিন্তু সেই সমস্যা! তবে এবারের প্রশ্নটা সে বুঝতে পেরেছে। ছোট মাছটা দেখিয়ে নিজের দশটা আঙুল দেখাল আটবার। মানে আশি টাকা।

আশি টাকা কিলো, না গোটা মাছের দাম আশি টাকা!

একজন ইংরেজী জানা পুরুষ ক্রেতা আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারলেন। কাছে এসে বললেন: এরা মাছ কেটে বিক্রি করে না বলে গোটা মাছের দাম বলছে। মাছটাব ওজন কিলো চারেক হবে ভেবে আশি টাকা বলেছে। দরাদরি করলে দাম কিছু কমবে।

কিন্তু এত বড় মাছ নিয়ে লোকে কী করবে?

ভদ্রলোক বললেন: এ সব মাছ হোটেলে যায়।

বেলার কথা মনে পড়ে গেল স্বাতির। বলল: মাছ-ভাত পাওয়া যায় এমন কোন ভাল হোটেল আছে কাছে?

ভদ্রলোক বললেন: অনেক আছে। সামনের রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে যান না।

বলে একটা হোটেলের নাম বললেন।

বেলার কথা মনে ছিল না তো! চল এই বারে।

বলে স্বাতি আমাকে ডেকে নিয়ে বাজার থেকে বেরিয়ে এল। আকাশ থেকে মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড তখন আগুন বর্ষণ করছিলেন। হেমন্তের পথও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ক্ষিধেও পেয়েছিল। ক্ষুধার কথা মনে পড়লেই যে ক্ষুধা বাড়ে তা বুঝতে পারলুম।

# ২৪

দুপুরের আহার সেরে হোটেলে ফেরার সময়ে বাজারের প্রধান রাজপথের ধারে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। তরুণ তরুণীদের একটি শোভাযাত্রা চলেছে রাজপথ ধরে। তাদের শ্লোগান বুঝতে পারলুম না। কিন্তু কিছু দোকানপাট যে বন্ধ হয়ে গেছে তা দেখতে পেলুম।

ব্যাপারটা কী তা জানবার চেষ্টা করলুম। আমাদের ইংরেজী ও হিন্দী প্রশ্ন অনেকেই বুঝতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত এক বইএর দোকানে ঢুকে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম যে এই শোভাযাত্রা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের। কিছু দিন আগেও তারা এই রকমের শোভাযাত্রা বার করেছিল, শিক্ষা মন্ত্রী তাদের দাবী মেনে নিয়ে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি এখনও কার্যকর হয় নি বলে তারা প্রতিবাদ জানাতে বেরিয়েছে। তাদের দাবী বা প্রতিশ্রুতির কথা ইনি জানেন না।

পথের ধারে আমরা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর শোভাযাত্রা আমাদের ছাড়িয়ে চলে যাবার পরে আমরা হাঁটতে শুরু করলুম। পথঘাট না চিনলে এখানে রিক্সায় উঠে বসা চলে, সে-ই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেবে। কিন্তু স্বাতি রিক্সায় উঠতে রাজী হল না, বলল : না হাঁটলে পথঘাট চেনা যায় না।

মহাত্মা গান্ধী অ্যাভেনিউএ আমাদের হোটেল। বেশি দূরে নয় জেনেই আমরা হাঁটতে শুরু করেছিলুম। দুধারের দোকানপাট দেখতে দেখতে ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে আমরা হোটেলে পৌঁছে গেলুম।

চঞ্চল সিং আমাদের দেখতে পেয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন : এতক্ষণ আপনারা বাইরে ছিলেন !

স্বাতি বলল : আমাদের খাবার জন্যে ভাববেন না, আমরা খেয়ে এসেছি।

না না, সে জন্যে ভাবছি না। আর খাবার এখানে সব সময় পাবেন।

তবে ?

শহরে যে গোলমাল শুরু হয়েছে !

কী রকম ?

ছাত্র আন্দোলন। আমি ভয় পেয়েছিলাম, আপনারা হয়তো এরই মধ্যে পড়ে গেছেন।

আমি হেসে বললুম : তারা তো খুব শান্তিপূর্ণ ভাবে শোভাযাত্রা করে গেল।

কিন্তু চঞ্চল সিং সভয়ে বললেন : না না, আপনারা জানেন না ওদের। শহরের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে, পথে আর কেউ বেরোবে না। আপনারাও বেরোবেন না।

আচ্ছা।

বলে আমরা যখন উপরের দিকে পা বাড়ালুম, চঞ্চল সিং আবার চেঁচিয়ে উঠলেন : ও ভাল কথা। সকালে আপনারা বেরিয়ে যাবার পরেই আছৌবি সিং আপনাদের খোঁজ করতে এসেছিলেন। আপনাদের না পেয়ে বিকেলে আবার আসবেন বলে গেছেন।

খুশী হয়ে স্বাতি বলল : তাহলে তো খুবই ভাল হয়।

কিন্তু—

কিন্তু আবার কী ?

এ রকম গোলমালের দিনে তিনি বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন কি !

তাহলে আমরাই তাঁর কাছে যাব।

স্বাতির এই কথা শুনে চঞ্চল সিং আমার মুখের দিকে তাকালেন দু চোখ বিস্ফারিত করে। তাই দেখে আমি বললুম : এ রকম শোভাযাত্রা কলকাতায় আমরা রোজ দেখছি।

চঞ্চল সিং বললেন : না না, এখানে এ রকম দুঃসাহসের কাজ করবেন না।

আমরা হাসতে হাসতে উপরে আমাদের ঘরে চলে গেলুম।

কিছুক্ষণ পরেই আমাদের রুম-বয় এসে খবর দিল, টেলিফোন এসেছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : এখানে আমাদের টেলিফোন করবে কে ?

বোধহয় আছৌবি সিং।

বলে আমি নিচে নেমে গেলুম।

সত্যিই আছৌবি সিং আমাকে ডাকছিলেন। বললেন, আজকের যা অবস্থা তাতে তিনি আমাদের কাছে আসতে পারবেন না। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে, কলেজ থেকেই তিনি টেলিফোন করছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছেন।

আমার হাসি পেয়েছিল তাঁর কথা শুনে। কিন্তু খুব সংযত ভাবে বললুম : আপনি ভাববেন না, অবস্থা ভাল দেখলে আমরাই আপনার কাছে গিয়ে উপস্থিত হব।

তিনি আর্ত স্বরে বলে উঠলেন : না না, অমন কাজও করবেন না।

বলে টেলিফোন রেখে দিলেন।

আছৌবি সিংএর কথা শুনে স্বাতি বলল : তোমার নিজের কি ভয় হচ্ছে ?

ভয় কিসের ! কথা দিয়ে কথা না রাখলে প্রতিবাদ করবে না ছাত্ররা ! তাদের উপরে আক্রমণ না চালালে তারা কখনও অসংযত আচরণ করবে না।

স্বাতি বলল : বিকেল বেলায় তাহলে আমরাই বেরোব। এই অবসরে তোমার আর কিছু জানা থাকলে বল।

বললুম : মণিপুরের কয়েকটা গল্প তোমাকে বলতে পারি।

গল্প !

গল্প ঠিক নয়, কিংবদন্তী বা ফোক-টেল বলতে পার। এখানকার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী।

স্বাতি বলল : তাই বল।

প্রথমেই আমার সব চেয়ে জনপ্রিয় কাহিনী খাম্বা ও থইবির গল্প মনে পড়েছিল। কিন্তু তার আগে আমি এ রাজ্যের পার্বত্য আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত গালগল্প বললুম। নাগা কুকি ও মণিপুরীরা বিশ্বাস করে যে তাদের পূর্বপুরুষ এক।

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল : নাগা কুকিরাও তো মণিপুরী।

বললুম : ঠিক বলেছ। মণিপুরী কথাটার প্রয়োগ ঠিক হয় নি, মৈতেই বললে বোধহয় ঠিক হত। নাগা কুকি ছাড়া আর যারা মণিপুরী ভাষায় কথা বলে আমি তাদেরই বোঝাতে চেয়েছি।

স্বাতি হেসে বলল : তার পরে বল।

বললুম : একজনেরই তিন ছেলে ছিল। বড় ছেলে নাগা, মেজ হল কুকি আর মৈতেই হল ছোট ছেলে।

মণিপুরীই বল, আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।

বললুম : এদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল। দুই পাহাড়ের মধ্যে একটা ছোট নদী, এক লাফে সেই নদীর ওপর দিয়ে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে হবে। বড় ছেলে নাগার শক্ত সমর্থ চেহারা, এক লাফেই সে নদী পেরিয়ে গেল। কিন্তু মেজ ছেলে কুকি তা পারল না, তার একটা পা ওপারের জলে পড়ল। কিন্তু ছোট ছেলে মণিপুরী নদীর মাঝখানেই পড়ে গেল।

কী হল তার ?

হেসে বললুম : কি আর হবে! মণিপুরীদের তাই এখনও রোজ

জলে স্নান করতে হয়, কুকিরা স্নান করে মাঝে মাঝে, আর নাগাদের স্নান না করলেও চলে।

স্বাতিও হেসে বলল : বেশ গল্প তো!

বললুম : এর পরের গল্পটা বলবার আগে অন্য একটি কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ভুলে যাবার আগে তোমাকে তাই বলি।

বল।

কোথায় পড়েছি তা মনে করতে পারছি না। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে মণিপুরীরা বৈষ্ণব হবার আগে বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু এই মতের সপক্ষে তাঁদের যুক্তি কী তা এখন মনে পড়ছে না।

তুমি কি এ কথা মানতে পার নি?

না।

কেন?

আমি মণিপুরের একটা তাম্রলিপির কথা শুনেছি। সেটা অষ্টম শতাব্দীর। সেই তামার ফলকে নাকি শিব গণেশ ও দেবীর পূজার পদ্ধতি লেখা আছে, আর এও আছে যে একবার হরির পায়ে পৌঁছতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

এর থেকে কী প্রমাণ হয়?

প্রমাণ এই কথাই হয় যে অষ্টম শতাব্দীতেও মণিপুরীরা হিন্দু ছিল, হয়তো তার আগে থেকেও ছিল। অন্তত তারা বৈষ্ণব হবার আগে বৌদ্ধ ছিল না। কোন দিন ছিল কিনা তার কোন লিখিত প্রমাণ নেই। তার কারণ এই তাম্রলিপির পূর্বের কোন লিপি মণিপুরে আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

স্বাতি বলল : নিঃসন্দেহে তোমার কথা মেনে নিলাম। এবারে গল্পটা বল।

বললুম : তার আগে আরও কিছু বলব।

বল।

মণিপুরী আদিবাসীদের মধ্যে যে সব গল্প প্রচলিত আছে তার

থেকে জানা যায় যে পুরাকালে তাদের অনেক দেবতা ছিল। দেবতাদের রাজাকে তারা সোরাবেন বলত, তিনি ছিলেন 'বৃষ্টির দেবতা এবং বজ্র তাঁর অস্ত্র। এই দেবতা কি আমাদের বৈদিক বা পৌরাণিক ইন্দ্র নন ?

কোন সন্দেহ নেই।

বললুম : তাঁর রাজত্ব ছিল মেঘের ওপরে, কিন্তু তিনি পৃথিবীর একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। ইনি ছাড়াও তাদের দেবতা ছিলেন সূর্য ও অগ্নি। যমরাজেও তাদের বিশ্বাস ছিল। মাটির নিচে ছিল যমের রাজত্ব। মৃত্যুর পরে একটা নদী পেরিয়ে মানুষকে তাঁর রাজ্যে যেতে হত। পুরাণেও তো আমরা পাই যে বৈতরণী পেরিয়ে যমরাজের রাজ্য।

স্বাতি বলল : তোমার যুক্তি আরও মজবুত হল।

এর মানে কি এই নয় যে মণিপুরে আর্য সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল বহু যুগ আগে এবং এখানে আর্য সভ্যতা ও হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কিছু কখনই ছিল না!

এ কথাও মেনে নিলাম।

এইবারে তবে খাম্বা ও থইবির গল্প শোন। কিন্তু তার আগে মইরাঙের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

এই গল্পের সঙ্গে মইরাঙের ইতিহাসের কী সম্পর্ক ?

বললুম : থইবি ছিল মইরাঙের রাজকন্যা। রাজার মেয়ে নয়, রাজার ভাই যুবরাজের মেয়ে।

আর খাম্বা ?

সেও এক রাজপুত্রের নাতি। সেই রাজপুত্র পালিয়ে এসে এ দেশের মেয়ে বিয়ে করে কোন রকমে দিনপাত করছিল। তার ছেলে এ দেশের রাজার প্রাণ বাঁচিয়েছিল একবার। তারই এক মেয়ে আর এক ছেলে। মেয়েটি বড়, ছোট হল ছেলে। ছেলের নামই খাম্বা। বড় গরিব তারা। বাপের মৃত্যুর পরে কোন রকমে তাদের সংসার চলত।

স্বাতি বলল : বুঝেছি। এ একটা প্রেমের গল্প হবে। রাজকন্যার সঙ্গে এই গরিব ছেলের প্রেম।

হেসে বললুম : সবটা বুঝে ফেললে তো গল্প বলার প্রয়োজনই যাবে ফুরিয়ে।

তাহলে তুমিই বল। আমি আর অনুমান করব না।

তবে ইতিহাসের কথাটা সংক্ষেপে বলতে দাও।

বল।

বরাহের রূপ ধারণ করে ভগবান থাং জিং মর্ত্যে এসেছিলেন। তাঁরই হাতে মইরাঙের সৃষ্টি।

এ যে বরাহ অবতারের গল্প !

কতকটা তাই। একবার দুবার নয়, থাং জিং সাতবার মইরাঙে এসে রাজত্ব করেছিলেন। কলিযুগের প্রথমে যিনি রাজা হলেন তাঁর সুশাসনে প্রজারা থাং জিংকেই ভুলে গেল। এই নিয়ে অনেক ঘটনা। সার কথা এই যে এঁরই নাতি যখন মইরাঙের রাজা, তখনই খাম্বার বাবা তাকে শিকারের সময় বাঘের হাত থেকে রক্ষা করে।

স্বাতি বলল : তুমি একে ইতিহাস বলছ ?

বললুম : ইতিহাস বলছি এই কারণে যে সত্যিই মইরাঙে যে এক সময় রাজা ছিল তা ইতিহাসেই পাওয়া গেছে। ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দে এক মৈতাই রাজা মইরাঙের রাজাকে যুদ্ধে হত্যা করেন। সেই যুদ্ধে যে সব সেনানায়ক মারা যায়, তাদের মুণ্ডগুলি এক জায়গায় পুঁতে রাখা হয়েছিল। সেই জায়গাটি নাকি এখনও চিহ্নিত হয়ে আছে।

তিনিই বোধহয় মইরাঙের শেষ রাজা ?

বললুম : না। তার পরেও কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। চন্দ্রকীর্তি সিং এক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। তারপর সাতাশ বছর আর কেউ রাজা ছিলেন না। চন্দ্রকীর্তি সিংএর কথা তোমার মনে আছে ?

না।

রাজপরিবারের ষড়যন্ত্র থেকে এঁকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর মা ছেলেকে নিয়ে কাছাড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন ১৮৪৮ সালে। ছ বছর পরে যৌবনে পদার্পণ করে তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় মণিপুরে ফিরে এসেছিলেন। তারপর প্রজাদের সহায়তায় সিংহাসন উদ্ধার করেন। মণিপুরে তিনি রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে পঁয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। অর্থাৎ ১৮৮৯ পর্যন্ত। তার দু বছর পরেই মণিপুরের স্বাধীনতা লোপ হয়।

স্বাতি বলল: বুঝেছি। চন্দ্রকীর্তি সিংই মইরাঙের রাজাকে তাড়িয়েছিলেন।

বললুম: ঠিক তাই। আর ইংরেজ সেখানে একজন সর্দার নিযুক্ত করে, তাকে লিংথৌ বলা হত। প্রথম লিংথৌএর নাম রামানন্দ সিং।

স্বাতি বলল: খাম্বা থইবির গল্প থেকে তুমি অনেক দূরে সরে গেছ।

বললুম: না। এই গল্পটা যে কল্পনা নয় তাই বোঝাবার জন্যে এত কথা বললুম। এ গল্প মণিপুরী সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বিরাট বড় গল্প, নানা রকমের ঘটনা। রাজা চন্দ্রকীর্তির সময়েই এই গল্প বোধহয় লিপিবদ্ধ হয়।

স্বাতি বলল: গল্পটা সংক্ষেপে বল।

তাই বলতে হবে।

কেন?

এই গল্প আমি একটা ছোট গল্পের আকারে পড়েছিলুম, তাতে অজস্র ঘটনার ঠাসা বুনুনি। সব মনে রাখতে পারি, আমার স্মৃতি-শক্তি তত প্রখর নয়।

স্বাতি আমার কথায় শুধু হাসল, কোন কথা বলল না। খাম্বা ও থইবির গল্প আমি তাকে সংক্ষেপে বললুম।

লোগতাক লেকের ধারে ছোট্ট এক রাজত্ব মইরাং। তার রাজার

ভাই যুবরাজের একমাত্র মেয়ে থইবি। ভারি সুন্দর মেয়ে। সখীদের নিয়ে একদিন সে লোগতাক লেকে মাছ ধরতে গেল। খবর পেয়ে রাজা ঢেঁটরা পিটিয়ে দিলেন যে কোন পুরুষ সেদিন আর মাছ ধরতে পারবে না।

কিন্তু খাম্বা বোধহয় এ কথা জানত না, একটা নৌকোয় চেপে ঠিক সেইখানে এসে উপস্থিত হল। সুন্দর সুগঠিত দেহের যুবক। সেই প্রথম দেখাতেই থইবি তার প্রেমে পড়ে গেল। রাজকন্যা মনে মনে ঠিক করে ফেলল যে বিয়ে যদি করতে হয় তো এই যুবককেই সে বিয়ে করবে। আর খাম্বাও মনে মনে এই সংকল্প করল।

তারপরে কত বিপর্যয়, কত রেষারেষি নঙ্গবান নামে এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। খাম্বা দরিদ্র, আর নঙ্গবান ধনী। থইবির বাবা নঙ্গবানের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু রাজা পছন্দ করেন খাম্বাকে। খাম্বার বাবাই তো তাঁকে বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। থইবির বিয়ের ব্যাপারে রাজ্যের পাত্রমিত্ররাও দু দলে ভাগ হয়ে গেল।

স্বাতি বলল : তারপর?

বললুম : একটার পর আর একটা পরীক্ষা। শক্তির পরীক্ষা। পাগলা ষাঁড়কে বশ করতে হবে নঙ্গবান পারল না। খাম্বা পারল। থইবির বাবা তবু খুশী নন। হাতির পায়ের সঙ্গে বেঁধে খাম্বাকে মারতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না, অলৌকিক ভাবে সে বেঁচে গেল।

শেষে এক বাঘ শিকার নিয়ে শেষ প্রতিযোগিতা। বনের এক বাঘ কুঞ্জমালা নামে একটি মেয়েকে খেয়েছে। রাজা বললেন, এই বাঘ মারতে হবে। নঙ্গবান বাঘের হাতে মরল, আর বাঘকে মারল খাম্বা।

স্বাতি বলে উঠল : তারপরেই খাম্বার সঙ্গে থইবির বিয়ে হয়ে গেল তো!

বললুম : তা হল।

ছোটদের গল্প।

কিন্তু আসলে এটা বীরত্বের গল্প নয়। গল্পটা রোমান্টিক, আর শেষটা ট্যাজেডি।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : তোমার গল্প এখনও শেষ হয় নি!

বললুম : না। রোমান্টিক এই জন্যেই বলছি যে খাম্বা ও থইবির দেখা হত মাঝে মাঝে, হৃদয় বিনিময় হত। নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। নঙ্গবানও থইবির প্রেম ভিক্ষা করেছিল। তাই একে ছোটদের গল্প বলা চলে না। মধ্য যুগের গল্প বলেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দৈহিক শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়েছিল বারে বারে।

কিন্তু ট্র্যাজেডি হল কেন ?

সেই কথাই এখন বলছি। বিয়ের পরে কিছু দিন যেতে না যেতেই খাম্বার মনে হল যে থইবি তাকে সত্যিই ভালবাসে কিনা তার পরীক্ষা নেওয়া দরকার।

পরীক্ষা!

হ্যাঁ। এদের সমাজে বিবাহিত মেয়েদের ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাবার একটা মজার কায়দা আছে। কোন পুরুষ যদি কোন মেয়েকে বার করে নিতে চায় তো সেই মেয়ে যখন একলা ঘরে থাকবে তখন বাইরে থেকে ঘরের বেড়ার মধ্যে দিয়ে একটা লাঠি ঢুকিয়ে দিতে হবে। ঘরের ভিতরের মেয়ে সেই লাঠি চেপে ধরলেই বুঝতে হবে যে তার সম্মতি আছে।

স্বাতি বলল : সে কি, বাইরের পুরুষটাকে না দেখেই কি কেউ রাজি হতে পারে!

বললুম : আগে থেকে বলা কওয়া বোধহয় থাকে।

বলা কওয়া থাকলে লাঠি ঢোকাবার আর দরকার কী!

জোরা করে আমায় বিপদে ফেলছ কেন! আমি তো আর থইবির ঘরে লাঠি ঢোকাই নি।

স্বাতি হেসে বলল : তারপরে বল।

এক দিন গভীর রাতে থইবি দেখল যে তার ঘরে একজন লাঠি ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই দেখেই থইবি চেঁচিয়ে উঠল, আমাকে জ্বালাতন করতে এসেছে কে!

বলেই খাম্বার বর্শাটা টেনে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল বাইরের পুরুষটার বুকে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল, থইবি আমি, আমি খাম্বা।

থইবি পাগলের মতো বাইরে বেরিয়ে দেখে খাম্বার বুকে সেই বর্শা বিঁধে আছে, আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার দেহ। থইবি বর্শাটা তার বুক থেকে টেনে বার করেই নিজের বুকে ঢুকিয়ে দিল। দুজনেরই মৃত্যু হল এক সঙ্গে। কিন্তু এ দেশের লোকে কী বলে জানো?

স্বাতি বলল : কী?

ওরা মানুষ ছিল না।

তবে?

স্বর্গের দেবতা মর্ত্যে এসে প্রেমের আদর্শ প্রচার করে গেছে।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : শেষটা সত্যিই দুঃখের।

বিকেলের চা খেয়ে আমরা যখন নেমে যাচ্ছিলুম, চঞ্চল সিং তখন ছিলেন না, অন্য একজন বসে ছিলেন কাউন্টারে। তিনি বললেন: ফণি সিং আপনাদের খবর নিচ্ছিলেন। আপনারা হোটেলেই আছেন শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন যে আজ যেন হোটেলের বাইরে না যান। কাল সকাল বেলায় অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে তিনি আপনাদের কাছে আসবেন।

স্বাতি বলল: আমাদের সম্বন্ধে সবাই ভাবছেন বলে ভাল লাগছে।

বলেই সে তর তর করে নেমে গেল।

আমি দেখলুম যে ভদ্রলোক সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

কিছু ভাববেন না।

বলে আমিও নেমে গেলুম।

পথে রিক্সা দাঁড়িয়েছিল। আমি বললুম: এটুকু পথ আমরা হেঁটেই যেতে পারব।

কিন্তু স্বাতি বলল: আজ রিক্সায় যাওয়াই ভাল।

বুঝতে পারলুম যে সে দুকুল রাখছে। পথেও বেরিয়েছে লোকের নিষেধ না শুনে, আবার নিরাপত্তার জন্যে বেশি সময় পথে থাকতে চায় না। তাই কোন প্রতিবাদ না করে তার পাশে উঠে বসলুম।

আচৌবি সিং আমাদের দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। বললেন: কী সর্বনাশ! এতবড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আপনারা বেরিয়ে পড়েছেন!

স্বাতি বলল: হাতে আমাদের সময় নেই বলেই বেরিয়ে পড়েছি।

ভদ্রলোক বললেন : কাল কোন গোলমাল না হলে আমিই আপনাদের কাছে যেতাম !

আমি বললুম : আজও তো কোন গোলমাল দেখছি নে।

বলেন কি ! সমস্ত দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেছে, লোকজন চলছে না পথে। আর আপনারা বলছেন—

এ নিয়ে আমি আর কোন কথা বললুম না। ভদ্রলোক তাঁর বসবার ঘরে এনে আমাদের বসাতেই বললুম : মণিপুর সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহের তো শেষ নেই ! সত্যি কথা বলতে কি, আপনার কাছে অনেক কিছু জানতে পাব বলেই এত দূরে চলে এসেছি।

ভদ্রলোক যেন কিছু বিব্রত বোধ করলেন, বললেন : হ্যাঁ, তা আমি যতটুকু জানি—

ততটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

আছোবি সিং নিজে বসেন নি, বললেন : আপনাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা—

বাধা দিয়ে স্বাতি বলে উঠল : না না, চা আমরা খেয়ে এসেছি।

খেয়ে এসেছেন !

বলেই খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়লেন।

পারিবারিক কোন কুশল প্রশ্ন না করে একেবারে সোজাসুজি বলে বসলুম : মণিপুরী সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের খুব জানবার আগ্রহ।

ভদ্রলোক বললেন : আমি তো সাহিত্যের অধ্যাপক নই।

স্বাতি বলল : মাতৃভাষার সাহিত্য তো, নিশ্চয়ই আপনার অনেক কিছু জানা আছে।

কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ দেখে কোন ভরসা পাওয়া গেল না।

প্রসঙ্গটা শুরু করবার জন্যে আমি বললুম : আমাদের কন্‌স্টিটিউশনের এইট্‌থ্‌ শেডিউলে মণিপুরী ভাষার উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু সাহিত্য আকাদমী এই ভাষা ও সাহিত্যকে মেনে নিয়েছে বলে

শুনেছি। কাজেই মণিপুরী সাহিত্যকে আমাদের সম্মানের চোখে দেখতেই হবে।

আছৌবি সিং বললেন: আসল কথা কি জানেন, কলেজে আমাদের এত বেশি কাজ যে সাহিত্য পড়বার সুযোগই পাই নে।

কিন্তু আমরাও নাছোড়বান্দা। বহু কষ্টে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জেনে নিলুম। প্রাচীন সাহিত্যে দুখানি বই আছে, তার একটির নাম 'পৈরেইটন খুনথক'। ৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যারা মণিপুর উপত্যকায় এসেছিল, তাদেরই দলপতির নাম পৈরেইটন। কিন্তু বইখানা দশম শতাব্দীর লেখা বলে অনুমান করা হয়। আর একখানা বইএর নাম 'নুমিত বাপ্পা', তার মানে সূর্য শিকারী। এটি একটি রূপকথা। পুরাকালে নাকি দুটো সূর্য আকাশে উঠত আর অস্ত যেত। মানুষ তাতে বিশ্রামের সময় পেত না। তাই একজন বাঁশের তীর-ধনুক তৈরি করে একটি সূর্যকে বিদ্ধ করেছিল। এই নিয়েই রূপকথা। দুখানা বই-ই মণিপুরের নিজস্ব লিপিতে লেখা।

এর পরে মধ্যযুগের সাহিত্য। প্রথম দুখানি বইএর নাম 'লেইথক লেইখারম' ও 'প্যানথইবি খঙ্গুন' প্রথমটি সংস্কৃত পুরাণের শৈলীতে লেখা স্বর্গ ও পরলোকের কথা, এবং দ্বিতীয়টি যুদ্ধের দেবী প্যান্‌থইবির উপাখ্যান। খঙ্গুন মানে পদচিহ্ন। এই দেবীর স্বামীর বর্ণনা শুনে বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে তিনি শিবের পত্নী। এই বইগুলি কবে লেখা ও কে লিখেছিলেন তা জানবার কোন উপায় নেই। কিন্তু রাজা গরিব নেওয়াজ যে নিজে দুখানি বই লিখেছিলেন তা জানা যায়। একটি 'লক্ষ্মী চরিত' ও দ্বিতীয়টি 'পরীক্ষিৎ'। তিনি রামায়ণেরও অনুবাদ করিয়েছিলেন, তার লঙ্কাকাণ্ড এখনও পাওয়া যায়। সুন্দর-কাণ্ডটি বোধহয় এর আগের রচনা।

পরবর্তী কালে আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে—'ভাগবত গীতা' 'অশ্বমেধ' 'ধ্রুব চরিত' 'একাদশী পাঁচালি' প্রভৃতি। 'বীর সিং

পাঁচালি' 'খনজয় লাইবু-নিঙবা' নামের উপন্যাস এবং ভ্রমণ ও দর্শনের বইও লিখিত হয়েছে।

মণিপুরী সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ১৮১৯ থেকে। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছে তাকে আধুনিক সাহিত্য বলা ঠিক হবে না। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড, 'খাহি নগম্বা' 'গোবিন্দজী নিরূপণ' এবং সংস্কৃতে লেখা 'কৃষ্ণরাম সঙ্গীত সংগ্রহ'।

মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ লমবম কমল ও অঙ্গলালকে কবিরত্ন উপাধি দিয়েছেন। কমলের 'নিপরেঙ্গ' একটি কবিতার বই, মাধবী নামে তিনি একটি কাব্য-সুষমামণ্ডিত উপন্যাসও লিখেছেন। আর অঙ্গলালের 'খাম্বা-থইবি সোইরেঙ্গ' একখানি অপূর্ব কাব্য। খোয়াই-রকপম ছাওবাকে মণিপুরী গদ্যের জনক বলা হয়। তিনি 'লবঙ্গলতা' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও কবিতাও লিখেছেন। মীনকেতনও একজন কবি ও গদ্য লেখক। তিনিও কবিরত্ন উপাধি পেয়েছেন।

লালাচাঁদ শাস্ত্রীর নামেরও উল্লেখ করতে হয়। তিনি বেদব্যাসের মহাভারতের অনুবাদ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণেরও অনুবাদ হয়েছে।

আছৌবি সিং নিজে আমাদের এ সব কথা বলতে পারেন নি। বোধহয় কোন পাঠ্যপুস্তক দেখে তিনি আমাদের এই ইতিহাস শোনালেন। তাই স্বাতি যখন একেবারে হাল আমলের লেখকদের কথা জানতে চাইল, তখন তিনি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। আমার মনে হল যে মণিপুরী সাহিত্যে অমূল্য কিছু পেতে এখনও আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

স্বাতি পরবর্তী বিষয়ে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছিল। বলল: বাঙলায় আমরা মণিপুরী সংস্কৃতির খুবই ভক্ত, বিশেষ করে মণিপুরী নাচের। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।

এ ব্যাপারেও আছৌবি সিংএর উৎসাহ তেমন দেখলুম না। মনে হল যে তিনি অব্যাহতি পেলেই বেশি খুশী হবেন। তাঁর মধ্যে

খানিকটা অস্থিরতাও দেখা দিয়েছিল। ভদ্রলোক এর পরে বলেই ফেললেন : সত্যি কথা কি জানেন, নাচ গান আমি একেবারেই পছন্দ করি না।

সে কি!

কেন করি না তা বুঝতেই পারছেন।

আমি মাথা নেড়ে বললুম : না।

আছৌবি সিং বললেন : দেশের ছেলেমেয়েরা এই নাচ গান নিয়ে এমন মাতামাতি করছে যে বড় কিছু আর তারা ভাবতেই পারছে না। এই দেখুন না, সন্ধ্যেবেলায় ছেলেমেয়েদের আপনি আর তাদের বাড়িতে পাবেন না—

কিন্তু আছৌবি সিং তাঁর কথা শেষ করবার আগেই আর এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। আর তাঁকে দেখতে পেয়েই আছৌবি সিং বলে উঠলেন : কী বিপদ দেখ, কলকাতা থেকে গোপালবাবু এসেছেন আমার কাছে নাচগানের কথা শুনবেন বলে!

আগন্তুক ভদ্রলোক এ কথা শুনে অট্টহাস্য করে উঠলেন। তার পরে কোন্ রকমে নিজেকে সামলে বললেন : কলেজের ছেলেমেয়ে-দের কী করে শায়েস্তা করতে হয়, ওঁর কাছে আপনি সেই পরামর্শ নিতে পারেন।

তার পরেই আছৌবি সিংকে বললেন : এক কাজ করতে পার। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তো গাড়ি আসছে! এঁদের তুমি সুদামা সিংএর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যেতে পার। ওঁরাও খুশী হবেন, আর এঁরাও কিছু জানতে পারবেন।

ঠিক বলেছ।

বলে আছৌবি সিং একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

স্বাতি আমার দিকে তাকাল। আর আমি বুঝতে পারলুম যে এঁরা দুজনেই কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু ছাত্রদের ভালবাসেন যত, তার চেয়ে তাদের ভয় পান বেশি। গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা মধুর নয়

বলেই হয়তো রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। অধ্যাপকের ধর্ম বিচ্যুত হয়েছেন সন্দেহ করেই আমি হতাশ হলুম।

কিন্তু এই পরিবেশে আমাদের বেশিক্ষণ থাকতে হল না। বাইরে একটা স্টেশন ওয়াগন এসে দাঁড়াল। সেই শব্দ পেয়েই আছৌবি সিং একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন: আসুন আমাদের সঙ্গে।

বলে সেই গাড়িতে তুলে খানিকটা দূরেই আর এক বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আছৌবি সিং বললেন: গান বাজনার শব্দ শুনছেন তো, সোজা ঢুকে গিয়ে আলাপ করুন।

বলে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: কী করবে?

বললুম: যদি বল তো আলাপ করতে পারি।

গলাধাক্কা দেবে না তো!

তাতে তো আমাদের ক্ষতি নেই। আর কিছু জানতে হলে সব রকম অবস্থাতেই মানিয়ে নিতে হবে।

স্বাতি বলল: তাহলে তুমি এগিয়ে যাবে, না আমি?

বললুম: এসো, দুজনে একসঙ্গেই যাব।

বলে আমরা ভিতরে ঢুকে বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়লুম। দেওয়ালের কোনখানে কলিং বেল দেখতে না পেয়ে একটু জোরে বললুম: আমরা কি ভেতরে আসতে পারি?

কে?

বলে এক মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন: আপনারা!

আমি নমস্কার করে বললুম: আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। গান বাজনার শব্দ পেয়ে—

গান বাজনা ভালবাসেন বুঝি?

স্বাতি বলল: খুব।

ভদ্রমহিলা সাদরে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে এক ভদ্রলোককে বললেন: এঁরা গান শুনতে এসেছেন কলকাতা থেকে।

ভদ্রলোক খোল বাজাচ্ছিলেন, সেটা সরিয়ে রেখে বললেন: আসুন আসুন।

বলে আসরের এক পাশে বসতে বললেন।

পরিচয় হল। সুদামা সিং অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রী মাধুরী, পড়ান স্কুলে। আমাদের পরিচয় পেয়ে এক মুহূর্তে আপনার জন করে নিলেন। মাধুরী বললেন: কী খাবেন বলুন, ঠাণ্ডা না গরম?

আমাদের কোন ওজর আপত্তি তিনি মানলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েক গ্লাস শরবৎ তৈরি করে আনলেন।

আমি তখন সুদামা সিংকে বলছিলুম যে আমরা মণিপুরী নৃত্য-গীত সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

মাধুরী শরবতের গ্লাস আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন: আগে আপনাদের কাছে কিছু শুনব, তারপরে আমাদের পালা।

স্বাতি একটা গ্লাস হাতে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে বলল: আমি সেতার বাজাই।

আর সেই সঙ্গেই আমি যোগ করলুম: আর আমি শুনি।

সুদামা সিং হেসে বললেন: ফাঁকি দেবার মতলব! কিন্তু চালাকি চলবে না তো! আমরা শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের গান জানে না এমন বাঙালী মেয়ে বাঙলায় নেই।

শেষ পর্যন্ত স্বাতিকে একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হল। স্বাতি একখানা শুদ্ধ রাগের ব্রহ্মসঙ্গীত গাইল। দুজনে তন্ময় হয়ে শুনলেন। তারপরে বললেন: সত্যিই অপূর্ব।

আমি বললুম: বাঙলা কি আপনারা বোঝেন?

দুজনে এক সঙ্গে বললেন: একটু একটু।

তারপরেই সুদামা সিং বললেন: রবীন্দ্রনাথের জন্যেই ভারতে মণিপুরী নৃত্যের কদর হয়েছে।

আমি বললুম: রবীন্দ্রনাথ কি মণিপুরে এসেছিলেন?

সুদামা সিং বললেন: যতদূর জানি, মণিপুরে তিনি আসেন নি।

তবে শুনেছি তিনি সিলেটের উপকণ্ঠে মাছিমপুর নামে একটি গ্রামে মণিপুরী মেয়েদের রাসনৃত্য দেখেছিলেন ১৩২৬ সনে। তারপরেই তিনি ত্রিপুরা থেকে নবকুমার ঠাকুর ও মণিপুর রাজপরিবারের বুদ্ধিমন্ত সিংকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা ছাড়াও ১৩৪১ সনে শিলচর থেকে রাজকুমার সেনারিস, মহিম সিং আর সিলেট থেকে নীলেশ্বর নামে একজনকে মণিপুরী নাচ শেখাবার জন্যে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমি বললুম: সন তারিখ বলতে পারব না, তবে শুনেছি যে মণিপুরী নৃত্যকলায় তিনি 'নটীর পূজা'র অভিনয় করিয়েছিলেন।

সুদামা সিং বললেন: ১৯২৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী। শিল্পী নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী নেচেছিলেন।

স্বাতি সবিস্ময়ে বলল: আপনারা এত খবর রাখেন?

সুদামা সিং লজ্জিত ভাবে বললেন: মণিপুরী রাসকে এখন আমরা ক্ল্যাসিকাল নৃত্য বলি। এ গৌরব তো রবীন্দ্রনাথের জন্যই। তাঁর আগে মণিপুরী নৃত্যকলা সম্বন্ধে কে কতটুকু জানত!

আমরা তথ্য নিয়ে আলোচনা করলুম আগে। প্রথমে রাসের কথাই হল। সুদামা সিং বললেন: রাসকে নৃত্যনাট্য বলা উচিত। এর বিষয় হল বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণলীলা। রাস চার রকমের। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' নিয়ে দোলের সময় বসন্ত রাস, ভাগবতের বিষয় নিয়ে কুঞ্জ রাস দুর্গা পুজোর সময়ে ও মহারস রাস-পূর্ণিমায়। দেবতার সামনে এই সব নৃত্য হয়। আর সর্বসাধারণের জন্যে নটরাস। গত শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজ পলিটিকাল এজেন্টরা মণিপুরী রাস দেখতে চাইলে মহারাজা এই নটরাসের প্রবর্তন করেন। মন্দিরে এ নাচ হবে না, এ নাচ স্টেজের জন্যে।

স্বাতি বলল: কলকাতায় আমরা বোধহয় নটরাসই দেখেছি।

মাধুরী বললেন : তাই। কিন্তু অন্য রাসের সঙ্গে তফাত না বলে দিলে আপনারা ধরতে পারবেন না। গোপীদের পোশাক একই রকম, শুধু মাথার দিকটা একটু অন্য রকম। আর গানের কথাও অন্য রকম। ভাগবত বা গীতগোবিন্দ থেকে কোন উপকরণ নেওয়া হবে না।

বললুম : তার মানে ধর্মীয় ভাবটা দেবতার জন্যেই থাকবে, জনসাধারণের মনোরঞ্জনে তা ব্যবহার করা চলবে না।

সুদামা সিং বললেন : ঠিক তাই। জনসাধারণের জন্য লোকনৃত্য আছে লাই হরাওবা ও থবল চোঙবা। লাই হরাওবাও ধর্মীয় নাচ। মেয়েরা নাচে ভিন্ন সাজে। এই নাচের সঙ্গেও গান আছে। আর বাঙলায় এই নাচেরও প্রভাব পড়েছে বলে শুনেছি।

আর একটা কী নাচ বললেন ?

থবল চোঙবা। কথাটার মানে হল চাঁদের আলোয় নাচ। আগে পূর্ণিমার দিন থেকে ছ দিন নাচ হত, এখন যত দিন খুশি। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে এই নাচ নাচে, দুজন মেয়ের পরে একজন ছেলে।

স্বাতি বলল : লোকনৃত্য বোধহয় আরও আছে !

মাধুরী বললেন : গৌরলীলা বা শুমঙ্গলীলাকে লোকনৃত্য বলা যায় না।

সুদামা সিং বললেন : গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের জীবন নিয়ে গৌরলীলা। আর শুমঙ্ মানে উঠোন বা অঙ্গন। উঠোনে এই গান হয় বলে শুমঙ্গলীলা নাম হয়েছে।

মণিপুরী গানের সম্বন্ধে আমি একটা অদ্ভুত কথা শুনেছিলুম এক ভদ্রলোকের কাছে। তিনি বলেছিলেন যে গান মানেই বিকট চিৎকার, সে গান থামলেই প্রাণে আরাম পাওয়া যায়। এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। যাদের শিল্পানুভূতি সূক্ষ্ম, নৃত্যে যাদের রসবোধ সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে, তাদের সঙ্গীত কখনও শ্রুতিকটু হতে

পারে না। সে ভদ্রলোক বোধহয় নাগা কিংবা অন্য কোন উপজাতির গান শুনে থাকবেন। তবু একটা সংশয় জেগেছিল বলে আমি এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলুম না।

কিন্তু সুদামা সিং তখনও নাচের কথাই ভাবছিলেন। বললেন: নাচের মধ্যে লাই হরাওবা নাচই সব চেয়ে প্রাচীন। মণিপুরের মানুষ বৈষ্ণব হবার অনেক আগে থেকেই এদেশে লাই হরাওবা নাচের প্রচলন ছিল।

মাধুরী বললেন: কিংবদন্তী আপনাদের ভাল লাগে?

স্বাতি বলল: লাগে বৈকি!

এই নাচের উৎপত্তি নিয়ে একটা প্রবাদ এ দেশে প্রচলিত আছে। শিব ও পার্বতী লীলা করবেন বলে একটা উপযুক্ত স্থান খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। হিমালয় ছেড়ে মণিপুরে এসে তাঁরা এই সুন্দর উপত্যকাটি দেখতে পেলেন, কিন্তু জলে এই উপত্যকা তখন জলময় ছিল। শিব তাঁর ত্রিশূল দিয়ে পাহাড়ে একটা আঘাত করতেই পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে সমস্ত জল বেরিয়ে গেল, আর এই উপত্যকা হল নাচের উপযুক্ত একটা রঙ্গমঞ্চ। শিব হাতে নিলেন মৃদঙ্গ আর পার্বতী নিলেন পেনা নামের একটি তারের যন্ত্র। তারপর দুজনে মিলে নাচলেন লাই হরাওবা।

সুদামা সিং বললেন: আজও তাই এ দুটি যন্ত্র না হলে লাই হরাওবা নাচ হয় না।

গানের কথা তুলল স্বাতি, বলল: এইবারে আপনাদের একটা গান শুনব।

মাধুরী তখনি বলে উঠলেন: আমাকে লজ্জা দেবেন না।

তা হয় না।

মাধুরী এবারে তাঁর স্বামীকে বললেন: তার চেয়ে তুমি গানের সম্বন্ধে কিছু বল না! আমি এঁদের জন্যে রাতের খাবারটা তৈরি করে ফেলি।

স্বাতি বলল : না না, রাতে খাবার ব্যবস্থা আর করবেন না। তাহলে এই সুন্দর পরিবেশটা মাটি হয়ে যাবে।

সুদামা সিং বললেন : আপনারা কোথায় উঠেছেন ?

আমি হোটেলের নাম বললুম। তাই শুনে তিনি বললেন : তবে তো কাছেই আছেন।

আর খাবারও তৈরি পাব।

সুদামা সিং তাঁর স্ত্রীকে বললেন : বাঙালীরা মাংসাশী আর আমরা বৈষ্ণব। আমাদের খানা ওঁদের ভাল লাগবে না। তার চেয়ে গানের কথাই বোধহয় ওঁদের বেশি ভাল লাগবে।

স্বাতি বলল : সত্যিই আমরা গান বা গানের কথা শুনলে বেশি খুশী হব।

সুদামা সিং বললেন : আপনাদের মতো আমাদেরও লোক-সঙ্গীত ও মার্গ সঙ্গীত আছে। গানকে আমরা ইশেই বলি। লাই হরাওবা ইশেই খুল্লং ইশেই পেলা ইশেই খোঙ্গজং পর্ব—এ সব হল লোকসঙ্গীত। এ সব নিয়ে আলোচনা বোধহয় আপনাদের ভাল লাগবে না।

খোঙ্গজং পর্ব কি লোকসঙ্গীত নাকি ?

একে পালাগান বলা ভাল। ইম্ফল থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে একটা জায়গার নাম খোঙ্গজং। ১৮৯১ সালে বৃটিশের সঙ্গে সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধ হয়েছিল এইখানে। তারপরে মণিপুরীদের বীরত্ব নিয়ে পালাগান তৈরি হয়। এখন আরও অনেক ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পালা তৈরি হয়েছে। সে সবই খোঙ্গজং পর্ব নামে চলে।

এর পরে সুদামা সিং মার্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে বললেন : মণিপুরে নট সঙ্গীত একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পূজা পার্বণে উৎসবে সামাজিক কাজে এই গান হতেই হবে। বিশুদ্ধ রাগে গান। তারপর গৌরপদ, মানে গৌরাঙ্গের পদ বা কবিতা। গান শেষ হবে প্রার্থনা দিয়ে।

মাধুরী বললেন: গুলাবি সিং অভিরাম ও কালিদমন সিংএর নাম বোধহয় শুনেছেন? নট গানের জন্যে তাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন।

স্বাতি মাথা নাড়ল, কিন্তু কোন কথা কইল না।

সুদামা সিং মনোহর সাই ও ধব গানের কথাও বললেন। ধব গানের বিষয়বস্তু রূপসনাতনের কথা। আমার মনে হল যে এটা বোধহয় ঢপ গান। আর মনোহর সাই নাকি বাঙলার বর্ধমান জেলা থেকে মণিপুরে আমদানি হয়েছিল।

তারপরেই বললেন: মাধুরী আপনাকে নুপি পালা শোনাবে। নুপি মানে মেয়ে।

স্বাতি উৎসাহিত হল। আর আমি বললুম: খুব ভাল কথা।

সুদামা সিং বললেন: মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে পূজা পার্বণে এই গান গায়। আর খোল বাজাই আমরা। এই গানের সুর শুদ্ধ রাগের মতো কঠিন নয়। এ ছাড়া হাতে তালি দিয়ে মেয়েরা আর এক রকমের গান গায়, তার নাম খুবা ইশেই। ইশেই মানে যে গান, তা আগেই বলেছি। আর খুবক মানে হাতের তালু। রাস ও রাসেশ্বরী নামেও গান আছে।

মাধুরী তখন এক জোড়া ছোট মন্দিরা হাতে নিয়ে বসেছিলেন। তাই দেখে সুদামা সিং তাঁর খোল কাছে টেনে নিলেন। মাধুরী একখানা গান গেয়ে শোনালেন আমাদের। গলার স্বর মিষ্টি, সুর কোন মিশ্র রাগ-রাগিণীর। খোল আর মন্দিরার সঙ্গে তাঁর এই গান আমাদের ভাল লাগল।

গান শেষ হতেই মাধুরী বললেন: আমরা দলের সঙ্গে গাই তো, তাই একা গাইতে লজ্জা করে।

আমি বললুম: শিল্পের সাধনায় লজ্জার কোন স্থান নেই।

আমাদের বিদায় দিতে এই দম্পতি পথে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন: চলুন, আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাধা দিয়ে আমি বললুম: এটুকু পথ আমরা একাই যেতে পারব।

সুদামা সিং বললেন। আজ ছেলেদের নাকি ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

তবে তো আপনাদের পথে বেরোনো উচিত নয়।

আমাদের ভয় কী! কলেজে ওরা আমাদের কাছে পড়ে, বাড়িতে আসে গান বাজনা শিখতে। ভালবাসে আমাদের। কলেজে সম্মান করে, আর পথেঘাটে ওরাই তো আমাদের রক্ষা করে।

অধ্যাপক আছৌবি সিংএর কথা আমি বললুম না। গল্প করতে করতে সুদামা সিং ও মাধুরী আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। মাধুরী বললেন: সময় পেলে আবার আসবেন।

স্বাতি বলল: পরশু সকালে আমরা চলে যাচ্ছি, আর কাল যাচ্ছি মইরাঙে।

সুদামা সিং বললেন: মইরাঙ আর লোগতাক আপনাদের খুব ভালো লাগবে।

## ২৬

উপরে উঠবার সময়ে দেখলুম যে ফণি সিং ম্যানেজারের সামনে বসে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন: যাক, ভালোয় ভালোয় ফিরতে পেরেছেন দেখছি। আজ না বেরোলেই পারতেন।

স্বাতি বলল: আমরা তো শোভাযাত্রায় সামিল হয়ে যাব ভেবেছিলাম।

ফণি সিং বললেন: কাল মইরাঙে যাবার গাড়ি পাবেন কিনা বুঝতে পারছি না। আমাদের এক ওপরওয়ালা আসছেন, তাঁকে নিয়ে ঘোরাবার ভার পড়েছে আমার ওপরে। তা না হলে—

না না, আমাদের জন্যে আর কোন কষ্ট করতে হবে না।

ফণি সিং ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন: আজ আর বিরক্ত করব না। আমার টেলিফোন নম্বরটা রেখে যাচ্ছি, কোন দরকার হলেই খবর দেবেন। আর কাল সকালের অবস্থার খবর না নিয়ে হুট করে বেরিয়ে পড়বেন না।

আমি হেসে বললুম: আমাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন।

বলে আমরা উঠে এলুম আমাদের ঘরে। তালা খুলে ভিতরে এসে স্বাতি বলল: একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি।

কী কথা?

ফণি সিং আমার কানের মুক্তো দুটোর দাম জিজ্ঞেস করেছে দু বার।

মানে।

ইম্ফলে আসবার পথে যেখানে আমরা খেতে নেমেছিলুম সেখানে

একবার, আর এই হোটেলে পৌঁছে দিয়েও একবার জিজ্ঞেস করেছে।

তুমি কী বললে?

সত্যি কথাই বলেছি, জানি নে। ও বলেছে, কলকাতায় এলে আমাদের সঙ্গে দেখা নিশ্চয়ই করবে।

রাতে চঞ্চল সিং বলে গেলেন যে তাঁর গাড়িটা একটু দেরিতে পাওয়া যাবে, আমরা যেন সকাল বেলায় তাড়াহুড়ো না করি। মইরাঙ যাতায়াতে ঘণ্টা খানেক সময় লাগে, আর এক ঘণ্টায় তিনি সব কিছু দেখিয়ে দিতে পারবেন। তারপরে ভয় দেখাতেও কসুর করলেন না। ছাত্ররা কিছু দোকানপাট নাকি লুঠ করেছে। কাল রবিবারে গোলমাল হবার আশঙ্কা আরও বেশি।

ভোরবেলায় উঠে স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: তোমার কী ইচ্ছে করছে বল তো?

বললুম: আবার আমার পুরনো দিনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে, যখন কোন দায়িত্ব ছিল না, দায়িত্ব নেবার কথাও ভাবতে হত না।

তার মানে বিপদের ভয় তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। আমারও সেই ইচ্ছে।

কেন বল তো!

লোগতাক লেকে বেড়াতে হলে সকাল বেলাই ভাল।

হোটেলে ব্রেকফাস্টের জন্যে আমরা অপেক্ষা করলুম না। স্নান সেরেই বেরিয়ে পড়লুম। একটা রিক্সা ধরে বললুম: মইরাঙের বাস স্ট্যাণ্ডে চল।

লোকটা অনেক পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আমাদের একটা বাসের কাছে পৌঁছে দিল। তার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলুম: এ বাস মইরাঙে যাবে তো!

কথাটা সে বুঝল কিনা জানি নে, মাথা নেড়ে বলল : হ্যাঁ।

আমরা আর দেরি না করে সেই খালি বাসটাতেই উঠে বসলুম।

কেন জানি না মনে একটু সন্দেহ জেগেছিল বলে দু-একজন যাত্রীর কাছে বাসের গন্তব্য স্থান জানতে চাইলুম। বাংলা ও হিন্দী কথা অচল মনে হল, ইংরেজীনবিশও কেউ ছিল না। কিন্তু একজন বলল, চূড়াচাঁদপুর।

সে আবার কোথায়!

বলে হুড়মুড় করে আমরা নেমে পড়ছিলুম।

ঠিক এই সময়ে একজন দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক বাসে উঠছিলেন, তিনি ইংরেজীতে বললেন : আপনারা যাবেন কোথায়?

বললুম : মইরাঙে।

সে ভদ্রলোক বললেন : তবে এই বাসেই বসুন। মইরাঙের ওপর দিয়ে এই বাস চূড়াচাঁদপুর যাবে। মোড়ে নেমে একখানা রিক্সা করে আপনারা মইরাঙ শহরে চলে যাবেন।

সবাই কি এই ভাবেই যায়?

না। মইরাঙের বাস অন্য বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ছাড়ে। তাতে উঠলে পথে আপনাদের নামতে হত না। কিন্তু এখন এখানে নেমে বাস বদল করার চেষ্টা করলে সময় ও পয়সা দুই-ই বেশি লাগবে।

এরই মধ্যে অনেক যাত্রী বাসে উঠে পড়েছিল, এবং প্রবল গর্জন করে বাসও যাত্রা শুরু করল। পুরনো আমলের বাস। শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ জাগছিল মনে। দক্ষিণ-ভারতীয় ভদ্রলোকটি বললেন : বেড়াতে যাচ্ছেন তো! ফেরার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকবেন। আজ রবিবার, বাসের সংখ্যা কম। বেশি দেরি করলে হয়তো সেখানেই থেকে যেতে হবে।

আমি কোন উত্তর দিলুম না। কিন্তু আমার মনের কথা স্বাতি বুঝতে পেরেছিল। চুপি চুপি বলল : মানুষের স্বভাবই এই রকম। সুবিধে পেলেই অন্যকে ভয় দেখায়।

পাকা সড়ক ধরে আমাদের বাস সবেগে ছুটছিল। কিন্তু পথের দিকে চেয়ে মনে হল যে বেগের চেয়ে তার গর্জনই বেশি। তবু এক সময়ে শহর শেষ হয়ে গেল এবং ইম্ফলের এয়ারপোর্টও আমরা পেরিয়ে গেলুম।

বাস মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছিল, যাত্রী ওঠানামা করছিল। এমনি করেই এক সময়ে আমরা সাতাশ কিলোমিটার দূরে বিষেণপুরে পৌঁছে গেলুম। এই বিষ্ণুপুরেই বিষ্ণুর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কিয়াম্বার আমলে তৈরি। কিন্তু বাস থেকে এই মন্দির দেখা গেল না।

পুরাকালে এই বিষেণপুর থেকেই ভারতে যাবার একমাত্র পথ ছিল। এই পথ অরণ্যের মধ্য দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে নদী পেরিয়ে পঁচাশি মাইল দূরে রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের কাছে জিরিঘাটে পৌঁছত। আসামের কাছাড় জেলার প্রধান শহর শিলচর সেখান থেকে আটাশ মাইল দূরে। এ আমার পুরনো বইএ পড়া কথা। এত দিন এ পথের নিশ্চয়ই অনেক উন্নতি হয়েছে। শিলচর থেকেও নাকি রেলপথ আসবে জিরিবামে। আর জিরিবাম থেকে বাসের সুব্যবস্থা হলে যাত্রীরা আর কোহিমার উপর দিয়ে আসবে না আগের মতো এই পথেই যাতায়াত করবে। সেই সুদিনের জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে।

এই অনাদৃত পল্লীতে বাস এসে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। অল্প সময় থেকেই চলতে শুরু করল।

এক জায়গায় পুল তৈরি হচ্ছিল। খুব সন্তর্পণে পথ থেকে নিচে নেমে নদী পেরিয়ে আবার আমাদের উপরে উঠতে হল। বাস এমনভাবে হেলেছিল যে নদীতে কাত হয়ে পড়বে বলে ভয় হয়েছিল অনেকের।

পথের ধারে লোগতাক লেক আমরা দেখতে পেলুম না। কিন্তু আমাদের দক্ষিণ-ভারতীয় সহযাত্রী পথ থেকে অনেক দূরে হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট দেখিয়ে দিলেন। ইম্ফল থেকে চল্লিশ কিলোমিটার

দূরে কম বেইরক পাহাড়ের নিচে এই প্রজেক্ট। কাজ সম্পূর্ণ হলে সত্তর হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে এবং জলসেচ করা সম্ভব হবে ষাট হাজার একর জমিতে।

এখান থেকেই খানিকটা এগিয়েই একটা মোড়ের উপরে গাড়ি দাঁড়াল। এই জায়গার নামই মইরাঙ, শহর এখান থেকে কিছু দূরে। শুধু আমাদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে বাস চূড়াচাঁদপুরের দিকে চলে গেল। ইম্ফল থেকে চূড়াচাঁদপুর ষাট কিলোমিটার দূরে টিড্ডিম রোডের উপরে। টিড্ডিম ব্রহ্ম সীমান্তের শহর।

পথের ধারেই অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান ছিল। স্বাতি একটা দোকান থেকে গোটাকয়েক কমলা লেবু কিনে একটা রিক্সায় উঠে বসল। একটা টাকা দিলেই রিক্সা আমাদের মইরাঙ শহরে পৌঁছে দেবে।

কমলা লেবু খেতে খেতেই আমরা মইরাঙের বাজারে পৌঁছে গেলুম। প্রধান রাজপথের দু ধারেই দোকানপাট হোটেল রেস্তোরাঁ। স্বাতি বলল : আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, তারপরে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখা যাবে।

একটা পরিচ্ছন্ন চায়ের দোকানের সামনে আমরা নেমে পড়ে রিক্সাকে বিদায় দিলুম।

গ্রাম্য শহর, এক সময়ে মইরাঙ নামে একটা রাজ্যের যে রাজধানী ছিল, তা ভাবা যায় না। সে যুগে বড় ঘর বাড়ি রাজপ্রাসাদ দুর্গ এসবও হয়তো এ অঞ্চলে তৈরি হত না। গ্রামের সর্দারকেই বোধহয় রাজা বলা হত। স্বাধীন বলেই রাজা। দোকানপাটের অবস্থা খুবই করুণ। হোটেল রেস্তোরাঁ প্রভৃতি গালভরা নামের অযোগ্য। সামান্য কিছু খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

এই বাজার থেকেই ইম্ফলের বাস ছাড়ে। ইম্ফল এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে। একজন শিক্ষিত পথচারী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে এখানে দর্শনীয় স্থান আছে দুটি। প্রথমটি

এই পথেই খানিকটা এগিয়ে গেলে আই. এন. এ. মেমোরিয়াল, আর দ্বিতীয়টি লোগতাক লেক। এখান থেকে অনেকটা দূর বলে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়, রিক্সা করে যেতে হবে।

স্বাতি বলল : চল, আই.এন.এ. মেমোরিয়ালই আগে দেখে আসি।

বললুম : চল।

বাজার যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখান থেকেই আমরা বাঁ হাতের পথ ধরলুম। ডান দিকের পথটি গেছে লোগতাক লেকের দিকে। একটুখানি এগিয়ে ডান হাতে একটি দোতলা বাড়ি দেখতে পেলুম। এরই প্রাঙ্গণে আই. এন. এ. মেমোরিয়াল। ভারি সুন্দর পরিবেশ। এ জায়গাটাকে বোধহয় মইরাঙের মার্টার্স মেমোরিয়াল গ্রাউণ্ড বলে। দোতলা বাড়ির নিচের তলায় নেতাজী লাইব্রেরি, তার দরজা এখন বন্ধ। রবিবারে খুলবে কিনা জানি না। সাধারণত দুপুর দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে। এই বাড়ির দোতলায় আই. এন. এ. ওয়ার মিউজিয়ম। আর বাড়ির সামনে যে সাজানো বাগান তার এক প্রান্তে নেতাজীর মানুষ প্রমাণ ব্রঞ্জের স্ট্যাচু। ১৯৭২ সালের একুশে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। অন্য দিকে একটি পাথরের স্তম্ভ, তার গায়ে লেখা ইত্তেহাদ, ইৎমাদ ও কুর্বানি। নেতাজী সিঙ্গাপুরে যে আই. এন. এ. মেমোরিয়াল স্থাপন করেছিলেন, ইংরেজ তা ভেঙে দিয়েছিল। ঠিক সেই রকমেরই একটি স্মৃতিস্তম্ভ এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার গায়ে নেতাজীর সেই অমর বাণী ইত্তেহাদ ইৎমাদ কুর্বানি।

স্বাতি বলল : এখানে এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে কেন বলতে পার?

বললুম : মইরাঙ কংলায় স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়েছিল ১৯৪৭ সালের চোদ্দই এপ্রিল। বোধহয় পয়লা বৈশাখ ছিল সেই দিন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত করেছিল এই জায়গাটা।

তারপর ?

তারপরের ঘটনা পরে বলব। আগে দেখবার যা কিছু আছে, তা দেখে নিই।

বলে আমরা দোতলায় উঠে গেলুম।

জাদুঘরের দরজা খোলা ছিল। ভিতরে ঢোকবার আগেই দেখতে পেলুম যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই জাদুঘরের উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৬৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু ভিতরে ঢুকে হতাশ হলুম তার দুরবস্থা দেখে। বহু মূল্যবান ছবি আছে এখানে, কিন্তু তার মধ্যে অনেক ছবি এমন অযত্নে রাখা হয়েছে যে অচিরেই তা নষ্ট হয়ে যাবে। কিছু ছবি কাচের ফ্রেমের মধ্যে আছে। বাকি ছবিগুলির উপরে কাচ নেই। ধুলোয় ও হাওয়ায় ছবিগুলি বিবর্ণ হতে শুরু করেছে। নেতাজীর শেষ ছবিটি আমরা প্রচুর আগ্রহ নিয়ে দেখলুম। সাইগনে এই ছবি তোলা হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৭ই অগস্ট।

স্বাতি বলল : এই জাদুঘরে নেতাজীকে আরও জীবন্ত করে রাখা সম্ভব ছিল।

বললুম : পরিকল্পনার অভাবে তা হয় নি।

কিন্তু স্বাতি বলল : না। নেতাজীকে নির্জীব করে রাখাই সরকারের পরিকল্পনা ছিল। তাঁকে আমরা তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে আজও বঞ্চিত করে রেখেছি।

বললুম : তোমার এ অভিযোগ অস্বীকার করব না।

বাজারে ফিরে এসে আমরা একখানা রিক্সা ভাড়া করলুম। একটি চটপটে ছেলে আমাদের লোগতাক লেক দেখিয়ে আনবে। ছেলেটি ইংরেজীতেই কথা বলছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে সে কলেজে পড়ছে, ছুটির সময়ে রিক্সা চালিয়ে কিছু রোজগার করে। তা না করলে তার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। ভাল লাগল তার এই কথা, উৎসাহ দিলুম তাকে।

খানিকটা পথ ঘুরে আমরা একটি সোজা রাস্তা ধরলুম। এই পথের ধার দিয়ে নালার মতো একটি সরু নদী বয়ে গেছে। ছোট ছোট ডিঙি নৌকোয় মেয়েরা যাতায়াত করছে। আমরা তাদের ছাড়িয়ে টিলার মতো একটি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললুম।

এই পথে মোটর গাড়িও চলে। সঙ্কীর্ণ পথ বলে রিক্সাকে তখন পথের একেবারে ধারে চলে আসতে হয়। কিন্তু ছেলেরা ভয় পায় না। ভয় হয় আমাদের। এক সময়ে আমরা পাহাড়ের নিচে এসে পৌঁছে গেলুম। এর পরেও যাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় তা জানি নে। আমরা নেমে পড়লুম।

এই পাহাড়ের উপরে একটা টুরিস্ট হোম আছে, তার নাম সেন্দ্রা টুরিস্ট হোম। আরও কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। মোটর এই পাহাড়ের উপরে উঠতে পারে। আমরা পায়ে হেঁটে উপরে উঠতে পারতুম। কিন্তু তা না উঠে অন্য পথ ধরে লেকের দিকে এগিয়ে গেলুম। উপর থেকে লেকের দৃশ্য ভাল দেখা যেত, কিন্তু ওঠা-নামায় পরিশ্রম হত অনেক। আর সূর্য মাথার উপরে উঠে এসেছে দেখেই সে উৎসাহ পেলুম না। যে পথে আমরা এগিয়ে গেলুম সে পথও লেকের ধার দিয়ে বহু দূরে চলে গেছে। এখানে আসবার সময়েও পথের ধারে লেক দেখেছি। বুঝতে পারছি যে এই লেক কাশ্মীরের উলারের মতো নয়, এর তুলনা করা যেতে পারে ডাল বা নাগিন লেকের সঙ্গে। লেকের জল চারি দিকে এমন আনাচে-কানাচে ঢুকেছে যে কোন কিছুরই হদিস পাচ্ছি নে।

আমি শুনেছিলুম যে এই বিস্তীর্ণ লেকের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ ও পাহাড় আছে, আছে মানুষের বাস, চাষবাস ও ফলের বাগান। কতকটা চিল্কার মতো। নৌকোয় করে ঘুরে বেড়াতে পারলে এখানকার অধিবাসীদেরও দেখতে পাওয়া যাবে। মেয়েরা নাকি সুতো কাটছে, তাঁত বুনছে, আর মাছ ধরছে নৌকোয় করে। সরল তাদের জীবনযাত্রা, ব্যবহার আত্মীয়ের মতো।

লেকের ধারে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। পথ অনেক উঁচু দিয়ে। জলের ধারে যেতে হলে খুব সন্তর্পণে নিচে নামতে হবে। দূরে দূরে দু-একটা নৌকো আছে পাড়ে বাঁধা, কিন্তু মাঝি নেই। কাছাকাছি লোক থাকলে আমরা নৌকোয় গিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতুম।

স্বাতি দুঃখ করে বলল: মণিপুর সরকার এখনও টুরিস্ট চাইছে না। তা চাইলে এই সব জায়গাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারত।

সত্যিই তাই।

হঠাৎ আমার একটি পুরনো ঘটনা মনে পড়ে গেল। বছর ত্রিশেক আগে আসামের রাজ্যপাল সার আকবর হায়দরি সপরিবারে এখানে এসেছিলেন শিকারে। ভোরবেলায় তাঁরা হাঁস শিকারে বেরিয়েছিলেন। ঘণ্টা দুই পরে তিনি একা ফিরে এলেন। পরিবারের আর সবাই রয়ে গেলেন আরও কিছুক্ষণ শিকারের জন্যে। সার আকবর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মারা গেলেন এই লেকের ধারেই। কিন্তু স্বাতিকে আমি এ গল্প শোনালুম না, তার মন খারাপ হয়ে যেত।

আমরা একটু ছায়া খুঁজছিলুম। কিন্তু পাহাড়ের দিকে কোন বড় গাছপালা নেই। যে গাছগুলি আছে, তাদের পাতা নেই একটিও। তবু তারই মধ্যে একটা জায়গায় দেখলুম রোদ পৌঁছচ্ছে না। স্বাতি বলল: এসো, এইখানে আমরা কিছুক্ষণ বসি।

লেকের দিক থেকে শীতল বাতাস আসছিল। তার প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগল। প্রসন্ন মনে আমি তার পাশে গিয়ে বসলুম।

স্বাতি নিজেদের কথা বলল না, কিছুক্ষণ নীরবে থাকবার পরে বলল: এইবারে নেতাজীর কথা বল।

১৯৪৪ সালের ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। ইংরেজী বইএ পড়েছিলুম যে জাপানী সেনা ভারতে এসেছিল এই পথে।

কোহিমায় জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল ইংরেজের আর এই যুদ্ধে নাগারা ইংরেজকেই সাহায্য করেছিল। কিন্তু আমি অন্যত্র পড়েছি যে নাগারা ইংরেজকে সাহায্য করে নি, জাপানীদেরও না। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজীর দল শুনে বলেছিল, আমরা তোমাদের দলে আছি। আই. এন. এ.-র সেনাদের ওরা সব রকমে সাহায্য করেছে, পথ দেখিয়েছে, খেতে দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্যে।

স্বাতিকে আমি এই কথা বললুম। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শেষ নেতা সুভাষচন্দ্র দেশের বাহিরে গিয়ে স্বদেশ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর আদর্শেই গঠিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় ফৌজ নিয়ে ইংরেজকে উচ্ছেদ করা যাবে না ভেবেই তিনি জাপানীদের সঙ্গে একযোগে ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

১৯৪৪-এর বসন্তকালে অভিযান শুরু হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজে তখন হাজার বারো সৈন্য। তাই দিয়ে চারটি বিগ্রেড গঠিত হয়েছিল। কর্নেল শাহ নওয়াজের অধীনে সুভাষ ব্রিগ্রেড, কর্নেল ইয়াসৎ কিয়ানির অধীনে গান্ধী ব্রিগেড, কর্নেল মোহন সিং-এর অধীনে আজাদ ব্রিগেড ও নেহরু ব্রিগেড কর্নেল ধিলনের অধীনে। এঁরা চারি দিক থেকে মণিপুর আক্রমণের জন্য তৈরি হলেন। ইম্ফলের গুরুত্ব তখন খুবই বেশি। রাজনীতিজ্ঞরা বলেছিলেন যে ইম্ফল যার হাতে থাকবে, তারই হাতে অস্ত্র থাকবে ভারত বা ব্রহ্মদেশ আক্রমণের।

আমেরিকান নিগ্রোদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল ব্রহ্মদেশে, মণিপুরের সীমান্ত থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে। নিগ্রোরা কালাপানি নদীর উপরে একটা সেতু তৈরি করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর রাতুরি তাঁর সেনাদল নিয়ে নিগ্রোদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বিধ্বস্ত করে দিলেন তাদের। নৌকোয় পালাবার চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হল। অনেকে

মারা পড়ল, আর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সবই এল আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে।

দ্বিতীয় যুদ্ধ হল পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে, তারপর একেবারে ভারতের পূর্ব সীমান্তে। মাতৃভূমি উদ্ধারের সংকল্প যাদের বুকের রক্তে, কোন যুদ্ধেই তারা পরাজিত হল না। সীমান্তের বৃটিশ সৈন্যকে পরাজিত করে বিজয় গর্বে বুক ফুলিয়ে তারা ভারতের মাটিতে পদার্পণ করল।

ইম্ফলের দিকে পথ এসেছে টিড্ডিম থেকে, টামু থেকে, আর উখরুল থেকে। উখরুলের উত্তরে কোহিমা আর দক্ষিণে ইম্ফল। ভারত থেকে দুটো পথ এসেছে ইম্ফলে—প্রধান পথ ডিমাপুর থেকে কোহিমার উপর দিয়ে, আর দ্বিতীয় পথ শিলচর থেকে বিষেণপুর হয়ে ইম্ফলে পৌঁছেছে। সমস্ত দিক থেকে একযোগে ইম্ফল আক্রমণের জন্য গোটা আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি হল।

২৮শে এপ্রিল শাহ নওয়াজ নেতাজীর কাছে ইম্ফল আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নেতাজী উত্তর দিলেন, আজাদ ব্রিগেড আর গান্ধী ব্রিগেড ইম্ফল আক্রমণ করছে, আর তোমার সুভাষ ব্রিগেড তৈরি থাক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইম্ফল আমাদের হস্তগত হবে, আর তুমি এগিয়ে যাবে ব্রহ্মপুত্রের পরপারে। শাহ নওয়াজ আর এক মুহূর্ত নষ্ট করলেন না, অগ্রসর হলেন কোহিমার দিকে।

ব্রহ্মদেশের দুর্গম অরণ্যে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করেছে সৈন্যদের। কিন্তু তার জন্য উদ্যম কারও কমে যায় নি। জাপানীদের জীপে চড়ে সৈন্যরা টামুতে এসে পৌঁছল, তারপর পায়ে হেঁটে উখরুল, উখরুল থেকে কোহিমা। কোহিমায় জাপানীরা যুদ্ধ করে নি ইংরেজের সঙ্গে, যুদ্ধ করেছিল ভারতের মুক্তি সংগ্রামী আজাদ হিন্দ ফৌজ। আর এই যুদ্ধে নাগারা তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল বলে শুনেছি। ইংরেজের উপরে নাগাদের রাগ অনেক কালের। ইংরেজ তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছিল, তাদের মুক্তি সংগ্রামের

নেতা রানী গাইদিলিওকে রেখেছিল বন্দী করে। বিদেশী বন্ধু জাপানীদেরও তারা চায় নি। তারা শুনেছিল নেতাজীর নাম, নেতাজীর আদর্শ স্বাধীনতার আদর্শ। শুধু নাগাদের আদর্শ নয়, বিশ্বের সকল পরাধীন জাতির আদর্শ। এই আদর্শের জন্য তারাও প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে। তাই তারাও দলে দলে এগিয়ে এসে বলেছিল, আমাদেরও দলে নাও, আমরাও তোমাদের সঙ্গে আছি। সুভাষচন্দ্র আমাদেরও নেতাজী, আমরাও তাঁকে তোমাদেরই মতো ভালবাসি।

তারপরে শুরু হল আসামের দুরন্ত বর্ষা। দুর্গম পাহাড়ে তাদের খাদ্য সরবরাহের পথ ভেসে গেল। পরিত্যক্ত পল্লী থেকে যে চাল পাওয়া গেল, তাই তারা খেতে লাগল ঘাসের সঙ্গে সেদ্ধ করে। এ ছাড়া আর কোন খাদ্য নেই। এক ফোঁটা নুন পর্যন্ত জুটল না। তারপরে সেই ভীষণ মাছিগুলো, একবার কামড়'লে আর রক্ষা নেই, ঘা হয়ে পোকা হবে সেই ঘায়ে। ডাক্তার হাত গুটিয়ে বসে আছেন, ফুরিয়ে গেছে সব ওষুধ। কিন্তু মনোবল কারও ফুরিয়ে যায় নি। সেনাপতিরা বলছেন, হুকুম দাও, ইম্ফল আমরা এখনও অধিকার করতে পারি। কিন্তু জাপানী সেনাপতির অন্য হুকুম এল, অবস্থা এখন প্রতিকূল. পিছিয়ে এসো।

বড় সেনাপতির আদেশ। মানতেই হবে। ভগ্ন মনোরথে শাহ নওয়াজ খান তাঁর ক্ষুব্ধ সেনাবাহিনী নিয়ে পিছিয়ে এলেন। বর্ষা শেষ না হলে ইম্ফল আক্রমণ করা হবে না। সৈন্যরা বলল, না, জাপানীদের কথা আমরা মানব না, ওরা ঠকাচ্ছে আমাদের।

এ কথা জানিতে পেরে জাপানীরা নালিশ করল নেতাজীর কাছে। নেতাজী সবাইকে ফিরিয়ে আনলেন ব্রহ্মদেশের চিন্দুইন নদীর পারে। বললেন, আমরা ভারত স্বাধীন করব, নয় মরব, এই সংকল্পের বলেই জয়ী হচ্ছিলাম। বুকের রক্ত দিয়ে ত্যাগের যে ঐতিহ্য আমরা সৃষ্টি করেছি; স্বাধীন ভারতের ভাবী সৈন্যদের তাই অনুকরণ করতে হবে।

প্রচণ্ড বর্ষাতেই আমাদের পরিকল্পনা ব্যাহত হল, আমাদের অভিযান আমরা সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখলাম।

দুঃখে কষ্টে খাদ্যাভাবে অন্যান্য বিগ্রেডের সৈন্যরাও পিছু হটতে চায় নি। নাগারাও এগিয়ে এসে বলেছিল, তোমরা পিছিয়ো না, আমাদের খাদ্য আমরা তোমাদের দেব। তোমরা ইংরেজদের তাড়াও, বিদেশীদের তাড়াও, আনো নেতাজীকে, তাঁকে আমরা রাজা বলে মানব।

কিন্তু হাজার হাজার সৈন্যকে নাগারা কত দিন খাওয়াতে পারে! জাপানী সেনাপতিদের হুকুমে তাদেরও পিছিয়ে আসতে হল, মানতে হল নেতাজীর আদেশ।

এর পরে আর যুদ্ধ হয় নি। যুদ্ধ করবার জন্য আদেশ দেয় নি কেউ। আজাদ হিন্দ ফৌজ হারিয়ে ছিল নেতাজীকে, নেতাজী হারিয়ে গিয়েছিলেন। আর তাঁকে কোন দিন দেখতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাঁর বাণী আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৪৫ সালের একুশে এপ্রিল তিনি তাঁর সেনাদের বলেছিলেন, ইম্ফলে ও ব্রহ্মদেশে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, কিন্তু এ মাত্র সূচনা—বার বার আমাদের সে চেষ্টায় ব্রতী হতে হবে। চিরদিন আমি আশা পোষণ করে এসেছি—তাই পরাজয় বরণ করে নিতে পারব না। ইম্ফলের সমতল ক্ষেত্রে, আরাকানের জঙ্গল ও ব্রহ্মদেশে আপনারা শত্রুর বিপক্ষে সংগ্রাম করেছেন। আপনাদের মুক্তি সংগ্রামের এ বীরত্ব কাহিনী চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে থাকবে।

সত্যিই এ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়েছে সোনার অক্ষরে। আর নেতাজী অমর হয়ে রইলেন মানুষের মনে।

## ২৭

লোগতাক লেক থেকে মইরাঙের শহরে ফিরে এসে একটা হোটেলে আমরা দুপুরের আহার সেবে নিয়েছিলুম। হোটেলের চেহারা দেখে ভক্তি হয় নি একটুও, কিন্তু খাদ্য খারাপ নয়, সস্তাও খুব। লেকের মাছ, স্বাদ আছে সেই মাছে। ভয় শুধু একটা টক দেওয়া তরকারিতে। খাবার পরে জেনেছিলুম যে তাতে শুঁটকি মাছ ছিল।

ইম্ফলে ফেরার জন্যে বাস ও মিনি বাসের অভাব ছিল না। বিকেলে সময় মতোই আমরা ফিরে আসতে পেরেছিলুম।

পরদিন সকাল নটা পনের মিনিটে আমাদের প্লেন আকাশে উড়বে। সাড়ে সাতটায় শহরের অফিসে পৌঁছলে এয়ার লাইন্সের বাসেই এয়ারপোর্টে যাওয়া যাবে। তাই আমরা তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়েছিলুম রাতেই। এয়ার লাইন্সের বাসেই আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলুম। এখানে পৌঁছবার পরে জানতে পারলুম যে ইম্ফল থেকেও সরাসরি গৌহাটি যাওয়া যায়। গৌহাটির যাত্রীরাও আমাদের সঙ্গে এসেছেন এবং আমাদের আগেই উড়ে যাবেন। তাই চেকিংএর জন্য আমাদের দু লাইনে দাঁড়াতে হল।

এয়ার লাইন্সের বাসের ড্রাইভার ইম্ফল থেকে যাত্রার আগেই আমাদের বাসের টিকিট দিয়েছিল। আমরা মিজোরামে যাচ্ছি শুনে ভারি খুশী হয়েছিল সে। এইবারে আমাদের সাহায্যের জন্য এসে উপস্থিত হল। সুটকেশ বিছানা খুলে এখানে পুলিসের চেকিংএর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে আমাদের মালপত্র খুলতে দিল না। পুলিসকে বলল, আমাদের লোক। তার পরে আমাদের টিকিট দু-খানা চেয়ে নিয়ে মালপত্র ওজনের পরে পাঠিয়ে দিয়ে ব্যাগে লেবেল ঝুলিয়ে দিল। বোর্ডিং টিকিটও এনে দিল আমাদের হাতে। তার

পরে একটি মিজো পরিবারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলে দিল আমাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তারা যেন দেখে। কিন্তু তারা আমাদের কথা বোঝে না বলে শুধু হাসি দিয়ে তাদের সম্মতি জানিয়ে দিল।

কথায় কথায় জানতে পারলুম যে এই ভদ্রলোক বর্মা থেকে রিফিউজী হয়ে এসেছিল, বিয়ে করেছে এক মিজো মেয়েকে। তাই তার শ্বশুর বাড়ির দিকে কেউ যাচ্ছে জেনে ভারি খুশী হয়েছে। অযাচিত ভাবে আমাদের সাহায্য করে সে নিজেই আনন্দ পেয়েছে। বলল: মিজোরাম সম্বন্ধে লোকে অকারণে ভয় পায়। কিন্তু আইজলে পৌঁছলেই বুঝতে পারবেন যে সে কত সুন্দর জায়গা।

এক সময়ে আমাদের সিকিউরিটি চেকিংএর নির্দেশ এল। আমরা দুজনে দুখানা বোর্ডিং টিকিট হাতে নিয়ে দু দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লুম এবং চেকিংএর পরে একটা ঘরেই দুজনে আবার পাশাপাশি বসলুম।

যথা সময়ে প্লেনে ওঠবারও নির্দেশ এল। বাইরে বেরিয়ে দেখলুম, ছোট একটি প্লেন দাঁড়িয়ে আছে—ফকার ফ্রেণ্ডশিপ। পুরনো প্লেন, কিন্তু আরামপ্রদ কম নয়। এক ধারেই পাশাপাশি আমাদের সিট পড়েছিল। স্বাতি জানালার ধারে বসল। নরম গদির মধ্যে আমরা যেন তলিয়ে গেলুম।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: এই বোধহয় আমাদের প্রথম এক সঙ্গে প্লেনে ভ্রমণ।

খুব সত্যি কথা। কিন্তু তবু আমি বললুম: তাই কি!

স্বাতি বলল: দেশ দেখতে বেরিয়ে আমরা কখনও প্লেনে উঠি নি। আর এমনি করে বসি নি পাশাপাশি।

কিছু দিন আগের কথা আমার মনে পড়ল। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আমি দার্জিলিঙের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলুম। আর স্বাতি সেই খবর পেয়ে দিল্লী থেকে উড়ে এসেছিল প্লেনে। দিল্লী

থেকে কলকাতা ও কলকাতা থেকে বাগডোকরা, তারপর মোটরে দার্জিলিঙ। সেদিন আমার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক ছিল!

আমার ওপরওয়ালা মিস্টার ইনিস ডাক্তারের সঙ্গে আমায় দেখতে এসে কুশল জিজ্ঞাসার পরে বলেছিলেন, শি ইজ কামিং টুমরো।

আমি বলেছিলুম: তাই তো শুনলুম।

শি ইজ ইওর—

লজ্জিত ভাবে আমি বলেছিলুম, শি ইজ মাই—

কথাটা আমি শেষ করতে পারি নি, ভেবে পাই নি কী সম্পর্ক বলব। তার আগেই সাহেব বলেছিলেন, বুঝেছি।

তাঁর মুখে ছিল সরল প্রসন্ন হাসি, ডাক্তারও হাসছিলেন। আর আমি আরও লজ্জা পেয়েছিলুম।

ইভার কথা আমার মনে পড়ে গেল। গৌহাটি ছাড়বার আগে সে আমাকে যে চিঠিটা দিয়েছিল, সেই চিঠি দিল্লী থেকে স্বাতি আমাকে লিখেছিল অনেক দিন পরে। আমি তার জবাব লিখে ফেলেছিলুম, কিন্তু ডাকে দেওয়া হয় নি। দুর্ঘটনার সময়ে সেই চিঠি আমার পকেটে ছিল। আর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ স্বাতির ঠিকানা পেয়ে টেলিগ্রামে খবর দিয়েছিল তাকে। সেদিন ইভা আমাকে স্বাতির চিঠিখানা অফিস থেকে এনে না দিলে আমাদের জীবনের ধারা আজ কী ভাবে বইত জানি নে।

সহসা স্বাতি আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কী ভাবছ?

বললুম: ইভার কথা।

স্বাতি বলল: আইজলে তার স্বামীর খবর নিতে ভুল হলে চলবে না।

খানিকটা রহস্য আছে বলে মনে হচ্ছে, তাই না?

দরকার হলে আমাদের গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

কোমরে বেল্ট বেঁধে নেবার নির্দেশ পেয়েছিলুম। আলতো ভাবে

নিয়ম রক্ষাও করেছিলুম। এইবারে মনে হল প্লেন আকাশে উড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

স্বাতি বলল: কুড়ি মিনিট সময় লাগে শুনেছি।

বললুম: আকাশে তাহলে আরও কম সময় থাকবে।

স্বাতি বলল: সময়ের দিকে নজর রাখব।

দেখতে দেখতেই আমরা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়লুম, নিচে থেকে উপরে, আরও উপরে। মেঘের সমুদ্র ভেদ করে উপরে উঠে নিচের মেঘ আর পাহাড় দেখতে লাগলুম। নিচের পাহাড় এখন আকাশ থেকে তোলা রঙীন ছবির মতো মনে হচ্ছে। পাহাড় শুধু পাহাড়, গাছ পালা নদী নালা আর চেনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে মেঘের ভিতরে আমরা ঢুকে যাচ্ছি। ঝপ করে খানিকটা নেমে যাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। আবার সামলে নিচ্ছি মেঘের সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে।

প্লেন ছাড়বার আগে এয়ার হস্টেস আমাদের লজেন্স দিয়ে গিয়েছিল। সেই লজেন্স শেষ হবার আগেই আবার বেল্ট বাঁধবার নির্দেশ এল। নিচের পাহাড় এখনও শেষ হয় নি, স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেই পাহাড়। প্লেন নামছে।

এ প্লেন শিলচরে নামবে না। নামবে মাইল আঠারো দূরে কুম্ভী গ্রামে। এটাই শিলচরের এয়ারপোর্ট। এখানে নেমেই মোটরে বা বাসে শিলচরে যেতে হয়। শহর থেকে আর কোন এয়ারপোর্ট বোধহয় এত দূরে নয়।

এক সময়ে বুঝতে পারলুম যে প্লেনের চাকা মাটি ছুঁয়েছে। স্বাতি তার ঘড়ি দেখে বলে উঠল: কুড়ি মিনিট এখনও হয় নি।

তার মানে কুড়ি মিনিটও আমরা আকাশে রইলুম না, তার আগেই মাটিতে নেমে পড়লুম। প্লেনের দরজা খুলে দেবার পরে ধীরে ধীরে আমরা নিচে নামলুম। নেমেই চ্যাটার্জিকে দেখলুম নিচে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল: আপনাদের ব্যাগটা আমার হাতে দিন।

তার হাতেও একটা ব্রিফ কেস ছিল। তাই দেখে বললুম: কেন?

ওটা ভারি বলে মনে হচ্ছে।

না।

বলে আমার হাত সরিয়ে নিলুম।

এ সেই কমার্সিয়াল রিপ্রেজেণ্টেটিভ চ্যাটার্জি। ইনিই আমাদের সঙ্গে কোহিমা থেকে ইম্ফলে এসেছিলেন। তাই স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: আপনি এখানে!

ভদ্রলোক হেসে বললেন: আমিও আপনাদের সঙ্গে এলাম। আমার খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে ইম্ফলে আমাকে দেখতে পান নি।

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা টার্মিনাল বিল্ডিংএ এলুম। ছোট বাড়ি, কিন্তু পুরনো নয় বলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ত্রিপুরার কুটীর শিল্পের দোকান আছে একটা। স্বাতি বলল: এয়ার লাইন্সের বাসেই আমরা শিলচরে যাব!

আমাদের দুটো লাগেজ আছে প্লেনে। টিকিট দুটো তাই একজন পোর্টারকে দিলুম।

খানিকক্ষণ পরেই চ্যাটার্জি এসে বললেন: দু ঘণ্টা এখানে বসে থাকবেন কেন! আমরা একটা ট্যাক্সি ঠিক করেছি। শেয়ারে চলে যাব। মাথা পিছু পাঁচ টাকা লাগবে। আর এয়ার লাইন্সেও তো চার টাকার কম নয়!

স্বাতি বলল: ট্যাক্সি রাস্তায় আটকে থাকবে না তো!

সে ভয় থাকলে ট্যাক্সি নিয়ে সবাই চলে যেত না। আমরা কোন রকমে একখানা আটকেছি।

আমরা মানে!

আমার সঙ্গে আর দুজন আছেন।

স্বাতি বলল: খুব ভাল কথা। আপনার সঙ্গে আমরাও আছি।

লাগেজ আসবার পরে আমরা যাত্রা করলুম। দীর্ঘ পথ, যেন ফুরোতেই চায় না। শেষ পর্যন্ত বরাক নদীর পুল পেরিয়ে আমরা শিলচরে প্রবেশ করলুম।

চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় উঠবেন ঠিক করেছেন?

স্বাতি বলল: ইলোরা আর অজন্তা এই দুটো হোটেলের নাম জানি।

আমি বললুম: একটা রাত কাটাতে পারি এই রকমের একটা জায়গা দরকার।

চ্যাটার্জির এক সঙ্গী সামনে থেকে বললেন: আমি আপনাকে একটা নতুন হোটেলে পৌঁছে দেব। ইলোরা বা অজন্তার চেয়ে তা খারাপ হবে না।

বলে আমাদের একটা নতুন তৈরি হোটেলে নামিয়ে দিলেন। দোতলায় ঘর পাওয়া গেল, চলনসই ঘর। দুপুরে মাছের ঝোল ভাতও পাওয়া যাবে।

মিজোরামে যাবার জন্যেও আমাদের ইনার লাইন পারমিটের দরকার। নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের পারমিট আমাদের পকেটে ছিল, কিন্তু কোথাও কেউ দেখতে চায় নি। তা হলেও পারমিট না থাকলে নাকি বাসে উঠতে দেয় না, কিংবা নামিয়ে দেয় বাস থেকে। তাই আমি মিজোরামের টুরিস্ট লিটারেচার দেখে একটা নাম মুখস্থ করে রেখেছিলুম। পাচুঙ্গা বিল্ডিং। এই বাড়িতে মিজোরামের সরকারী অফিস আছে। এইখানে গিয়ে পারমিটের জন্য আবেদন করতে হবে।

এক পেয়ালা চা খেতে খেতে আমি স্বাতিকে বললুম: তুমি বিশ্রাম কর, আমি কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে আসি।

বলে একটা রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। পাচুঙ্গা বিল্ডিং সে চেনে না। কিন্তু মিজোরামের অফিসে আমাকে পৌঁছে দিল। বলল: আইজলের বাসও এইখান থেকে ছাড়বে ভোর ছটায়, আর পাঁচটায় এসে টিকিটের জন্যে লাইন দিতে হবে।

রিক্সার ভাড়া এখানে পঞ্চাশ পয়সা। পঞ্চাশ পয়সায় এখানে অনেক দূর যাওয়া যায়।

টুরিস্ট লিটারেচারে লেখা:ছিল লিয়াসন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এখানে দেখলুম যে তিনি একজন ডেপুটি ডিরেক্টারও। সামনেই তাঁর পর্দা টাঙানো ঘর। পর্দাটা একটু সরিয়ে দেখলুম যে তিনি টেলিফোন করছেন। আমার মুখখানা দেখেই ফোনের রিসিভারটা সরিয়ে বলে উঠলেন: পারমিট? প্লিজ গো টু মাই অফিস।

পিছনের দিকে অফিসে ঢুকে দেখলুম যে যাঁর কাজ তিনি তখনও আসেন নি। অন্য একজনের সহায়তায় একখানা দরখাস্ত লিখে তাঁর হাতে দিতেই বললেন: সাহেবের হাতে দিন।

ফিরে এসে দেখলুম যে সাহেবের প্রহরী দরজা রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, বলল: স্লিপ লিখে দিন।

বলে একখণ্ড কাগজ হাতে দিল। আমি আমার পুরো নামটা লিখে কাগজের টুকরোটা তার হাতে ফিরিয়ে দিলুম। সেও সেটি তার সাহেবের হাতে দিয়ে এল।

একটু পরেই আমার ডাক পড়ল। কালো সাহেব, এই অঞ্চলেরই যে অধিবাসী তা তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পারলুম। খাঁটি মাতৃভাষায় বললেন: নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে কেন? আপনিই কি—

বললুম: আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই অধম।

ভদ্রলোক চিৎকার করে বললেন: তা আপনি আমার কাছে না এসে অফিসে গিয়েছিলেন কেন? কেন এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? আগে বসবেন তো, চা খাবেন তো। তার পরে গল্প হবে। কাজের জন্য ভাবনা কী?

বলে প্রচণ্ড হাঁক ডাক করে চা আনতে দিলেন, দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন: কাউকে এখন ঢুকতে দেবে না। সারাক্ষণ কাজ আর কাজ, আমি কি মানুষ নই, আমার কি নিজের কোন কাজ থাকতে পারে না!

তার পরে আমার দিকে ফিরে বললেন : আইজলে কোথায় উঠবেন আপনি ?

কোন রকমে বলতে যাচ্ছিলুম : হোটেল শ্যাংগ্রিলা আর আইজল লজের নাম শুনেছি। কিন্তু কিছু বলবার সুযোগই পেলুম না। তিনি টেলিফোন তুলেই আইজলের কানেকশন চাইলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পরে কোন বন্ধুকে পেয়ে যেসব কথা বললেন, তা শুনে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। তিনি বললেন যে একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখক আইজলে যাচ্ছেন। আর তাঁরা এখনও নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন! তারপরে যা যা করতে হবে তা এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন। সার্কিট হাউসের দোতলায় একটা ভি. আই. পি. রুম অ্যালট করতে হবে, আর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে গাড়ি করে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে হবে। তারপর খাওয়া দাওয়া শহর দেখানো রিসেপ্‌শন আরও কত কি করতে হবে সব এক নিঃশ্বাসেই বলে গেলেন। উপসংহারে বললেন : দেখুন, আমি সবাইকে জনে জনে বললাম না। আপনাকেই সব কথা বললাম। কোন গোলমাল হলে আমি আপনাকেই দায়ী করব।

বলে টেলিফোন রেখে দিলেন।

আমাদের চা এল। খুব কড়া তেতো চা। কিন্তু ভদ্রলোকের খাতিরে তাই দু-এক চুমুক খেতে হল। চা শেষ করে তিনি বললেন : আপনাদের তো লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে! আপনি কষ্ট করে তিনটের সময়ে একবার আসুন। আপনাদের পারমিট আমার টেবিলে থাকবে।

বললুম : অ্যাড্‌ভান্স টিকিটের ব্যবস্থা আছে কি ?

সে ব্যবস্থাও আমি করে দেব।

আমি তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলুম।

বেলা তিনটের সময় এসে আমি ইনার লাইন পারমিট পেয়ে

গেলুম। ভদ্রলোক বললেন: এটা পকেটেই রাখবেন। পথে এটা চেক হবে।

তারপরে একজন কর্মচারীকে ডেকে বললেন: কাল এক নম্বর আর দু নম্বর টিকিট বিক্রি হবে না, এঁর জন্যে রিজার্ভ থাকবে। সময় মতো এঁদের হাতে দিয়ে দেবেন।

আমি তাঁর দিকে চেয়ে বললুম: ভাড়ার টাকাটা আপনার কাছেই জমা রেখে যাই?

তাই দিন।

ভাড়ার টাকাটা আমি ভদ্রলোকের হাতে দিতেই তিনি বিদায় নিলেন।

আমার জন্যে আবার চা এল। সেই কড়া তেতো চা। কিন্তু ভদ্রলোকের আন্তরিকতায় এতটুকু ফাঁক নেই বলে হাসি মুখেই সেই চা খেতে হল। তিনি বললেন: ফেরার সময়ে এক দিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন। পুরনো কাছাড় রাজাদের কিছু নিদর্শন আছে খাসপুরে, তা আপনাদের দেখিয়ে দেব।

মিজোরাম টুডে নামে একখানি সচিত্র ইংরেজী পত্রিকা নাম লিখে তিনি আমায় উপহার দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলেন। আমি আবার তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলুম।

# ২৮

রাত থাকতেই আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বেরিয়ে দেখলুম যে অন্ধকার কিছু স্বচ্ছ হয়েছে, কিন্তু আকাশে আলো ফোটে নি। রাতে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল এক পশলা, পথ ঘাট তাই ভিজে দেখাচ্ছে। কিংবা প্রচুর শিশির পড়েছে। আকাশে মেঘ আছে কিনা তা বোঝা গেল না।

ভোর পাঁচটায় আমরা বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে নিলুম। নিচে হোটেলের সামনে তখন অনেকগুলো রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু হোটেলের কেউই জাগে নি। নিজেদের মালপত্র গুছিয়ে রেখে আমরা নিচে গেলুম। একটি মিজো পরিবার বেরোবার জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু হোটেলের সদর দরজা বন্ধ বলে বেরতে পারছিল না। স্বাতি বলল: দেখেছ, সেই পরিবার!

সেই পরিবারই। ইম্ফল থেকে এরা আমাদের সঙ্গে এসেছে। কিন্তু এদের সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারব না। তারাও আমাদের চিনল। হাসল একটুখানি। এই হাসি দিয়েই বুঝিয়ে দিল যে আমরা যে একই হোটেলে উঠেছিলুম তা আগে বুঝতে পারে নি।

হোটেলের দরজা খুলে দেবার পর আমরা বাইরে এলুম। রিক্সাওয়ালারাই আমাদের মালপত্র উপরের ঘর থেকে নিচে নামিয়ে আনল। আমরা যাত্রা করলুম।

বাস স্ট্যাণ্ডে মিজোরামের বাস এসে লাগে নি। টিকিট ঘরও খোলে নি। তাই যাত্রীদের মালপত্র পথের ধারে নামিয়ে রেখেই রিক্সাওয়ালারা ফিরে যাচ্ছে ডবল ভাড়া আদায় করে।

টিকিট ঘর খোলবার পরে আমাদের টিকিটের খোঁজে গেলুম, কিন্তু পেলুম না। কেউ জানে না আমাদের কথা। স্বাতি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল: লাইনে দাঁড়াবে নাকি?

ঠিক এই সময়েই অফিসের ভিতর থেকে আমার নাম ধরে কেউ ডাকল। আমি শুনতে পাই নি, শুনেছিলেন লাইনের এক ভদ্রলোক। তিনি আমার নামটা জোরে বলতেই আমি লাফিয়ে অফিসে গিয়ে ঢুকলুম। অন্য এক ভদ্রলোক এক নম্বর ও দু নম্বর টিকিট দুটো আমার হাতে দিলেন।

এই ভাবে ডেকে ভিতরে টিকিট দেওয়া নিয়ে বাইরে খানিকটা গোলমাল হল। কিন্তু সবাই টিকিট পাচ্ছে বলে ব্যাপারটা বেশি-দূর গড়াল না। পরে অবশ্য কয়েকজন যাত্রীকে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাঁরা ব্যাপারটা দেখতে পান নি।

বিপদে পড়া গেল বাস এসে দাঁড়াবার পরে। প্রথম বিপদ, বাস স্ট্যাণ্ডে কুলি নেই। অনেক কষ্ট করে রাস্তার একটা লোককে ধরে পয়সার লোভ দেখিয়ে নিজেদের মালপত্র বাসের উপরে তোলালুম। শুনলুম যে আইজলেও কুলি নেই। মিজোরা কুলির কাজ করে না। তাই উপরের মালপত্র নিজেদেরই নিচে নামাতে হবে।

দ্বিতীয় বিপদটি জানতে পারলুম স্বাতির কথায়। বাসে উঠেই সে বলে উঠল : অসম্ভব, এ সীটে সাত-আট ঘণ্টা বসে থাকা যাবে না।

আমি উপরে উঠে দেখলুম, কথাটা ঠিকই। একেবারে সামনের দিকে এক নম্বর ও দু নম্বর সীট, ঠিক চাকার উপরে। তাই পা ছড়িয়ে তো দূরের কথা, হাঁটু মুড়ে বসতে হবে। এর চেয়ে কষ্টের সীট বাসে আর একটিও নেই। কিন্তু বাস ভরে গেছে বলে বদলাবারও আর উপায় নেই। আমি হাসবার চেষ্টা করে বললুম : তুমি জানলার ধারে বোসো।

কিন্তু ওধারে তুমি বসবে কী করে!

বললুম : আমার জন্যে ভেবো না।

তা হলে কার জন্যে ভাবব!

বলে স্বাতি কোন রকমে ভিতরে ঢুকে বসল। ব্যাগটা রাখল আমার বসবার জায়গায়

হোটেলে আমরা চা পাই নি, এখানেও ধারে কাছে কোন খাবার দোকান নেই। টিকিট ঘরের কাছাকাছি একটা ছোট দোকানে উনুনে আঁচ দিচ্ছিল দেখেছিলুম। সেখান থেকেই দু ভাঁড় চা সংগ্রহ করে আনলুম, আর বাসের নিচে দাঁড়িয়েই একটা ভাঁড় দিলুম স্বাতির হাতে।

বাস ছাড়তে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। স্ট্যাণ্ড থেকে ছেড়ে শিলচর শহর পরিক্রমা করে একটা পেট্রল পাম্পে এসে গাড়িতে ডিজেল তেল ভরে নিল। তারপর শুরু হল যাত্রা। কিন্তু সঙ্কীর্ণ সমতল পথ যেন শেষ হয় না। এ আসাম জেলার অন্তর্গত কাছাড় জেলার পথ। এই পথের উপরে গ্রাম গঞ্জ পেরিয়ে বহু দূর যাবার পরে দূরের দিগন্তে পাহাড় দেখা দিল। মিজোরাম রাজ্য ঐ পাহাড়ের উপরে অবস্থিত।

মিজোরাম এখন ভারতের অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন টেরিটরি। কিন্তু একুশে জানুয়ারী ১৯৭২ সালের আগে এটি আসামের একটি জেলা ছিল, নাম লুশাই হিলস। কর্নেল লেউন বলেছিলেন যে শব্দটা লুশাই নয়, লুশেই। লু মানে মাথা, আর শে মানে কাটা। কাজেই লুশেই কথাটার মানে হল যারা মাথা কাটে। এখন তাই মিজোরামের কেউ নিজেদের লুশাই বলে পরিচয় দেয় না। নিজেদের বলে মিজো। মিজো মানে পাহাড়ী বা পর্বতবাসী, আর মিজোরাম মানে পর্বতবাসীদের দেশ।

মিজোরা মঙ্গোলয়েড জাতির লোক। আপার বার্মা থেকে তারা এই পাহাড়ে এসে বসবাস শুরু করে সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝে। তখন তারা নাগাদের মতোই হেড-হাণ্টার নামে পরিচিত ছিল। এই কাজের জন্যে তারা অবিভক্ত বাঙলার গ্রামে গঞ্জে নেমে এসে উৎপাত করত। তাদের দমন করতে হিমসিম খেত ইংরেজ। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ মিশনারীরা এল এই জেলায়, ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনল এই পাহাড়ী মানুষদের জীবনে।

মিশনারীরা শুধু তাদের ধর্মান্তরিত করে নি, তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করেছে। এদের ভাষার কোন লিপি ছিল না, তারা এদের রোমান লিপি শিখিয়েছে, শিখিয়েছে ইংরেজী। এদের গীটার উপহার দিয়েছে, আর পশ্চাত্য সঙ্গীত। মিজোরা আজ ভারতের একটি শিক্ষিত ও সঙ্গীতপ্রিয় জাতি। শিক্ষার ক্ষেত্রে দিল্লী ও চণ্ডীগড়কে বাদ দিলে কেরালার পরেই মিজোদের স্থান। রাজ্যে এদের অর্ধেকের বেশি লোক শিক্ষিত।

এই রাজ্যের আয়তন একুশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার, মণিপুর ও মেঘালয়ের আয়তন এর চেয়ে কিছু বেশি, কিন্তু নাগাল্যাণ্ড অনেক ছোট। তার আয়তন সাড়ে ষোল হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার। মিজোরামে তিনটি জেলা আইজল, লুঙ্গলেই ও ছিমহইপুই। এদের প্রধান শহর আইজল, লুঙ্গলেই ও সাইহা। আইজল এই রাজ্যেরও প্রধান শহর। তিন লক্ষ বত্রিশ হাজারের কিছু বেশি এই রাজ্যের জনসংখ্যা। কিন্তু হিন্দী ভাষা প্রায় অচল। মিজো বা ইংরেজী ভাষায় সব কাজ চালাতে হয়।

মিজোরামের সমস্ত পাহাড়ই উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। সাধারণ ভাবে এই সব পাহাড়ের উচ্চতা তিন হাজার ফুট। সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম ফউঙ্গপুই, ইংরেজীতে বলে ব্লু মাউন্টেন, নীলগিরি। এই শিখরটি সাত হাজার একশো ফুট। রাজ্যের দক্ষিণে লুঙ্গলে নামে যে শহর আছে, তারও দক্ষিণে এই পাহাড়। নদীগুলো এই সব পর্বত শ্রেণীর মাঝখানের খাদ দিয়ে কোনটা উত্তর থেকে দক্ষিণে কোনটা বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। সমস্ত রাজ্যটাই পার্বত্য, জলের অভাবও আছে। তবু শতকরা প্রায় নব্বইজন অধিবাসীই কৃষিজীবী। কুটীর শিল্পের মধ্যে তাঁতই প্রধান।

এইবারে আমরা পাহাড়ের নিকটে এসে পড়েছি। কাছেই কোথাও মিলিটারি ছাউনি আছে বলে মনে হচ্ছে। পথের ধারে নানা জায়গায় তাদের যানবাহন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের

বাস এখানে দাঁড়াল না। পাহাড়ের উপরে ওঠা শুরু করল। কখন আমরা কাছাড় জেলা অতিক্রম করে মিজোরামে পৌঁছলুম তা খেয়াল করতে পারলুম না।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে দেখল যে ইতিমধ্যে আমি একটু পা ছড়িয়ে বসবার কায়দা পেয়ে গেছি। আমাদের ব্যাগটা ড্রাইভারের সিটের পিছনে রেখে নিজে একটু কাত হয়ে পা দুটো তুলে দিয়েছি গাড়ির ইঞ্জিনের ঢাকনার উপরে। কখনও ডান পা নামিয়ে টাল সামলাচ্ছি, কখনও বাঁ পা নামিয়ে। স্বাতি আমার পিছনে বসে কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছিল না। এবারে আমাকে দুটো পা নামিয়ে একটুখানি সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করতে দেখে বলল: তুমি কি এই দিকে এসে বসবে?

বললুম: তুমিও তো খুব আরামে নেই, তোমার চোখের ওপরেই সূর্য।

তোমার চেয়ে কম কষ্টের।

তারপরেই বলল: এই দিকে একটা তীর্থস্থান আছে বলে শুনেছিলাম!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: তীর্থস্থান!

হ্যাঁ, তোমার কাছেই শুনেছিলাম যে শিলচর থেকে আইজলের পথে শিবের একটা বিখ্যাত মন্দির আছে।

তীর্থস্থানের কথা আমার মনে পড়ে গেল, বললুম: ভুবননগর থেকে আট মাইল দূরে এই তীর্থস্থান। ভুবন পাহাড়ের উপরে ভুবনেশ্বর শিবের মন্দির।

স্বাতি বলল: সে জায়গা কি আমরা পেরিয়ে এসেছি?

বললুম: বোধহয় না। আসাম সরকারের একটা পুস্তিকায় পড়েছিলুম যে এই তীর্থস্থানটি শিলচর শহর থেকে একত্রিশ মাইল দূরে মিজোরাম রাজ্যে। ভুবননগর পর্যন্ত মোটর বাস আসে, তারপরে আট মাইল হেঁটে উঠতে হয় পাহাড়ের উপরে। সারা

ভারত থেকে তীর্থযাত্রী আসে শিবরাত্রির সময়ে, দোল পূর্ণিমা ও বারুণির গঙ্গাস্নানের সময়েও আসে। পাহাড়ের ওপরে এই মন্দিরে শিব ও পার্বতীর মূর্তি আছে। কিন্তু—

বলে আমি থামতেই স্বাতি বলল: বল।

এই জায়গাটি আমি সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার রোড ম্যাপে পাই নি, মিজোরামের টুরিস্ট লিটারেচারেও এ জায়গার উল্লেখ নেই।

আমি আমার আশেপাশের যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখলুম। কিন্তু প্রশ্ন করে জেনে নেবার মতো কোন লোক দেখলুম না। এই রকমই হয়। ভারতের অনেক দর্শনীয় স্থানের নাম আমরা জানি না, আবার অনেক জানা নামেরও পথের হদিস খুঁজে পাই না। দেশ দেখতে বেরিয়ে আমরা সব সময়েই তাড়াহুড়ো করি। তাই অনুসন্ধান করে জেনে নেবার মতো সময় আমাদের হাতে থাকে না।

আমাদের বাস এইবারে একটি ছোট পাহাড়ী শহরে এসে দাঁড়াল। যাত্রীরা সবাই নামতে লাগলেন এইখানে। ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম যে এখানে আমাদের ইনার লাইন পারমিট দেখাতে হবে। আর প্রাতরাশটাও সেরে নিতে হবে এইখানে। কিন্তু বাস বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না বলে তাড়াহুড়ো করে সব কাজ সেরে নিতে হবে।

স্বাতি বলল: তুমি পারমিট দেখাতে যাও, আমি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করছি।

তাই আমরা দুজনেই ঠেলাঠেলি করে নেমে পড়লুম।

বাস থেকে নেমেই একটা সাইনবোর্ডে এ জায়গার নাম দেখতে পেলুম ভাইরেঙ্‌টে। একটা বাঁশের বেড়া দেওয়া চালাঘরে অনেককে ছুটে গিয়ে ঢুকতে দেখে আমিও সেখানে গিয়ে ঢুকলুম। খাকি পোশাক পরা একজন লোক পারমিটগুলো দেখে দেখে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের পারমিটও দেখে তারা ফেরত দিল। আমি একটা দোকানের সামনে স্বাতির পাশে এসে দাঁড়ালুম।

আমাদের চা তৈরি হচ্ছিল। কিছু খাবার প্রবৃত্তি হল না স্বাতির সঙ্গে বিস্কুট ছিল, সে তাই দিল আমাকে।

হঠাৎ একটা হাসির কথা আমাব মনে পড়ে গেল। নরি রুস্তমজী তাঁর এন্‌চ্যাণ্টেড ফ্রন্টিয়ার্স বইএ লিখেছেন। শিলং থেকে তিনি আইজলে যাচ্ছিলেন, তাঁব সঙ্গে ছিল একজন মণিপুরী বেযারা। এই পাবমিটেব জন্যে সে তার নাম কিছুতেই বলবে না। অথচ ১৮৭৩ সালেব ইনাব লাইন রেগুলেশনে সীমান্ত এলাকায যাবার জন্যে এই পারমিট নিতেই হবে। অনেক বোঝানোব পবে সে তাব নাম বলল মাঙ্কিবা। আব তাব আপত্তিব কাবণও বলল, নামটা তার মাঙ্কির মতো। নবি রুস্তমজী লিখেছেন, তাব চেহারাও ছিল সিমিযান, মানে বাঁদবেব মতো।

এই পাহাড়ে বোধ হয় কমলা লেবুব চাষ আছে। দার্জিলিঙের মতো পাতলা খোসাব লাল কমলা লেবু নয়, মোটা খোসার সবুজ কমলা লেবু। চাযের দোকানে এই কমলা লেবু দেখে স্বাতি গোটা কয়েক কমলা লেবু কিনে নিল। তাব একটা আমাব হাতে দিয়ে বলল : খেয়ে নাও একটা।

যাত্রীরা সবাই বাসে এসে উঠছিলেন। তাই দেখে বললুম : গাড়িতে উঠেই খাওয়া যাবে।

স্বাতি বলল : ভয় নেই, ড্রাইভারের জলযোগ এখনও শেষ হয় নি। সে তাব কণ্ডাক্টরকে পাঠিয়েছে তাড়া দেবার জন্যে।

কথাটা ঠিক। দূর পাল্লাব বাসে ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টরের দিকে নজর রাখতে হয়। সম্ভব হলে তাদের কাছে বসেই খেতে হয়। বেশ নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া যায়। খেয়েদেয়ে ড্রাইভার একটা সিগারেট ধরালেই বুঝতে হবে যে এবারে সে লাফিয়ে উঠেই হর্ন বাজাবে ছ-তিন বার, আর কণ্ডাক্টর পেছন থেকে বাসের গায়ে বার কয়েক চাঁটি মারলেই চলতে শুরু করবে। আমরা আর দেরি না করে বাসে উঠে বসলুম। তার পরে ছাড়ালুম কমলা লেবু। বেশ

পুষ্ট কোয়াগুলো, মিষ্টিও বেশ। এই পথে টাকায় দুটো বড় কমলা লেবু বেশ সস্তা বলে মনে হল।

স্বাতি বোধহয় খানিকটা চলাফেরা করে আরাম পেয়েছিল। পা দুটো ইচ্ছেমতো পরিচালনা করে আমিও প্রচুর আরাম পেয়েছিলুম। বাসে পুনর্মূষিক হয়ে স্বাতি তাই জিজ্ঞাসা করল: কতক্ষণে আইজলে পৌঁছতে পারব বলত পার?

বললুম: অনুমান করতে পারি।

অনুমান কেন, টুরিস্ট লিটারেচারে কিছু পাও নি?

পেয়েছি, কিন্তু যে ভাবে চলেছি তাতে সে কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না।

কেন?

শিলচর থেকে আইজল একশো আশি কিলোমিটার পথ। একশো ষাট কিলোমিটারে একশো মাইল, আরও ধর সাড়ে বারো মাইল। বাসে এই পথ পেরোতে নাকি ছ ঘণ্টা সময় লাগে।

তার মানে ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগেও চলতে হয় না।

তা নয়। পথে যে সময় নষ্ট হচ্ছে, সে কোথায় যাবে! বাস ছাড়তে দেরি হয়েছে, ফুয়েলিঙে সময় লেগেছে, তারপরে এই চেকিং আর ব্রেকফাস্ট, এর পরে লাঞ্চ। তার মানে বিকেলের চায়ের আগে পৌঁছতে না পারলে তার জন্যেও হয়তো কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হতে পারে।

স্বাতি বলল: কিন্তু হিসেব মতো তো লাঞ্চের আগে পৌঁছনো উচিত।

উচিত অনেক কিছুই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সবই অন্য রকম।

এখন আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছি। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। উঁচু নিচু পথ। কখনও উঠছি, কখনও নামছি, এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে যাচ্ছি। চারিদিকের গাছপালা দেখে বুঝতে পারছি যে ভাল বৃষ্টি হয়েছে এই পাহাড়ে। তাই সব

সবুজ সরস মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিশাল আকারের কলা গাছ দেখতে পাচ্ছি। কলার মস্ত বড কাঁদি। কিন্তু কাছে লোকালয় না দেখে মনে হচ্ছে যে এ বুনো কলা, এ কলা কেউ খায় না। এবারের এ যাত্রায় এই বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলে এক রকমের হলদে ফুল দেখেছি নানা জায়গায়—নাগাল্যাণ্ড মণিপুব ও মিজোরামেও। পাহাড়ের গায়ে বড় বড গাছ, তাব মাথায মাথায় তাবার মতো অজস্র হলদে ফুল। হেলিয়েন্থাস বা ছোট জাতের সূর্যমুখী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তা নয়, ক্লোনডাইকও নয়। দূব থেকে এক পলকে দেখে এব জাত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে পয়েনসেটিয়া চিনতে ভুল হচ্ছে না। টকটকে লাল পাতার ঝুঁটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এ আর অন্য কিছু হতেই পারে না।

বেলা এগাবোটায় আমরা কোলাশিব নামে একটি ছোট পার্বত্য শহবে এসে পৌছলুম। এই পথের সব চেয়ে উঁচু জায়গা এটি। শুনলুম ছ হাজার ফুট উঁচু। বাস এখানে প্রায পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়াবে। যাত্রীবা দুপুরের আহাব সেরে নেবেন এখানে। পথের ধাবেই বাজার, আর অনেকগুলি হোটেল। বাসে দু-তিনজন বাঙালী যাত্রী ছিলেন। তাঁবা একটি নেপালী হিন্দু হোটেলে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁদেব অনুসরণ করলুম আমরা। ভাত ডাল তরকারী ও মুরগির মাংস পাওয়া যাবে এখানে।

খেতে বসবার আগে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কাছাকাছি বাথরূম আছে কোন?

হোটেলের নেপালী মালিক বললেন, একটু আড়ালে আবডালে যেতে হবে। কিন্তু আমাদেরই একজন সহযাত্রী বললেন: একটু পিছিয়ে গিয়ে ডান হাতে ঘুরে একটা বাড়ি দেখবেন—ডাক বাংলো কিংবা রেস্ট হাউস। সেখানে বাথরূম আছে, চৌকিদার আপনাদের দেখিয়ে দেবে।

স্বাতি বলল: এসো, খেতে বসবার আগেই আমরা ঘুরে আসি।

বেশি দূরে নয়। যে পথে এসেছি সেই পথের খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে অন্য পথ ধরে একটুখানি উপরে উঠতে হয়। মস্ত বড় কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ি। নির্বিঘ্নে একটা বাথরুম ব্যবহার করে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম।

বাঙালী যাত্রীরা তখন খেতে শুরু করেছেন। আমাদেরও খাবার এল। নেপালী ভদ্রলোক সপরিবারে এখানে থাকেন। তাঁরাই খাবার পরিবেশন করলেন। ভাল রান্না, পরিতৃপ্তি সহকারে আমরা অন্য দিনের চেয়ে বেশি খেলুম। হয়তো বাসের ঝাঁকানিতে বেশি খিধে পেয়েছিল। কিংবা সকালের প্রাতরাশ হয়েছিল নামমাত্র। আমাদের সহযাত্রীরা আরও ভাত ডাল তরকারী চেয়ে নিলেন। কিন্তু তার জন্যে পয়সা বেশি দিতে হল না। আমরা সে সব নিলুম না বলে দু-এক টুকরো মাংস এনে দিল। দুজনের জন্যে খাবারের দাম দিলুম দশ টাকা।

এখানেও পথের ধারে কমলা লেবু বিক্রি হচ্ছে দু টাকায় ছটা। আকারে কিছু ছোট, কিন্তু সবুজ রঙ অনেকটা হলদে হয়েছে। আবার আমরা কমলা লেবু কিনে বাসে উঠলুম। বাস ছাড়ল পৌনে বারোটায়।

শহরের ঘর বাড়ি ছাড়িয়ে যাবার পরে আমি বললুম: এই কোলাশিব শহরটি এই পথের ঠিক মাঝখানে। তার মানে প্রায় ছ ঘণ্টায় আমরা এই পথটুকু এসেছি।

সর্বনাশ!

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম: ভয় পাবার কিছু নেই। বাস বোধহয় আর কোথাও দাঁড়াবে না। তাই বিকেল চারটে নাগাদ আইজলে পৌঁছতে পারব বলে আশা করছি।

তার পরে নয় কেন!

পাঁচ ঘণ্টার কম সময়ে কোলাশিব এসেছি বলেই একটু

আশাবাদা। আর তা ছাড়া আইজলের উচ্চতা এর চেয়ে কম। আমরা এবারে নিচের দিকে নামব, তাতে সময় কম লাগবে।

কিন্তু বুঝতে পারি নি যে আইজল এই পাহাড়ে নয়. ঐই পাহাড়ের নিচে নেমে আবার আমাদের উপরে উঠতে হবে। যতটা নামতে হবে, উঠতেও হবে ততটা। এই ওঠা-নামার যেন শেষ নেই।

বিকেল চারটের আগেই আমরা আইজল গেটে পৌঁছে গেলুম। পাহাড়ের গায়ে একটা প্রাকৃতিক গেট। এখান থেকে আইজল শহর মাইল পাঁচেক দূরে। কতকটা সমতল পথেই যেতে হয়। এ কথা শুনে মনে খানিকটা বল পেলুম পা দুটো বাঁচাতে পারবার আশায়। সারাটা পথ কসরৎ করে বেশ কিছুটা অবশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বাতি আমাকে ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিল। কুলি নেই, কোন যানবাহন নেই আইজলে। নিজেদের মালপত্র বাসের ওপর থেকে নামিয়ে নিজেদেরই বহন করে নিয়ে যেতে হবে। বিদেশের লোক এ সব কাজে খুব অভ্যস্ত; কিন্তু আমরা ভারতে এখনও কুলির মুখাপেক্ষী। স্বাবলম্বী হবার কথা এখনও আমরা চিন্তা করতে পারি না।

রুক্ষ পাহাড়ের গা দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে বাস এসে যেখানে দাঁড়াল, সেখানে কয়েকটি ঝকঝকে মনোহারী দোকান দেখে ভাবলুম যে এখানেই বোধহয় নামতে হবে। কিন্তু যাত্রীরা কেউই নামলেন না। দু-তিন মিনিট দাঁড়িয়েই বাস আবার ছুটল। এবারে বুঝতে পারলুম যে আমরা আইজল শহরের বাজার এলাকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। ওপর থেকে একটা পথ নিচে নেমে এসেছিল। কিন্তু সে পথে না গিয়ে নিচের পথ ধরেই আমাদের বাস সমস্ত শহরটা ঘুরে শহরের আর এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। এ দিকেও বাজার। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে আমাদের বাঙালী সহযাত্রীরা এখানেই তাঁদের মালপত্র নামিয়ে নেমে পড়লেন। কৌতূহলী হতেই পথের

ধারে হোটেল শ্যাংগ্রিলার সাইনবোর্ড দেখতে পেলুম। স্বাতি বলল : এখানে নামলেই বোধহয় ভাল হত।

আমি বললুম : নামা যখন হল না, তখন আর আপসোস করে লাভ কী!

আরও খানিকটা ঘুরে আমরা শহরের উপরের রাস্তায় উঠে এলুম। ভারি সুন্দর ঘর বাড়ি ছাড়িয়ে বাস এসে যেখানে দাঁড়াল, সেখানেই সবাইকে নেমে পড়তে হবে। এটাই আইজলের বাস স্ট্যাণ্ড।

## ২৯

রাজপথের একেবারে ধার ঘেঁষে বাস দাঁড়িয়েছিল। তার পাশেই কয়েকটা ফলের দোকান। খুব সন্তর্পণে আমরা নামলুম। মুখে বেশ অসহায় ভাব। বাসের ছাদে না উঠলে নিজেদের মালপত্র নামাতে পারব না। তার পরের ভাবনা ভাবতে পারছি না।

হঠাৎ এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন: নমস্কার।

তাঁর পিছনেই একজন মহিলা। তাঁর চেহারা আর শাড়ি দেখে বুঝতে একটুও কষ্ট হল না যে তাঁরা বাঙালী। হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেয়ে গেছি এমনি ভাবে আমি প্রতিনমস্কার জানালুম। আর স্বাতি এগিয়ে গিয়ে সেই মহিলার সঙ্গে ভাব করে ফেলল।

পরিচয় হল। পঙ্কজবাবুরা স্বামী স্ত্রী আমাদের নিতে এসেছেন, আরও একজন এসেছেন, তাঁর নাম মিস্টার পালিত। পঙ্কজবাবুর অফিস এই বাস স্ট্যাণ্ডের পাশেই, কিন্তু তাঁর স্ত্রী অনেক দূর থেকে এসেছেন। মিস্টার পালিতের অফিসও দূরে নয়। কিন্তু অফিসের ছুটি এখনও হয় নি। মনে মনে আমি শিলচরের সরকারী অফিসারটিকে অজস্র ধন্যবাদ দিলুম। তারপরে যখন করুণ চোখে বাসের ছাদের দিকে তাকালুম, তখন পঙ্কজবাবু বললেন: আর আপনাদের কোন দুর্ভাবনা ভাবতে হবে না।

বলে একখানা চিঠি আমাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। সার্কিট হাউসে একখানা ঘর আমাদের দেওয়া হয়েছে। সে জায়গা কত দূরে তা জানবার আগেই একজন আমাদের স্যুটকেশ আর হোল্ডল বাসের ছাদ থেকে নামিয়ে আনল। পঙ্কজবাবু বললেন: রাস্তায় নয়। একেবারে গাড়িতেই তোল।

এবারে তাকিয়ে দেখলুম যে পথের অন্য ধারে একখানা জীপ গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গাড়িতেই আমাদের মাল উঠল। মিস্টার পালিত বললেনঃ আপনারা চলে যান। মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমরা পরে আসছি।

ভেবেছিলুম যে পঙ্কজবাবুরা আমাদের সঙ্গেই আসবেন। কিন্তু এলেন না। হাত নেড়ে আমাদের বিদায় দিলেন।

সার্কিট হাউস বেশি দূরে নয়। কিন্তু হাঁটতে হলে এই পথটাই অনেক মনে হত। উপর থেকে নিচে নেমে আবার উঠে গেছে এই পথ। সমতল পথটি দূরের পাহাড়ের দিকে গেছে, আর উপরের পথটি শেষ হয়েছে সার্কিট হাউসের সামনের প্রাঙ্গণে।

জীপ এসে গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম। আমাদের পরিচয়পত্র দেখেই বেয়ারারা আমাদের মালপত্র নিয়ে দোতলায় উঠে গেল। ড্রাইভারকে কিছু দেওয়া উচিত হবে কিনা তা ভাববার আগেই সে গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাজেই নিচের অফিস ঘরে এখন দু' পেয়ালা চা ও রাতের জন্যে ডিনারের কথা বলে উপরে উঠে গেলুম।

ঝকমকে নতুন বাড়ি। এ যাত্রায় মোজেইকের মেঝে এই প্রথম দেখলুম। উপরের বারান্দায় ও গাড়ি-বারান্দার খোলা ছাদে অনেকগুলি বেতের চেয়ার। রেলিঙের বাইরে ফুল ও পাতার টব। সামনে কোন বাড়ি নেই। দূরে নীল পাহাড় চক্রাকারে শহরটাকে ঘিরে রেখেছে। ডাইনে ও বাঁয়ের পাহাড়ে নানা রঙের ঘরবাড়ি কোন পার্বত্য শহরের চেয়ে কম রমণীয় মনে হল না। এই আইজল শহর! এক মুহূর্তে পথের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেল।

স্বাতি আমাদের ঘরটা দেখবার জন্য চলে গেল। খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললঃ ঘরটাও ভাল। পাশাপাশি দুটো খাট, ডানলোপিলোর গদি, পরিষ্কার বিছানা কম্বল, মেঝেয় জুটের কার্পেট, আসবাবপত্র ভাল। লাগোয়া বাথরুমটিও পরিষ্কার।

বললুম ঃ তাহলেই দেখ, যেখানে ভয় ছিল বেশি, সেখানেই সব রকম আরাম পাচ্ছি।

আকাশে তখনও আলো ছিল, ভারি আরামপ্রদ আবহাওয়া। আমরা একটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে নিয়েছিলুম, এখন তার গরম ভাল লাগছে।

বেয়ারা এক পট চা এনে আমাদের পাশের একটা টেবিলে রাখল। আমরা চা ঢেলে নিলুম।

চায়ে চুমুক দিয়ে স্বাতি তার অভ্যাস মতো বলল, এবারে মিজোরাম সম্বন্ধে কিছু বলবে না?

বললুম ঃ এ জায়গার সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানি।

পুরাণে বা ইতিহাসে কোন উল্লেখ নেই বুঝি!

হেসে উত্তর দিলুম ঃ সত্যিই নেই। আর ইতিহাস থাকবেই বা কী করে! মিজোরা নিজেরাই বলছে যে তারা আপার বার্মা থেকে এখানে এসেছে শ দুই বছর আগে, কেন এসেছে তা জানে না। তারা এখানে আসবার আগে আর কেউ ছিল কিনা, তাও বলতে পারে না। এদের সমাজ ব্যবস্থা দেখে মনে হয় যে ছোট ছোট দলে এরা এসেছিল একজন দলপতির সঙ্গে। এক একটা গ্রাম গড়ে তুলেছিল। দলপতির বাড়ি হত গ্রামের ঠিক মাঝখানে, আর অবিবাহিত ছেলেদের থাকবার ঘর তৈরি হত একটা সুবিধেজনক জায়গায়। এই ঘরকে এরা নাগাদের মতো মোরাঙ বলে না, বলে জলবুক। বাঙলা 'জ' নয়, ইংরিজি 'জেডে'র মতো উচ্চারণ। দলপতির প্রতি তাদের আশ্চর্য রকমের ভক্তি ছিল, সে যা বলবে সমস্ত গ্রামবাসী তাই মেনে নেবে নির্বিবাদে, তার কথার ওপরে কোন তর্ক চলবে না। জলবুকের নিয়মকানুন নাগাদের মতোই। সেখানেই তাদের শিক্ষাদীক্ষা। সমাজের নিয়মকানুনে হাতে খড়ি।

স্বাতি বলল ঃ মানুষের মাথা কাটার শিক্ষাও বোধহয় এইখানেই পেত!

বললুম ঃ হয়তো তাই। আমার এক চাক্‌মা বন্ধুর কাছে তাদের ধর্মের কথা শুনেছিলুম।

চাক্‌মা বন্ধু!

তার কাছেই শুনেছিলুম যে মিজোরামে চাক্‌মা পাওয়ি ও মারাদের স্বতন্ত্র জেলা কাউন্সিল আছে। চাক্‌মার নামটা ভুলে গেছি, চাক্‌মা তার সারনেম। যেমন, গ্রামের দলপতিরা বেশির ভাগই ছিল সায়লো।

স্বাতি বলল ঃ ব্রিগেডিয়ার সায়লো তো মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী। যিনি কদিন আগে পদত্যাগ করলেন।

বললুম ঃ আবার তিনি সগৌরবে ফিরে আসবেন।

স্বাতি বলল ঃ তুমি ধর্মের কথা বলছিলে।

ধর্মের কথার সঙ্গে ধর্মান্তরের কথাও আছে, আছে ইতিহাস ও রাজনীতির কথাও।

সবই বল।

গত শতাব্দীর শেষের দিকেও এই অঞ্চল এক রকম স্বাধীন ছিল, দলপতিরাই ছিল রাজার মতো। গ্রামের লোককে তারা জমি দিত, ফসল মানে ধানের ভাগ নিত তারা। কোন জন্তু জানোয়ার ধরলে বা শিকার করলে সামনের পা দিতে হত দলপতিকে। এ হল জমির খাজনা আর শিকারের ট্যাক্স। দলপতির বাড়ি মেরামত হবে, কি নতুন বাড়ি তৈরি হবে, গ্রামের সমস্ত লোককে এসে কাজ করতে হবে। দরকার হলে দলপতি দূরের বাজারেও কেনা বেচা করবার জন্যে লোক পাঠাতে পারত। সবাই যেন তার প্রজা কিংবা চাকর।

এরা তখন অ্যানিমিস্ট ছিল, মানে প্রকৃতি বা জড়োপাসক। তাদের সৃষ্টিকর্তার নাম ছিল পাথিয়ান, আর তাদের বিশ্বাস ছিল এই সব পাহাড় পর্বত নদী ঝর্না ও গাছপালায় আছে দুষ্ট গ্রহ দানব যারা মানুষের ক্ষতি করে আনন্দ পায়। তাদের দুর্দশার কারণ এরাই এবং

নানা রকমের বলি ও পূজো দিয়ে এদের শান্ত রাখতে হয়। কাজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছ। কেউ যদি বলে যে কোন অপদেবতার শান্তির জন্যে এক ডজন মানুষের মাথা চাই তো গ্রামের ছেলেরা বসে থাকবে না, সমতল ভূমিতে নেমে গিয়ে এক ডজনের বদলে দু ডজন মাথা কেটে আনবে!

মিজোরামের উত্তরে মণিপুর, আর পূর্বে ও দক্ষিণে বর্মা, সে দিকে সুবিধে হয় না। তাই যত অত্যাচার সব পশ্চিমে বাঙলার ওপর। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইংরেজ ১৮৯১ সালে এ অঞ্চল দখল করল, কিন্তু দলপতিদের ওপরেই ফেলে রাখল শাসনের ক্ষমতা। বছর সাতেক এই অঞ্চলের উত্তরাংশ ছিল আসামের সঙ্গে, আর বাঙলার সঙ্গে ছিল দক্ষিণের অংশ। পরে এই দুটো অংশ এক সঙ্গে করে লুশাই হিল্স্ ডিস্ট্রিক্ট আসামের ভাগে পড়ল। মিশনারীরা এই জেলায় আসতে শুরু করে ১৮৯৪ থেকে। এই সময় থেকেই তাদের ধর্মান্তর শুরু হয়।

কিছুক্ষণ থেকেই আমরা নিচের রাজপথে জনস্রোত দেখতে পাচ্ছিলুম। হুস হাস শব্দ করে অনেক জীপ ও মোটর গাড়ি যাচ্ছে। ছেলে মেয়েরা যাচ্ছে রাস্তার ধার ঘেঁষে। স্কুলের ছেলে মেয়ে নয়, মনে হল আইজলের সরকারী অফিসের ছুটি হয়েছে, মিজো পুরুষ ও নারী সারা দিন কাজ করবার পরে ঘরে ফিরছে।

স্বাতি তার চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বলল: তুমি চাক্‌মার কথা বলছিলে।

বললুম: হ্যাঁ, অনেক কষ্ট করে তার একটা কথা আমি মনে রেখেছি। কথাটা হল তুম্ম্ গাইহ্‌না বা এই ধরনের কিছু।

স্বাতি সহাস্যে বলল: তোমার চাক্‌মাই এর সঠিক উচ্চারণ করবে, তুমি বরং কথাটার মানে বল।

আমিও তার হাসিতে যোগ দিয়ে বললুম: এ হল তাদের ধর্মের সম্বন্ধে ধারণা। এক কথায় এই শব্দটার অনুবাদ করা নাকি সম্ভব নয়।

অনেক কথাতেই বল।

সবাইকে সদয় ও অতিথি বৎসল হতে হবে এবং স্বার্থ ত্যাগ করে সাহায্য করতে হবে সবাইকে। এই হল মিজোদের সামাজিক ধর্ম। ঘরে বাইরে সব সময় তাদের এই ধর্ম মেনে চলতে হবে।

স্বাতি বলল : এ তো সব মানুষেরই ধর্ম হওয়া উচিত।

মানুষ এ কথা মুখে স্বীকার করলেও কাজের সময় মানে না। যদি মেনে চলত তাহলে পৃথিবীতে কোন দুঃখ থাকত না।

স্বাতি বলল : দলপতিদের শাসন কি এখনও আছে ?

বললুম : থাকতে পারে না। আধুনিক শিক্ষায় কোন শাসন মেনে চলা সম্ভব নয়। বিশেষ করে পদাধিকারের বলে কেউ যদি অন্যকে চাকরের মতো খাটতে বলে তো প্রতিবাদ করতেই হবে। আর ঠিক এই জন্যেই এখানে মিজো ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল। আর অন্য দিকে এদের সঙ্গে তাল ঠুকতে দাঁড়াল চীফ্'স কাউন্সিল। ভারত স্বাধীন হবার পরে আর একটি সংস্থা গজিয়ে উঠল; তার নাম ইউনাইটেড মিজো ফ্রীডম অর্গানাইজেশন। কিন্তু তাদের কার্যকলাপ সরকারের চোখে ভাল লাগছিল না। তারা ছিল বিচ্ছিন্নতাকামী, মিজোরামকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বার্মা সীমান্তে চিনদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছিল। চিন মানে চায়না নয়, এই চিন হল মিজোরামের সংলগ্ন বার্মার চিন পাহাড়। এই পাহাড়ের অধিবাসীদের বোধ হয় চিন বলে। এ সব পুরনো কথা। এখন এম. এন. এফ. বা মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে একটি সংস্থার কথা শুনতে পাই। বিদ্রোহী নাগাদের মতো তারাও নাকি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই শুনি নি।

হঠাৎ স্বাতি দাঁড়িয়ে রেলিঙের কাছে চলে গেল। একটা জীপ এই সার্কিট হাউসে চলে এসেছিল। স্বাতি বোধহয় আরোহীদের দেখল, তারপরে ফিরে এসে বসল।

আমি বললুম : কী দেখলে ?

স্বাতি বলল : ভেবেছিলাম, পঙ্কজবাবুরা বোধহয় এলেন। কিন্তু তা নয়।

অনেকক্ষণ থেকেই তাঁদের অপেক্ষা করছি। এতক্ষণে এসে পড়বেন ভেবেছিলুম।

এইবারে অন্ধকার নামছে। শীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে, মাথায় হিম পড়ছে বলেও মনে হল। তাই দেখে স্বাতি বলল : আর বাইরে থাকা ভাল নয়, ঘরের ভেতরে চল।

বলে আমায় ঘরে ডেকে আনল।

তার কিছুক্ষণ পরেই একজন বেয়ারা এসে খবর দিল : পালিত সাহেব এসেছেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

বলে আমি তৎপর ভাবে বেরিয়ে তাঁকে ডেকে আনলুম। তাঁর সঙ্গে পঙ্কজবাবুরাও আছেন। মিস্টার পালিত বললেন : আপনাদের বিরক্ত করলাম না তো!

স্বাতিও বেরিয়ে এসেছিল। সে বলল : আনন্দ দিলেন বলুন। আপনাদের আশায় এতক্ষণ আমরা বাইরেই বসে ছিলাম।

ভিতরে এসে মিস্টার পালিত আমাকে বললেন : দিনকয়েক থাকবেন তো!

আমি স্বাতির দিকে তাকালুম। স্বাতি বলল : পরশু সকালে আমাদের ফিরতে হবে।

পঙ্কজবাবুর স্ত্রী বিস্মিত হয়ে বললেন : তার মানে মাত্র একটি দিন আপনারা আইজলে থাকবেন! এত দূরে এত কষ্ট করে এসে—

স্বাতি বলল : অনেক দিন আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। আর ত্রিপুরা দেখতে এখনও আমাদের বাকি আছে।

কিন্তু দিন কয়েক থাকলে এ জায়গা আপনাদের খুব ভাল লাগত।

আমি হেসে বললুম : একটি সন্ধ্যা দেখেই আইজলকে আমরা ভালবেসে ফেলেছি।

স্বাতি বলল : এই বাড়িটি বোধহয় নতুন তৈরি হয়েছে ?

হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালে বোমার আঘাতে পুরনো বাড়িটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

বোমার নাম শুনে আমি চমকে উঠলুম। জানতে পারলুম যে ভারতীয় বিমান বাহিনীই এই বাড়ির উপরে বোমা ফেলেছিল। তারা খবর পেয়েছিল যে এম. এন. এফ.-এর কিছু বিদ্রোহী মিজো এই বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে।

তারপর ?

তার আগের বা পরের কোন ঘটনা আমরা জানি না। বারো-তেরো বছর আগের ঘটনা তো, সে সময়ে আমরা কেউই এখানে ছিলাম না।

আমি বললুম : আইজলে এয়ারপোর্ট আছে ?

আছে।

খুশী হয়ে আমি স্বাতিকে বললুম : তাহলে তো আমরা প্লেনেই ফিরতে পারব।

মিস্টার পালিত বললেন : কিন্তু এখন তো কোন প্যাসেঞ্জার সার্ভিস নেই !

স্বাতিও একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল : থাকলে এই কষ্টকর পথে আমাদের ফিরতে হত না। এখানকার আলো বাতাসে আমরা প্রাণ ফিরে পেয়েছি, কিন্তু শিলচরে পৌছে বোধহয় আর দাঁড়াতে পারব না।

আমাদের কথা শুনে সবাই অশ্চর্য হলেন। তাই আমি ব্যাপারটা তাঁদের বুঝিয়ে বললুম : বেশি আদর আমাদের সহ্য হয় না।

গল্পটা উপভোগ করে পঙ্কজবাবু বললেন : এবারে আমার ওপরে ছেড়ে দিন। আমি নিজে বাসে উঠে সব চেয়ে আরামের দুখানা সীটের ব্যবস্থা করে দেব। আর পরশু যদি মিনি বাসের দিন থাকে তো আরও আরামে ও কম সময়ে শিলচরে পৌছে যাবেন।

পঙ্কজবাবুর কথায় খানিকটা আরাম পেলুম, কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ

দেবার অবকাশ পেলুম না। দুজন বেয়ারা চা ও নানা রকমের খাবার নিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে এল। অতিথি আপ্যায়নের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলুম, এখন এই বেয়ারাদের বুদ্ধি দেখে তাদের কাজের তারিফ করলুম।

চা খেতে খেতে আমাদের অনেক কথা হল। এরা সবাই পদস্থ অফিসার, আরও অনেক বাঙালী অফিসার আছেন আইজলে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এসে পড়তে পারেন। আজ না এলেও কাল আমাদের সঙ্গে দেখা হবেই। বছর কয়েক আগে প্রবোধবাবু এসেছিলেন শিলচরের একটা সাহিত্য-সভায়। দিন কয়েক আইজলে কাটিয়ে গেছেন। দক্ষিণে লুঙ্গলেই যাবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কিছু গোলমাল চলছিল বলে সেখানে যাবার অনুমতি পান নি। মিজোরাম সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখেছেন কিনা তাঁরা জানতে চাইলেন। এ খবর আমার জানা ছিল না, তাই বললুম ঃ জানি নে।

কয়েকটা নতুন কথা তাঁদের কাছে শিখলুম। মিজো ছাড়া অন্য লোকেদের এরা ভাই বলে, মণিপুরীরা বাইরের লোককে বলে মৈয়াং, আর খাসিরা অ-খাসিদের বলে উৎখার। মিজো মেয়েরা লুঙ্গির মতো করে কোমরে যে নানা রঙের কাপড় জড়ায়, তার নাম পোয়াল। এগুলো বেশ দামী।

নাচ গান নিয়েও আলোচনা হল। এরা সঙ্গীত খুব ভালবাসে। কিন্তু শহরের শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা লোকসঙ্গীত প্রায় ভুলে গেছে, এখন গীটার বাজিয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীত গায়। আগে নানা রকমের উৎসব হত গ্রামে। মিজোরা তো মুখ্যত ঝুম-চাষী। এক জায়গায় এরা বেশি দিন চাষ করে না। জমির উর্বরতা কমলেই অন্য জায়গায় গিয়ে বন জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে সেই জমি চাষের উপযোগী করে। খুব শক্ত কাজ এটা। বসন্ত কালে এই কাজ করবার পরে তারা চাপচার কুট উৎসব করত। বর্ষার পরে ভুট্টার ফসল তুলে করত মিমকুট উৎসব। উৎসব মানেই ধেনো মদ খেয়ে নাচ গান ফুর্তি। তারপর

খাওয়া-দাওয়া। আর সব চেয়ে বড় উৎসব হল পৌষ মাসের পলকুট। আমাদের নবান্ন বা দক্ষিণ ভারতের পোঙ্গলের সময়ে এই উৎসব হয় খুব জাঁক জমক করে।

মিজোদের নাচের কথাও শুনলুম। এদের সব চেয়ে জনপ্রিয় নাচ হল চেরো নাচ। এই নাচ বাঁশের উপরে নাচতে হয় বলে সাহেবরা একে বলত ব্যাম্বু ডান্স। ছেলেরা মাটিতে বসে বাঁশ ধরে থাকে, আর মেয়েরা নাচে বাঁশের ওপরে পা রেখে। সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়।

খুয়াল্লম নাচ নাচতে হয় অতিথিদের। সমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্যে মিজোদের অনেক দুঃসাহসের কাজ করতে হত, আর উৎসবে আশপাশের গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করতে হত। নিমন্ত্রিতরা সবাই মিলে এই নাচ নাচত।

ছেই নাম নামে আরও এক রকমের নাচ আছে। সন্ধ্যেবেলায় ভাত থেকে তৈরি মদ খাবার সময়ে এই নাচ। তখন কবিত্ব শক্তিরও পরীক্ষা দিতে হয়। মুখে মুখে তিন লাইন কবিতা তৈরি করে শোনাতে হয়।

আজকাল এ সবই অচল হয়ে আসছে। কিন্তু মিজোরা হাসিখুশি প্রসন্ন মেজাজের বশে নাচ গান ছেড়ে দিতে তো পারছে না, গীটারে বিদেশী গানে উত্তরোত্তর উন্নতি করছে।

পঙ্কজবাবুর স্ত্রী স্বাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন : পথে আসবার সময়ে দেখতে পান নি ?

স্বাতি বলল : কী বলুন তো ?

বস্তা বোঝাই লরির উপরে ছেলে মেয়েরা গীটার বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল দেখে আমি বললুম : ফেরার পথে লক্ষ্য করব।

নিশ্চয়ই করবেন। গীটার না নিয়ে মিজো ছেলে ঘরের বাইরে বেরোবে না।

কিন্তু অফিসে নিশ্চয়ই গীটার নিয়ে যায় না!

না, তা যায় না।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। পঙ্কজবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আমরা অনেক দূরে থাকি। আজ উঠি তাহলে।

মিস্টার পালিতও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: আপনারাও নিশ্চয়ই ক্লান্ত আছেন, এবারে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ুন।

আমরা তাঁদের বিদায় দিতে বারান্দায় বেরিয়ে ছিলুম। মিস্টার পালিত তাঁর সরকারী কোয়ার্টার দেখিয়ে বললেন: পথের ধারে ঐ বাতিটার নিচেই আমরা থাকি।

বললুম: কাল সকালে অপনাদের কাছে আসব।

ঘরে ফিরে স্বাতি বলল: ইভার কথা ভুলে গেলে চলবে না। যে ভাবেই হোক, একটা খবর নিতে হবে।

বললুম: নিশ্চয়ই নেব।

## ৩০

সকালে প্রাতরাশ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। প্রথমেই গেলুম মিস্টার পালিতের বাড়ি। তাঁর পাশেই থাকেন অরবিন্দ-বাবু। শুনলুম যে তিনিই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সন্ধ্যেবেলায় আমরা যেন সার্কিট হাউসেই থাকি, এই অনুরোধ জানালেন। এ খবরও দিলেন যে পঙ্কজবাবু আমাদের শহর দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন সকাল দশটার পরে। তাঁর অফিসে যেতে আমরা যেন দ্বিধা না করি।

এইবারে আমাদের ইভার স্বামীর খবর নিতে হবে। সেও দশটার পরে। তাই যতটা সম্ভব হেঁটে আমরা শহরটা দেখে নিলুম। ব্যাঙ্ক বড় বড় অফিস রাজভবন ও আসাম রাইফেল্‌সের হেড কোয়ার্টার— সবই কাছাকাছি। আসাম রাইফেল্‌সের মন্দির সর্বসাধারণের জন্য খোলা আছে। পথের ধারে সেই মন্দিরটিও আমরা দেখে নিলুম। তারপরে গেলুম ইভার স্বামীর খোঁজে।

কিন্তু আশ্চর্য! সেখানে কেউ কোন খবর রাখে না। কোথায় খোঁজ নিতে পারি তাও কেউ বলতে পারল না। স্বাতি বলল : আমি এই রকমই ভয় পেয়েছিলাম।

কেন?

এ কাজ সোজা হলে ইভা নিজেই তাকে খুঁজে বার করত।

সে কথা ঠিক।

এর পরে আমরা পঙ্কজবাবুর অফিসে চলে এলুম। তিনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন : একটু চা খেয়ে নিন, তারপরে বেরোবেন।

স্বাতি বলল : বারে বারে চা খাবার অভ্যাস আমাদের নেই। ঘুরে বেড়িয়ে কিছু দেখতে পারলেই আমরা বেশি আনন্দ পাব।

কোথায় যাবেন ?

তা জানি নে তো !

পঙ্কজবাবু হেসে বললেন : এখানকার হাসপাতাল বেসিক ট্রেনিং সেণ্টার বা সেরিকালচার সেণ্টার দেখতে কি আপনাদের ভাল লাগবে !

বললুম : শহর সম্বন্ধে একটা ধারণা হলেই আমাদের চলবে।

স্বাতি বলল : আর এই শহরের বাজার একবার দেখবার ইচ্ছে।

বিদেশী জিনিস ?

বললুম : কলকাতায় সবই পাওয়া যায়। আর শুনেছি এই সব জায়গায় বিদেশী বলে দিশী জিনিসই বেশি চলে।

পঙ্কজবাবু আমাদের একটি জীপ দিলেন, একজন গাইডও। তাঁর অফিসেরই একটি মিজো মেয়ে গাইডের কাজ করবে, তারপর সার্কিট হাউসে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে।

শহর দেখতে দেখতে আমরা বাজারের দিকে চলে গেলুম। যেদিকে আমরা আছি, ঠিক তার উল্টো দিকে, অর্থাৎ যে দিক দিয়ে আমরা এই শহরে প্রবেশ করেছিলুম সেই দিকেই। এক জায়গায় এসে ঢালুর মুখে আমাদের নামতে হল। এর পরে আর গাড়ি নামবে না, হেঁটে নামতে হবে।

বাজার মানে হাটের মতো ব্যবস্থা। চালা ঘরের ভিতরে ও বাইরে মেয়েরাই বসেছে নানা পণ্য নিয়ে। শাকসব্জি আছে, আরও সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। এক জায়গায় ওলের মতো বড় বড় টুকরো দেখে মিজো মেয়েটিকে আমি তা দেখালুম। সে এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা কী জেনে এসে বলল : হাতির মাংস।

আমরা চমকে উঠলুম। অনেক মাংসর কথা শুনেছি, কিন্তু হাতির মাংস বাজারে বিক্রি হয় এ কথা এইখানেই প্রথম শুনলুম। কিন্তু এটা মরা হাতির মাংস, না মাংস খাবার জন্য হাতিটাকে মারা হয়েছে

তা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম। মাংসটা শুকনো, তাই আমরা বুঝতেই পারি নি যে ওটা মাংস।

সার্কিট হাউসে ফিরে আসার পরে স্বাতি আমাকে বলেছিল যে সে এক ঝুড়ি ফড়িংএর মতো পোকা বিক্রি হচ্ছে দেখেছিল। এই কথায় করিমগঞ্জের একটি ছেলের কথা আমার মনে পড়েছিল। সে বলেছিল যে তার বন্ধু এক মিজো অফিসার একটা ফড়িং ধরে হাত-পাগুলো ছিঁড়ে ফেলে কচকচ করে সেটা খেয়ে ফেলেছিল। সে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে দেখে বলেছিল, ফুল অফ ভিটামিন ইউ নো। এ গল্পটা সেদিন আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। খাদ্যাখাদ্য নিয়ে মানুষের বিচার করা ঠিক নয়।

দুপুরের আহার সেরে বারান্দায় বসে আমরা শহরের শোভা দেখছিলুম। আইজলে আমাদের আর কোন কাজ নেই। যেটুকু কাজ ছিল তা এখানে ফেরার আগে সেরে এসেছি। কাল সকালের মিনি বাসে দুখানা টিকিট কেটে দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে টাকা দিয়ে এসেছি। এক নম্বর দু নম্বর সিট চাই নে, মাঝখানের সিট হলেই আমাদের চলবে। পঙ্কজবাবু নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছেন। সকাল সাড়ে আটটায় মিনিবাস ছাড়বে, তার আগে আমাদের বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করবেন। এমন মিতভাষী সজ্জন মানুষ সচরাচর দেখা যায় না।

হঠাৎ নিচে থেকে বেয়ারা এসে খবর দিল যে একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি ভেবেছিলুম যে পঙ্কজবাবু বোধ হয় সেই গাইড মেয়েটির হাতেই বাসের টিকিট পাঠিয়েছেন। কিন্তু সে কাছে এলে দেখলুম যে তা নয়, এ অন্য মেয়ে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বসতে বললুম।

মেয়েটি বলল: আপনারা এখানে একজনের খোঁজ করছিলেন শুনলাম।

আমি বললুম: হ্যাঁ।

কোহিমা থেকে তার ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন ?

এ কথার উত্তরেও আমি হ্যাঁ বললুম।

কেন বলুন তো ?

আমি বললুম ঃ আপনার নিজের পরিচয় দেবেন না :

মেয়েটি স্বচ্ছন্দে বলল ঃ আমি তাঁর স্ত্রী।

স্ত্রী !

হ্যাঁ। তাতে আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ?

স্বাতি বলল ঃ আমরা তাঁর আর একজন স্ত্রীকে চিনি কিনা !

মেয়েটি বলল ঃ তাকে তো উনি অনেক দিন আগেই ত্যাগ করেছেন।

ত্যাগ করেছেন ?

হ্যাঁ, এতে অমন আশ্চর্য হবার কী আছে ! অনেক দিন আগেই তো সে মেয়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে !

কিন্তু—

বলুন।

আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কিন্তু ইভা কি সব কথা জানে ?

মেয়েটি জোর দিয়ে বলল ঃ নিশ্চয়ই জানে।

তাকে কি সব কথা জানানো হয়েছে ?

মেয়েটি এবারে চটে উঠে বলল ঃ ইভার জন্যে আপনাদের এত দরদ কেন বলুন তো !

বললুম ঃ আমাদের বন্ধু বলে। এ সব কথা জানলে সে আমাদের বলত।

তারপরেই প্রশ্ন করলুম ঃ আপনার স্বামীর সঙ্গে আমাদের একবার দেখা হতে পারে ?

মাথা নেড়ে মেয়েটি বলল ঃ না। সে আপনাদের সামনে আসবে না। কিন্তু আমি আপনাদের বলে যাচ্ছি যে এ ব্যাপারে

আপনারা আর মাথা গলাতে আসবেন না। তাতে ফল ভাল হবে না।

বলেই মেয়েটি উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ভেবেছিলুম যে ইভার কাহিনী এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের জন্য আরও একটু বিস্ময় যে সঞ্চিত ছিল তা জানলুম আইজল ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে।

সন্ধ্যার দিকে আইজলের বাঙালীরা সার্কিট হাউসে আসতে লাগলেন। প্রায় সবারই স্ত্রী এলেন স্বামীর সঙ্গে। দোতলার ভি.আই.পি. রুমের সংলগ্ন একটি বড় ঘর ছিল, সেইখানেই সবাই সমবেত হলেন। নানা রকমের গল্প হল সবার সঙ্গে। খুব আনন্দে কাটল সন্ধ্যেটা।

তারপরে নিচের তলায় ডাইনিং রুমে খাবার ডাক পড়ল। সবাই আজ এক সঙ্গে খাবেন। প্রচুর খাবার, নানা রকমের উপাদেয় খাবার। আর রান্নাও তেমনি মুখরোচক। এক বাক্যে সবাই যার প্রশংসা করতে লাগলেন, একবার তার দেখা পেয়ে গেলুম। তার ভাল নাম জানি নে, সবাই তাকে কালু বলেই ডাকছে। কালু নামে এই সার্কিট হাউসের খানসামা, কাজে সে-ই সব। তার জন্যেই এই সার্কিট হাউস চলছে। তার জন্যেই আইজলের বাঙালীরা নিজেদের বাড়িতে আত্মীয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারছেন। কালু নিজে আমাদের অনেক কিছু পরিবেশন করে কতকটা জোর করেই খাওয়াল।

অনেক রাতে সবাই বিদায় নিলেন।

ভোর বেলায় আমরা উঠে পড়লুম। সকাল সাতটায় শিলচরের বাস ছাড়ে। কিন্তু আমরা এ বাসে যাব না। পঙ্কজবাবু আমাদের মিনিবাসের টিকিট দিয়েছেন। সে বাস সকাল সাড়ে আটটায় ছেড়ে প্রায় এক সময়েই শিলচরে পৌঁছবে। সহাস্যে তিনি বলেছেন, এ যাত্রাতেও নাকি একই দুর্ভোগ হত। তিনি নিজে বাসে উঠে তা

দেখতে পেয়েছিলেন, তাই রক্ষে। টিকিটের নম্বর বদলে দিয়েছেন। রাতে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আইজলের পুলিস সাহেবও ছিলেন। তিনি গোয়ার মানুষ। প্রসন্ন মেজাজে আলাপ করেছেন আমাদের সঙ্গে। আর সকাল আটটায় আমাদের বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমরা তাই আটটার আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নিলুম।

একজন এসে সার্কিট হাউসের ভাড়া নিয়ে গেল। কিন্তু খাবারের বিল দেবার জন্যে বার কয়েক তাড়া দিতে হল।

পুলিসের জীপ এল আটটার পাঁচ মিনিট আগে। ড্রাইভার নিজেই একটা সেলাম দিয়ে আমাদের মালপত্র নামিয়ে নিয়ে গেল। আমরাও নিচে নামলুম।

একটুখানি আড়ালে কালু দাঁড়িয়ে ছিল, তার মুখ বিষণ্ণ। মনে হল বেদনায় ছলছল করছে তার দু চোখ। আমি তাকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে এগিয়ে গেলুম। আর কালু তাই দেখে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল। কোন রকমে তার বক্তব্য আমি বুঝতে পারলুম। সে গরিব বলে তাকে অপমান করেছি আমি।

অপমান করেছি!

তার মাতৃভাষায় সে বুঝিয়ে দিল যে আইজলের সব বাঙালী যাকে ভালবেসে খাওয়াল, তাকে সে সেবা করতে পারল না। বলে হাতের মুঠোয় আমার দেওয়া টাকা আর বিলটা দেখাল। সে নাকি সবাইকে কাল রাতে অনুরোধ করেছিল যে আমাকে খাইয়ে সে কোন পয়সা নিতে পারবে না, সেও আমার আপনজন হতে চায়। আর এ পয়সা তো সরকারী প্রাপ্য নয়, সে নিজের রোজগারের পয়সায় আমাকে খাইয়েছে।

আমি হেরে গেলুম কালুর কাছে। আমার চোখেও জল এসে গেল। কোন রকমে বললুম: তোমাকে দুঃখ দিয়ে গেলে নরকেও আমার স্থান হবে না।

বাস ছাড়বার মিনিট কয়েক আগে এক পাহাড়ী ভদ্রলোককে দেখতে পেলুম, আমাকেই যেন লক্ষ্য করছেন। আমি উঠে দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : আমাকে কিছু বলবেন ?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন : হ্যাঁ।

বাস থেকে আমি নেমে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক এক পাশে সরে এসে বললেন : আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

আপনার পরিচয় ?

আপনারা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আমি সেই লোক।

আমি চমকে উঠে তাঁর আপাদ মস্তক দেখে নিলুম। তারপরে বললুম : কী অনুরোধ বলুন।

ভদ্রলোক গভীর স্বরে বললেন : দয়া করে ইভাকে আমাদের কথা বলবেন না।

কেন ?

সব কথা জানতে পারলে সে আত্মহত্যা করবে।

তবে এমন কাজ করলেন কেন ?

আমার অদৃষ্ট।

ঠিক এই সময়েই বাসের ড্রাইভার তার জায়গায় বসে জোরে জোরে হর্ন বাজাল। বাস ছাড়বে। আমি আর কোন কথা ভেবে না পেয়ে লাফিয়ে বাসে উঠে পড়লুম। ভদ্রলোক তাঁর দু হাত জুড়ে বাঙালী কায়দায় আমাকে একটা নমস্কার করলেন। বাস ছেড়ে দিল।

আমার মন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। স্বাতির প্রশ্নের উত্তরে আমি তাকে সংক্ষেপে সব কথা বললুম।

কখন আমরা পুরনো পথ ধরলুম খেয়াল করি নি। এ বাসে আমরা খুব আরামে বসেছি। ভাড়া বেশি নেবার যুক্তি আছে।

এবারেও পথে ওঠানামা আছে। পাহাড়ের পথে ওঠানামা থাকবেই, এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে নামতে হবে, আবার উঠতে হবে। এবারেও আমরা কোলাশিবে দুপুরের আহার সেরে নিলুম। পাহাড় থেকে নেমে কাছাড়ের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি পেরিয়ে শিলচরে পৌঁছলুম দুপুর সাড়ে তিনটেয়।

বাসের উপর থেকে কে আমাদের সুটকেশ আর হোল্ডল নামাল দেখতে পাই নি। ও দুটো জিনিস দেখলুম অফিসের বারান্দায়। একজন বেয়ারা বলল: ভিতরে চলুন।

এখানকার অফিসারের নাম আমরা আইজলে জেনে এসেছি। তাঁর নাম মিস্টার পৈত্য। উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন। বললেন: এখানকার সার্কিট হাউসে আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছি। শুনলাম আপনারা ট্রেনে ধর্মনগর যাবেন।

বললুম: হ্যাঁ।

কিন্তু খুব কষ্ট হবে আপনাদের। আমি আপনাদের প্লেনে যাবার পরামর্শ দেব।

কিন্তু প্লেনে গেলে তো ত্রিপুরার পথ দেখা হবে না!

ভদ্রলোক বললেন: অত্যন্ত কষ্টের পথ। ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত দুশো কিলোমিটার পথ আপনাদের পাক খেতে খেতে যেতে হবে। এক দিন ট্রেনে, আর এক দিন বাসে নষ্ট হবে আপনাদের।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: এক দিনে পৌঁছতে পারব না?

ট্রেন লেট হলে শেষ বাস ধরতে পারবেন না।

ভদ্রলোক চায়ের কথা আগেই বলে রেখেছিলেন। সেই রকম কড়া চা এল। নিজেই তাতে একটা চুমুক দিয়ে বললেন: যদি বলেন তো এখনই আমি আপনাদের প্লেনের টিকিট কেটে দিই। এয়ার লাইন্সের অফিস এখান থেকে দূরে নয়।

বলে টেলিফোন তুলতে যাচ্ছিলেন।

আমি বাধা দিয়ে বললুম: ট্রেনেই আমাদের যেতে দিন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ আমরা হারাতে চাই না।

ভদ্রলোক নিরস্ত হলেন, দুঃখিত হলেন, এবং চা শেষ হবার পরে আমাদের একটা সরকারী জীপে তুলে দিয়ে সার্কিট হাউসে পাঠিয়ে দিলেন।

আমরা তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিলুম। তাঁর জন্যেই আমাদের আইজল ভ্রমণ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শিলচরের সার্কিট হাউস আইজলের মতো আরামপ্রদ নয়, তবে হোটেলের চেয়ে ভাল। অর্ডার দিয়ে খাবার পাওয়া যায়। আমরা রাতের ডিনার পেলুম, কিন্তু সকালের চা পাওয়া যাবে না। চৌকিদার জানাল যে ভোর বেলায় সে আমাদের জন্যে রিক্সা ধরে আনতে পারবে।

শিলচর স্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন ছাড়বে সকাল পৌনে সাতটায়। স্টেশনে রিফ্রেশমেণ্ট রুম আছে। ভেবেছিলুম যে সেখানেই কিছু খেতে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখলুম স্টেশনের বড়ই দুরবস্থা। অপরিচ্ছন্ন স্টেশন। রিটায়ারিং রুম একটা আছে, কিন্তু কখনই নাকি খালি পাওয়া যায় না। রিফ্রেশমেণ্ট রুম ট্রেন ছাড়ার আগে খোলে না।

যে-ট্রেনে আমরা উঠলুম তা প্যাসেঞ্জার ট্রেন, বদরপুর জংসন হয়ে করিমগঞ্জে পৌঁছবে সোয়া নটায়। লামডিং থেকে ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জার রাত সোয়া নটায় ছাড়ে। এই ট্রেন বদরপুর হয়ে করিমগঞ্জে পৌঁছবে সোয়া দশটায়, আর ছাড়বে দশটা পঞ্চাশ মিনিটে। ইচ্ছে করলে বদরপুরেও আমরা গাড়ি বদল করতে পারি। ধর্মনগরে আমরা পৌঁছব দুপুর সোয়া একটায়। তার মানে ট্রেনে একশো ষোল কিলোমিটার পথ পেরোতে আমাদের সাড়ে ছ ঘণ্টা সময় লাগবে।

প্ল্যাটফর্মে গরম চা পাওয়া গিয়েছিল। আর কিছু খাবার প্রবৃত্তি

হয় নি। তাই ঠিক করেছিলুম যে করিমগঞ্জেই ভাত খেয়ে নেব। তাই ট্রেনে বসে নিশ্চিন্ত মনে টাইম টেবল দেখছিলুম।

গৌহাটি থেকে আগরতলায় যাবার কোন এক্সপ্রেস ট্রেন নেই, প্যাসেঞ্জার ট্রেনও নেই। ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জার ছাড়ে লাম্‌ডিং থেকে। আগরতলায় এয়ার পোর্ট আছে বলে যাত্রীরা সাধারণত প্লেনেই যাতায়াত করেন। কিন্তু সাধারণ লোকের বোধহয় কষ্টের শেষ নেই। রাত প্রায় পৌনে আটটার সময়ে শিলচর থেকে আর একখানা ট্রেন আসে ধর্মনগরে। সারা দিনে এই দুখানি ট্রেন ধর্মনগরে আসে, আর দুখানি ট্রেন ছাড়ে ধর্মনগর থেকে। একটি রাজ্যের পক্ষে এই ব্যবস্থা আশানুরূপ বলে মনে হয় না, সুবিধাজনক তো নয়ই। কোন ট্রেনে এসে আগরতলার জন্যে সকালের বাস ধরা সম্ভব নয়।

লক্ষ্য করে দেখলুম যে বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেস গৌহাটি থেকে ছাড়ে রাত আটটায় আর বদরপুরে পৌঁছয় সকাল নটা দশ মিনিটে। এই ট্রেন বদরপুর ছেড়ে যাবার পরে ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জার বদরপুর ছাড়ে। ধর্মনগরের যাত্রীরা ট্রেন বদল করবার সময় পায়। বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেসে ধর্মনগরের জন্য একখানি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ থাকলে যাত্রীদের নিশ্চয়ই সুবিধা হত। কিন্তু এ ব্যবস্থার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় হল একখানি ত্রিপুরা এক্সপ্রেসের। সে ট্রেন ধর্মনগরে পৌঁছবে ভোর পাঁচটা বা ছটায়। আগরতলার যাত্রীরা ভোরের বাস ধরেই দুপুরে আগরতলায় পৌঁছবে। কলকাতা থেকে আগরতলার যাত্রীরা উড়ে আসবে ঠিকই, কিন্তু উত্তরবঙ্গ ও আসামের যাত্রীরা ট্রেনে আসতে পারবেন। মিজোরামের যাত্রীদের কোন অসুবিধা হয় না। পারমিটের জন্য তাঁদের শিলচরে এক রাত্রি বাস করতে হয়, তাঁদের প্রয়োজন অ্যাডভান্স টিকিটের ব্যবস্থার। তাহলে তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে রাতে বিশ্রাম করতে পারবেন, আর টিকিট না পেয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে না।

বদরপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। আমরা ট্রেন বদল করতে

পারলুম না। এ ভালই হল। করিমগঞ্জে গিয়ে রিফ্রেশমেণ্ট রুমে খাবার ব্যবস্থা করতে পারলুম। ত্রিপুরা প্যাসেঞ্জার এলে সেই গাড়িতে বসে আমরা মাছের ঝোল ভাত খেলুম।

ধর্মনগরে ট্রেন সোয়া একটায় পৌঁছল না। আমরা দুটোর পরে পৌঁছলুম। আগরতলার শেষ বাস ছেড়ে গেছে ভেবে রিটায়ারিং রুমের খোঁজ করলুম। কিন্তু এখানেও ঘর খালি নেই। অগত্যা কোন হোটেলে যাওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

স্টেশনের বাহিরে অসংখ্য সাইকেল রিক্সা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং যাত্রী নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আমরাও একটি রিক্সায় উঠে ভাল একটা হোটেলে পৌঁছে দিতে বললুম।

স্টেশন থেকে শহর বেশ খানিকটা দূরে। ছোট একটি নদীর পুল পেরিয়ে আমরা শহরে এসে উপস্থিত হলুম। এই নদীর নাম শুনলুম জুরি নদী। রিক্সাওয়ালা একটা নতুন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আশেপাশে আরও দু-তিনটি হোটেল দেখেছিলুম, সে বাড়িগুলো পুরনো। কাজেই অনুমান করতে পারলুম যে এইটে নতুন হোটেল এবং ব্যবস্থা হয়তো এখানেই ভাল। তাই কোন দ্বিধা না করে আমরা নেমে পড়লুম।

দোতলায় দুজনের উপযোগী ঘর পাওয়া গেল। কিন্তু লাগোয়া বাথরুম নেই। বাথরুম দূরে এবং অপরিচ্ছন্ন, ব্যবস্থাও ভাল নয়। কিন্তু এক রাতের ব্যাপার বলে আমরা সবই মেনে নিলুম।

হোটেলে খাবার পাওয়া যায়, কিন্তু চায়ের কোন ব্যবস্থা নেই। স্পেশাল চা এল বাইরের কোন দোকান থেকে। সে চা মুখে দেওয়া গেল না।

ঘরে কোন আসবাব রাখবার জায়গা নেই, এমন সঙ্কীর্ণ ঘর। খাটের উপরে বসেই আমরা কথা বলছিলুম। চায়ের গেলাসটা নামিয়ে রাখতেই স্বাতি হেসে বলল: অভিজ্ঞতা বাড়ছে।

আমি ভেবেছিলুম যে স্বাতি চায়ের কথা বলল, কিন্তু পরে বুঝলুম

যে তা বিছানার কথা। খাটে তক্তার উপরে পাতলা তোষক আছে, পাকা মেঝের মতো তা শক্ত মনে হচ্ছে। উপরে বম্বে ডাইং-এর পরিষ্কার চাদর দেখে বিছানাটা নরম মনে হয়েছিল।

স্বাতি আমাকে ত্রিপুরার টুরিস্ট লিটারেচার বার করে দিল—সাইক্লোস্টাইল করা খানকয়েক কাগজ। বলল: এখানে কিছু দেখবার আছে কিনা দেখে নাও। ঘরে বসে না থেকে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

আমি খুব তাড়াতাড়ি এই কাগজগুলোর উপরে চোখ বুলিয়ে নিলুম। ত্রিপুরায় আসতে হলে বিদেশীদের পারমিট নিতে হয় দিল্লী থেকে, আমাদের কোন পারমিটের দরকার নেই। রাজ্যের আয়তন প্রায় সাড়ে দশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার, জনসংখ্যা সাড়ে পনের লাখের কিছু বেশি। রাজ্যের রাজধানী আগরতলা ধর্মনগর থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে। বিদেশী স্টাইলের হোটেল নেই, সব কটা হোটেলই দেশী। তা ছাড়া সার্কিট হাউস আর ডাক বাংলো আছে।

প্রতি সোমবারে মিনিবাসে রাজ্যের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাবার ব্যবস্থা আছে জেনে খুশী হলুম। আজ শুক্রবার, রবিবারে আমরা আগরতলাতেই থাকব। কাল সেখানে পৌঁছবার পরেই টিকিট কাটতে পারলে এ সুযোগ হারাতে হবে না। সকাল আটটায় বেরিয়ে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ফেরা। দেখতে পাওয়া যাবে সিপাহী জলা মাতাবাড়ি ও নীরমহল। ভাড়া জন প্রতি পনের টাকা। শহরে দেখবার আছে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, কয়েকটি মন্দির আর একটি জাদুঘর।

যা দেখতে পাওয়া যাবে না তা হল আগরতলা থেকে একশো দশ কিলোমিটার দূরে ডুম্বুর ফল্‌স্ ও দুশো কিলোমিটার দূরে উনকোটি। চতুর্দশ দেবতা বাড়ি দশ কিলোমিটার দূরে। তা দেখা সম্ভব হবে কিনা জানি না।

এই কাগজে কিছু উৎসব ও মেলার কথাও আছে। সে পরে দেখে নেব।

বলে আমি কাগজপত্র স্বাতিকে ফিরিয়ে দিলুম।

স্বাতি বলল : ধর্মনগরে তা হলে আমাদের কিছুই দেখবার নেই!

'তাই মনে হচ্ছে' বলতে গিয়েও আমি থেমে গেলুম। কোথায় যেন পড়েছিলুম যে পুরাকালের কিছু অপরূপ স্থাপত্য-কর্মের নিদর্শন আছে ত্রিপুরার কৈলাশহরের কাছে। কৈলাশহর ধর্মনগরের কাছে বলেই শুনেছি। এ কথা মনে পড়তেই স্বাতিকে বললুম : তোমার কাগজপত্র আর একবার দাও তো!

স্বাতি কিছু আশ্চর্য হলেও ছাপা কাগজগুলো এগিয়ে দিল। আমি আর একবার তার উপরে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলুম। হ্যাঁ, এই জায়গার নামই উনকোটি, আগরতলা থেকে দুশো কিলোমিটার আর কৈলাশহর থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে, পঁয়তাল্লিশ মিটার উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর অনেকগুলি বিরাট মূর্তি। শিব হরগৌরী পাঁচ-মুখ শিব। বিষ্ণুপদ কালভৈরব বাসুদেব হনুমান রাম-লক্ষ্মণ গণপতির মূর্তি। এ সব বৌদ্ধ বা হিন্দু যুগের স্থাপত্য বলে চিহ্নিত। বসন্ত কালে অশোকাষ্টমীতে এখানে বিরাট মেলা বসে।

এ কথা জেনেই স্বাতি তার ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে বলল : চল, এই জায়গাটাই আজ দেখে আসি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম : এখান থেকে এ জায়গার দূরত্বটা কোথাও লেখা দেখছি না।

স্বাতি বলল : জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।

নিচের তলায় নেমেই আমরা ম্যানেজারকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তিনিও উনকোটির সঠিক অবস্থানের কথা জানেন না। হোটেলের সামনে দিয়ে কৈলাশহরের পথ। কৈলাশহর থেকে আগরতলা ১৭০ কিলোমিটার। উনকোটি কৈলাশহরে যাবার পথে হলে তো খুবই কাছে, তা না হলে একটু দূর হবে।

স্বাতি বলল : দূরে হলেও আমরা আজ দেখে আসতে চাই।

ম্যানেজার বললেন : তা হলে একটা গাড়ির দরকার। দেখি, ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

বলে টেলিফোনে কারও সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগলেন।

দুপুর তখন তিনটে বেজে গেছে। এক ভদ্রলোক পাশের টেবিলে বসে ভাত খাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে আমাদের চোখ পড়তেই তিনি বললেন : উনকোটি যেতে আপনারা পারবেন না।

কেন ?

উনকোটির পথে একটা পুল ভেঙে গেছে, সেখান থেকেই ফিরে আসতে হবে।

স্বাতি বলল : সে পথ কি এখনও মেরামত হয় নি ?

ভদ্রলোক বললেন : পরশু আমি যে অবস্থা দেখে এসেছি, তাতে এত তাড়াতাড়ি মেরামত হওয়া সম্ভব নয়।

যখন জানতে পারলুম যে এই ভদ্রলোক সরকারী চাকরি করেন তখন হতাশ হলুম খুব। কিন্তু স্বাতি আশা ছাড়ল না, বলল : সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দেখে আসা কি সম্ভব নয় ?

ভদ্রলোক বললেন : পাহাড়ের উঁচু-নিচু পথ ধরে কত হাঁটবেন! শেষ পর্যন্ত তো পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে!

আমি বললুম : পাহাড় তো পঁয়তাল্লিশ মিটার উঁচু, তার মানে শ দেড়েক ফুট।

পয়সা নষ্ট করতে চান, করুন।

বলে ভদ্রলোক আর কোন কথা কইলেন না।

ম্যানেজার বললেন : খবর দিয়েছি। একটু পরেই জানতে পারব গাড়িটা পাওয়া যাবে কি না।

এই অবসরে আমরা আগামী কালের জন্যে বাসের টিকিটের ব্যবস্থাও করে ফেললুম। ম্যানেজার দুটো টিকিট আনিয়ে দেবেন বলে তাঁর হাতেই ভাড়ার টাকা দিয়ে দিলুম। সকাল ছটা থেকে

এক ঘণ্টা পরে পরে বাস ছাড়বে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত। তারপরে আর কোন বাস নেই। সকাল ছটার বাসেই আমরা যাত্রা করব। তাহলে বিকেলের আগে পৌঁছতে পারব আগরতলায়। ঠিক কত ঘণ্টা সময় লাগবে, সরকারী কাগজপত্রে তার কোন উল্লেখ নেই।

স্বাতি বলল: এইসব দেখে মনে হচ্ছে যে ত্রিপুরা সরকার চান না যে ট্রেনে ধর্মনগর হয়ে কোন টুরিস্ট আসুক।

কথাটা ভুল নয়। পরে দেখেছিলুম যে বাস স্ট্যাণ্ডে কোন ব্যবস্থাই নেই। যাত্রীনিবাস দূরের কথা, ওয়েটিং রুম রিফ্রেশমেণ্ট রুম বাথরুমও নেই। কোথায় টিকিট কাটতে হবে, কোন্ বাস ছাড়বে, বাসের মাথায় মালপত্র কে তুলবে—এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবারও কেউ নেই। যত জ্বালা সবই যাত্রীর, আর কারও কোন ভাবনা নেই।

বেলা পড়ে আসছে দেখে ম্যানেজারকে আমি তাড়া দিয়ে বললুম: কি মশাই, গাড়ি পাওয়া যাবে?

ভদ্রলোক আর একবার টেলিফোনে খবর নিয়ে বললেন: না, গাড়ি এখনও ফেরে নি।

স্বাতি বলল: ট্যাক্সি পাওয়া যায়?

সে অনেক ভাড়া চাইবে।

আমি বললুম: এসো। নিজেরাই চেষ্টা করে দেখি।

বাহিরে বেরিয়েই মোড়ের উপরে, কয়েকটা জীপ দেখতে পেলুম। ঊনকোটির পথ সবাই জানে না। এক একজনের মাইলের হিসেব এক এক রকম। ভাড়াও তাই। পথে কোন পুল ভাঙা কিনা তা কেউ জানে না। তবে সেখানে পৌঁছতেই নাকি সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

স্বাতি কতকটা হতাশ হয়ে বলল: ছবি তুলতে না পারলে সেখানে যাবার কোন সার্থকতা নেই।

চোখে দেখতে পেলেও একটা ধারণা হবে তো!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউই যেতে রাজী হল না। সবাই কৈলাশহরে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। যাত্রী ধরে ধরে শেয়ারে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাবার উৎসাহ কারও হল না।

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এসো, এই শহরটাই দেখে আসি। বলে সামনের পথ ধরে এগিয়ে চলল।

আমি ঊনকোটির কথাই ভাবছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এটি পাল রাজাদের সময়কার শৈব তীর্থ বলে মনে করেন। অনেকে এই স্থান তার চেয়ে পুরনো বলে মনে করেন। এখানে এমন অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে যে শুধু শৈব নয়, শাক্ত তান্ত্রিক নাথ যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও এখানকার স্থাপত্য-কর্মে হাত ছিল বলে অনুমান করা হয়। আবার অনেকে নাকি বলেন যে এই অঞ্চলের আদিবাসীরাই এই সব নির্মাণ করেছিল। কিংবা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দে বাঙলার সেন রাজাদের আমলে এখানকার দেবরাজারা এই সব নির্মাণ করিয়েছিলেন।

স্বাতি বলল : জায়গার নাম ঊনকোটি হল কেন জানো ?

বললুম : দুটো কিংবদন্তী মনে পড়ছে। একটা ছোট। সেটা হল একজন লোক এখানে কোটি তীর্থ স্থাপন করতে চেয়েছিল। তার জন্যে একটি মূর্তি সম্পূর্ণ হয় নি বলেই নাম হয়েছে ঊনকোটি তীর্থ।

আর একটা ?

এ গল্পটা মজার। শিব এক কোটি দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে বারাণসী যাত্রা করেছিলেন। নিজেকে নিয়ে এক কোটি। এখানে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্লান্ত দেবতারা বিশ্রাম করতে চাইলেন। ঠিক হল যে সকালে মোরগ ডাকবার আগেই যাত্রা করতে হবে। যিনি তা পারবেন না, তিনি পাথরে পরিণত হবেন। তারপর দেখা গেল যে মোরগ ডাকবার আগে শিব একাই চলে

গেছেন। আর সবাই আছেন পাথরের মূর্তি হয়ে। উনকোটি দেবতার স্থান হল উনকোটি তীর্থ।

স্বাতি হেসে বলল : কিন্তু তীর্থ টা তো শিবেরই।

ত্রিপুরা থেকে ফিরে আসার পরে জেনেছিলুম যে উনকোটি ধর্মনগর থেকে কৈলাশহরে যাবার পথে একটা নিচু পাহাড়ে ওঠার পথের ধারে ও পরপারে। নানা আকার ও আকৃতির অনেক মূর্তি পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ আছে, অনেক মূর্তি ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়েছে। আবার কিছু অংশ মাটির নিচেও চাপা পড়েছে। মূর্তিগুলির কিছু খুব ছোট, আবার কিছু বিরাট আকারের। এ কথাও জানতে পারলুম যে ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা দপ্তর উনকোটি নামের বই প্রকাশ করেছেন ১৯৭২ সালে। আর তার তিন বছর আগে জয়ন্তনাথ চৌধুরী লিখেছেন আবৃত ইতিহাস—উনকোটি। ১৯২১-২২ সালের আর্কেয়লজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক রিপোর্টে উনকোটির বিবরণ আছে।

এও জানলুম যে উনকোটির প্রাচীন নাম সুব্রাইথুঙ্গা। সুব্রাই হল ত্রিপুরার প্রাচীন রাজা ত্রিলোচনের নাম। তিনি এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে এ জায়গার নাম হয়েছিল সুব্রাইথুঙ্গা। অনুসন্ধানে আরও কত কী জানা যাবে কে জানে!

## ৩২

অন্ধকার থাকতেই আমাদের উঠতে হল। যে রিক্সায় আমরা এই হোটেলে এসেছিলুম, তারাই সকালে এসে আমাদের বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেবে বলেছিল। এখন বারন্দায় বেরিয়ে দেখলুম যে একাধিক রিক্সা এসে হোটেলের সামনে জড়ো হয়েছে। নিচে নেমে হোটেলের দরজা খুলিয়ে আমরা বাহিরে এলুম। রিক্সাওয়ালারাই আমাদের মালপত্র নামিয়ে আনল। রাতেই আমরা বাসের টিকিট পেয়ে গিয়েছিলুম, হোটেলের বিলও মিটিয়ে দিয়েছিলুম রাতেই। তাই আর দেরি না করে সোজা চলে এলুম বাস স্ট্যাণ্ডে।

রিক্সাওয়ালারা আমাদের প্রতি সদয় ছিল। তাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নানাজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে একটা বাসের মাথায় আমাদের জিনিসপত্র তুলে দিল। আর ভাড়ার অতিরিক্ত কিছু পেয়ে খুশী হয়ে ফিরে গেল।

খানিকটা তফাতে কয়েকটা চালাঘরের মধ্যে চা ও রুটি বা পরোটার মতো কিছু খাদ্য তৈরি হচ্ছিল। যাত্রীদের দেখাদেখি আমরাও দু ভাঁড় চা খেয়ে এলুম। তারপর আমাদের যাত্রা শুরু হল।

আরাম করে বসতে পারার জন্যে মন আমাদের প্রফুল্ল ছিল। তার ওপরে সকালের স্নিগ্ধ বাতাস। এখন আর কোন দুর্ভাবনা নেই। এই বাসেই আমাদের এই যাত্রার শেষ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাব। তারপরে আর এ পথে নয়। ত্রিপুরাবাসীর মতো উড়োজাহাজেই ফিরব কলকাতায়। সেই কলকাতা। অনেক দুঃখ কষ্টের কলকাতা। তবু এই কলকাতায় ফেরার কথা মনে হতেই মন এক রকমের আনন্দে ভরে গেল।

স্বাতিও এই কথাই বলল: দুর্ভাবনার বোধহয় আর কিছু নেই।

কিন্তু আমি হেসে বললুম: কপালে দুঃখ থাকলে কখন কী হবে বলা যায় না।

কপালে তুমি বিশ্বাস কর?

না করেও যে উপায় নেই। কিছুদিন আগেও কি আমরা ভাবতে পেরেছিলুম যে এমনি করে দুজনে আমরা বেড়াতে পারব!

বারে বারে অতীতটাকে টেনে আন কেন বল তো!

হেসে উত্তর দিলুম: এখনই হয়তো ইতিহাসের কথা জানতে চাইবে।

আমার কথা শুনে স্বাতিও হেসে বলল: ইতিহাসের কথা পথেই শেষ কর। আগরতলায় পৌঁছে আর ইতিহাস শুনতে চাইব না।

বললুম: মহাভারতে ত্রিপুরার উল্লেখ আছে দু জায়গায়। পঞ্চ পাণ্ডবকে বনে পাঠিয়ে দুর্যোধন ভারতের সম্রাট হয়েছেন বলে ঘোষণা করবেন, তাই কর্ণকে পাঠালেন দিগ্বিজয়ে। কর্ণ যে সব রাজ্য জয় করেন তার মধ্যে ত্রিপুরার নাম আছে। ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনাতেও ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়। কোশলপতি বৃহদ্বল ত্রিপুরার সেনা পরিচালনা করেছিলেন। রাজমালা নামে একখানি বাঙলা কাব্যগ্রন্থে আমরা ত্রিপুরার রাজাদের বংশপরিচয় পাই। রাজমালা ইতিহাস নয়, কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে তার মূল্য আছে। কাশ্মীরে যেমন রাজতরঙ্গিণী, ত্রিপুরায় তেমনি রাজমালা। কিন্তু সাহিত্য বিচারে দুটি গ্রন্থের অনেক তফাৎ। রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা কহ্লণের কবিখ্যাতি দেশবিশ্রুত, আর রাজমালার রচয়িতার নাম আমরা জানি না। শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে এই রাজমালা ত্রিপুর ভাষায় রচিত হয়েছিল। সুভাষা বা বাঙলায় অনুবাদ করিয়েছেন রাজা ধন্যমাণিক্য। তাঁর কাল ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম। রাজাদের মাণিক্য উপাধি দিয়েছিলেন গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দীন। রত্নদা রত্নমাণিক্য

হয়েছিলেন। দশ হাজার বাঙালী এনে বাঙলার সংস্কৃতি আমদানি করেন তিনি। জেম্‌স্ লঙ্ এই কথা বিশ্বাস করে লিখেছিলেন যে রাজমালাই বাঙলার প্রাচীনতম গ্রন্থ। তার কারণ চৈতন্যচরিতামৃত ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লেখা হয় নি এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণও পরবর্তীকালের রচনা। তিনি এই ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং দিনেশচন্দ্র সেনও মেনে নিয়েছিলেন এই কথা। বলেছিলেন যে রাজতরঙ্গিণীর চেয়ে এই রাজমালা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু একালের পণ্ডিতরা এ কথা মানেন না। তাঁদের মত হল রাজমালা অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বের কথা যা লেখা হয়েছে, তা ঐতিহাসিক বলে মেনে নেওয়া উচিত হবে না।

সে যাই হোক, এই রাজমালার মতে ত্রিপুরার রাজারা চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির বংশধর। যযাতির জরা গ্রহণ করবার জন্য তাঁর পঞ্চম পুত্র পুরু রাজা হয়েছিলেন, আর প্রথম চার পুত্রকে তিনি নির্বাসিত করেছিলেন। তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যুকে তিনি শাপ দিয়েছিলেন, তোমার যৌবন তুমি আমাকে দিলে না, তোমার বাসনাও কোন দিন পূর্ণ হবে না। এমন দেশে তোমাকে বাস করতে হবে যেখানে রাজার যোগ্য কোন যানবাহন চলে না। যাতায়াতের একমাত্র উপায় হবে ভেলা। নির্বাসিত দ্রুহ্যু ভারতের পূর্ব সীমান্তে হিড়িম্বিদেশের দক্ষিণে পর্বতময় কিরাত রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মপুত্র বা কপিলার ধারে কিরাতদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে দ্রুহ্যু হয়েছিলেন এই দেশের রাজা। নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ত্রিবেগ নগরে। দ্রুহ্যুর পরে তাঁর পুত্র ত্রিপুর হয়েছিলেন এই দেশের রাজা।

স্বাতি বলল : এ দেশের সমস্ত দেশীয় রাজারাই তো সূর্য বা চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন।

কিন্তু দ্রুহ্যুর বংশ বলে দাবী করায় একটা গোলমাল বেধেছে।

যযাতির দুই স্ত্রী—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যেব কন্যা দেবযানি ও দৈত্যরাজ বৃষপর্বাব কন্যা শর্মিষ্ঠা। দেবযানির পুত্রদেব নাম যদু ও তুর্বসু। এই যদুবংশে জন্ম কৃষ্ণেব। দ্রুহ্যু শর্মিষ্ঠাব জ্যেষ্ঠপুত্র। আব বিষ্ণু-পুবাণেব মতে যযাতি দ্রুহ্যুকে পাঠিযেছিলেন পশ্চিম দিকে। তাঁর বংশের বাজাবা উদীচি প্রভৃতি ম্লেচ্ছদের রাজা হযেছিলেন। উদীচি হল উত্তব দিক। কাজেই ত্রিপুবার বাজবংশ দ্রুহ্যুর বংশ বলতে অনেকেই বাজী নন।

স্বাতি বলল: এ নিযে আমাদেব কোন মাথা ব্যথা নেই। তুমি ইতিহাসের কথা বল।

তাহলে ঐতিহাসিকদের কথা বলতে হয। তাঁবা বলেন যে, বর্তমান বাজবংশ শান জাতি থেকে উৎপন্ন। এই জাতি লোহিত্য বংশ নামেও পবিচিত। বিদেশীবা বলেন টিবেটো-বার্মান। এও বলেন যে এই বাজ্যেব অধিবাসী ত্রিপুবী ও কাছাড়ীবা একই গোষ্ঠীব মানুষ। তাদেব আকাব-আকৃতি আচাব-ব্যবহাব ধর্ম-চেতনা এই সবেব মিল দেখেই এ কথা মেনে নেওযা যায। রাজমালাও এ কথা অস্বীকাব কবে নি। সুনীতিবাবু এদেব কিরাত বা ইণ্ডো-মঙ্গোলযেড বলেছেন। ভাষাগতভাবে এবা বোদো।

স্বাতি বলল: বুঝেছি।

কী বুঝেছ?

এবা এই অঞ্চলেবই লোক, এদেব নিযে মাথা ঘামাবাব কোন দবকাব নেই।

হেসে বললুম: তাহলে এ বাজ্যেব ত্রিপুবা নাম কেন হল, তা নিযে মাথা ঘামাবাব প্রযোজন আছে কিনা তা বোঝবাব চেষ্টা কব।

বল।

বাজমালায় আছে যে এই রাজ্যেব বাজা ত্রিপুরের নামেই ত্রিপুবা হযেছে।

স্বাতি বলল: তবে আব কি, এক কথায় ঝামেলা মিটে গেল।

গম্ভীর হয়ে বললুম ঃ কিন্তু ঐতিহাসিকেরা ত্রিপুর নামের কোন রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের কথা হল যে মুসলমান আমলের আগে যে সব রাজার নাম রাজমালায় পাওয়া যায়, সে সবই কল্পিত।

তবে ?

হাণ্টার সাহেব বলেছেন যে এই রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর নামেই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা হয়েছে।

স্বাতি বলল ঃ এ কথা মেনে নিলেই বা ক্ষতি কী ?

বললুম ঃ ব্যাপারটা সেই তর্কের মতো—তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল।

মানে ?

মানে ত্রিপুরাসুন্দরীর নামে ত্রিপুরা নাম, না ত্রিপুরার নামে ত্রিপুরাসুন্দরী।

তবে তুমি কী বলতে চাও ?

আমি না। আর এক দল বলেন যে এই দেশটা ছিল শিবের, তাঁর ত্রিপুরারি বা ত্রিপুরেশ্বর নাম থেকে দেশের নাম ত্রিপুরা হয়েছে।

স্বাতি বলল ঃ ঘুরে ফিরে সেই ত্রিপুর আর ত্রিপুরারি।

বললুম ঃ শিবের নাম ত্রিপুরারি কেন হল জানো ?

না।

তারকাসুরের তিন পুত্র ছিল। তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে তারা বর পেয়েছিল যে তারা তিনটি পৃথক পুরে সবরকম সুখের মধ্যে হাজার বছর বাস করবে। তারপর সেই তিনটি পুর একত্র মিলিত হলে যে দেবতা এক বাণে এই ত্রিপুর ধ্বংস করতে পারবেন তাঁরই হাতে তাদের মৃত্যু হবে।

স্বাতি বলল ঃ শিব এই ত্রিপুর ধ্বংস করে ত্রিপুরারি হয়েছিলেন। তাহলে আমি একটা মত চালু করে দিই, কী বল ?

তোমার মত কেউ মানবে কেন ?

না মানুক। তবু আমারও তো একটা মত থাকতে পারে।

বল।

বললুম : এই রাজ্যের সব চেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হল উনকোটি। সেখানকার কিংবদন্তী হল শিবকে নিয়ে। আর সেখানে গেলে শিবেরই বিরাট মূর্তি দেখতে পেতে। পঞ্চমুখ শিব দুর্গা গণেশ আরও বহু মূর্তি। কিন্তু শিবই প্রধান। ঐতিহাসিকরাও মেনে নিয়েছেন যে এটি তখন শৈব তীর্থ ছিল। আমার মত হল যে তারা ত্রিপুরারি শিবের ভক্ত ছিল। হয়তো বিশ্বাস করত যে শিব এখানেই ত্রিপুর ধ্বংস করেছিলেন, কিংবা রাজমালার অত্যাচারী রাজা ত্রিপুরকে বধ করেছিলেন এইখানে। শিবের ত্রিপুরারি নাম থেকেই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা ও অধিবাসীদের ত্রিপুরী নাম হয়েছে, আর রাজধানী উদয়পুরে পীঠস্থানের শক্তির নাম হয়েছে ত্রিপুরাসুন্দরী।

স্বাতি হেসে বলল : গল্পটা বেশ মিলিয়ে দিয়েছ।

কথায় কথায় ধর্মনগর থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছিলুম। এই বারে আমাদের বাস পথের ধারের একটা বাজারে এসে দাঁড়াল। যাত্রীরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ছে দেখে আমরাও নেমে পড়লুম। সামনেই সারি সারি চায়ের দোকান। নানা রকম খাবারও পাওয়া যায়। সকলের সঙ্গে আমরাও কিছু খেয়ে নিলুম। তারপরে আবার আমাদের বাস ছাড়ল। আবার আমরা ইতিহাসের গল্প শুরু করলুম।

স্বাতি গোড়াতেই বলল : সংক্ষেপে বল।

বললুম : সংক্ষেপেই বলতে হবে।

কেন ?

রাজমালা তো পড়ি নি। সব রাজার নামও জানি নে। যে দু-চারটি জেনেছি তা বাঙলা বই পড়েই জেনেছি। তাঁরা সবাই মধ্য যুগের রাজা এবং ঐতিহাসিক রাজা বলেই স্বীকৃত। তাঁদের মধ্যে

প্রথম হলেন রত্নমাণিক্য। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ত্রিপুরা বুরঞ্জীর মতে গৌড়ের সুলতানের সহায়তায় তিনিই এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমলের যে সব মুদ্রা পাওয়া গেছে তা ১৩৬৪ থেকে ১৩৬৭ সালের। তাঁর প্রপৌত্র ধর্মমাণিক্য ও রাণী কমলাবতী এই রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করেন। পথঘাট পুষ্করিণী ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতি নয়, ত্রিহুত থেকে ওস্তাদ আনিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রসার করেন। নিজের সেনাদলে জাতিভেদ তুলে দেন। সৈন্যদের পংক্তি ভোজনে বসিয়ে একজন নীচ জাতের কুকি সর্দারকে লোক গণনা করতে বলেছিলেন। হাতে একটা কাঠি নিয়ে সেই সর্দার সবার মাথা স্পর্শ করে লোক গণনা করে। রাজার ভয়ে সেদিন কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায় নি, কিন্তু পরে তারা কাঠি ছোঁয়া নামে পরিচিত হয়েছিল।

স্বাতি বলল : রাণী কমলাবতী কী করেছিলেন ?

বললুম : তিনি যে জনপ্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ হল এখনও তাঁর নাম শোনা যায় পল্লীগীতিতে। আর এঁদেরই পুত্র ধন্যমাণিক্য ছিলেন ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। তিনি রাজা হয়েছিলেন ১৪৯০ সালে এবং তাঁর রাজধানী উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৫০১ সালে। তাঁর পঁচিশ বছরের রাজত্বকালে তিনি নরবলি প্রথা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেই অমর হয়ে আছেন।

স্বাতি বলল : তুমি কি খুব বেশি সংক্ষেপ করছ না ?

বললুম : না। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।

তাহলে তার পরে বল।

গোবিন্দমাণিক্যের নাম অমর করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজর্ষি বই ও বিসর্জন নাটকে। তিনি রাজা হয়েছিলেন ১৬৬০ সালে। দিল্লীতে তখন ঔরঙ্গজেব বাদশাহর শাসন। সুজা তাঁর হাতে পরাজিত হবার পরে এই ত্রিপুরার পথেই আরাকানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এ ঘটনা তাঁর রাজা হবার কিছু আগের। শোনা যায় যে সুজা ত্রিপুরায়

আছেন জেনে ঔরঙ্গজেব গোবিন্দমাণিক্যকে চিঠি লিখে আদেশ করেছিলেন সুজাকে ধরে দিতে। কিন্তু সুজা তার আগেই আরাকানে চলে গিয়েছিলেন বলে গোবিন্দমাণিক্য ঔরঙ্গজেবের আদেশ পালন করতে পারেন নি। এই সময়ে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্র রায় সিংহাসন দাবী করেন। কেউ বলেন যে মীরজুমলার সহায়তায় তিনি রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু রাজমালায় আছে যে গোবিন্দ-মাণিক্য স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করেন। তবু একটা যুদ্ধ হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান। সে যুদ্ধ হয়েছিল নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে গোবিন্দ-মাণিক্যের পুত্র রায়দেবের। রাজা হয়ে নক্ষত্র রায় নাম নিয়েছিলেন ছত্রমাণিক্য।

রাজা হবার এক বছরের মধ্যেই রাজ্য ত্যাগ করে গোবিন্দ-মাণিক্য উপজাতি রিয়াংদের গ্রামে বসবাস করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রিয়াংদের দুর্ব্যবহারে তিনি দেশ ছেড়ে আরাকানের রাজা চন্দ্র সুধর্মার আশ্রয়ে চলে যান। শোনা যায় যে সেখানে তাঁর সুজার সঙ্গে দেখা হয় ও বন্ধুতাও হয়। গোবিন্দমাণিক্যকে তিনি একটি হীরের আংটি ও তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে সুজার মৃত্যু হয়েছিল আরাকানেই।

ছ বছর পরে গোবিন্দমাণিক্য আরাকান রাজের সহায়তায় ত্রিপুরার সিংহাসন উদ্ধার করেন। অনেকে মনে করেন যে গোবিন্দ-মাণিক্য ছত্রমাণিক্যকে হত্যা করেছিলেন।

তাঁর রাজত্বকালে রিয়াংরা বিদ্রোহ করেছিল। রাজা তাদের দমন করে নেতাদের হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী নেতাদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন তাঁর রাণী গুণবতী। গোবিন্দমাণিক্য রাজ্যের অনেক উন্নতি করেছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটে সীতাকুণ্ড পাহাড়ে চন্দ্রনাথ শিবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তিনি। আর তাঁর রাণী উদয়পুরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিষ্ণুর মন্দির। তারপর গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরা-সুন্দরীর মন্দিরে বলিদান প্রথা রহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

স্বাতি বলল : সে গল্প আমাদের জানা।

তাহলে আমার কথাটিও ফুরলো।

কেন ?

এর পরে ইতিহাসের কথা আর জানি নে।

আগরতলা যাবার এই রাজপথকে পাহাড়ী পথ বললে বোধহয় ঠিক হবে না। এ পথ ঘুরে ঘুরে কোন পাহাড়ের উপরে উঠছে না। এ পথে ওঠা-নামা নেই বলেই মনে হচ্ছে। এ পথ সাপের মত এঁকে বেঁকে পাহাড়কে বেষ্টন করে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের যেন শেষ নেই। কিন্তু আমরা সমতল ভূমির উপর দিয়েও চলছি না। কত উঁচু দিয়ে এক একটা পাহাড় অতিক্রম করে চলছি তা বলতে পারব না, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি। গাছপালায় অন্ধকার হয়ে গেছে পথ. শীতল বাতাসের স্পর্শ পেয়েছি।

চলতি বাসে একটু জোরে জোরে কথা বলতে হয়। তা না হলে গাড়ির শব্দে সব কথা শুনতে পাওয়া যায় না। আমরা পাশাপাশি বসে কথা বলেছি বলেই পরস্পরের কথা শুনতে পেয়েছি। এইবারে বিশ্রামের প্রয়োজনে আমরা নীরবে চলতে লাগলুম।

এ পথে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁদের কাছে কয়েকটা নাম শুনতে পেলাম। জায়গার নাম কুমার ঘাট মনু ঘাট। মনু নামের নদীও আছে। আর খোয়ই নদী। পাহাড়ের নাম আঠারো মুড়া তেলিয়া মুড়া সোনা মুড়া। মুড়া মানে নিশ্চয়ই মুণ্ড বা মাথা। পাহাড়ের মাথা।

মাঝে মাঝে আমাদের বাস থেমেছে। কোনখানে কমলা লেবু খেয়েছি, কোনখানে কলা। যাত্রীদের দেখেছি ডিঙ্গামাণিক নামে এক রকমের লম্বা কলা কিনতে। ডিমাপুরেও নতুন এক জাতের কলা দেখেছি, তার নাম অমৃত সাগর। খেয়ে দেখি নি বলে এই সব কলার আস্বাদ কী রকম তা জানি নে।

আগরতলায় পৌঁছবার আগেই আমরা দুপুরের আহার সেরে নিয়েছিলুম। ভাত ডাল তরকারি ও মাছের ঝোল পাওয়া যায়

পথের ধারের হোটেলগুলোতে। যাক, তিন টাকায় ভর পেট খাওয়া। চাইলে দই মিষ্টিও পাওয়া যায়। হোটেলের চেহারা দেখে ভক্তি হয় না। কিন্তু পিছনের দিকে বাথরুম আছে, হাত পা ধোবার আলাদা জায়গা আছে। আর সব চেয়ে বড় কথা যে খেয়ে তৃপ্তি হয়। যারা খাওয়ায়, তাদের যত্ন ও আন্তরিকতায় মন ভরে।

আগরতলায় কোথায় উঠব আমাদের জানা ছিল না। সার্কিট হাউসের কথাই স্বাতি প্রথমে বলল। একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে তা অনেক দূরে এয়ার পোর্টে যাবার পথে কুঞ্জবনে। আর আগে থেকে ব্যবস্থা করা না থাকলে অত দূরে গিয়ে ফিরে আসতে হবে।

এই বাসে আমাদের মতো টুরিস্ট কেউ নেই; বেশীর ভাগই বাঙালী। তাঁরা কেউ নিজেদের বাড়িতে, কেউ বা আত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে উঠবেন। তাঁদেরই একজন বললেনঃ বড় রাস্তার উপরে হোটেল ওকে-তে উঠবেন। আর একটু নিরিবিলি চাইলে তাদেরই হোটেল মীনাক্ষীতে। বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, ভাল হবে বলেই মনে হয়।

এক সময়ে আমরা শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলুম। তার পর দেখা গেল জনবহুল শহর ও বাজার। অনেক বাস দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়, কিন্তু আমাদের বাস খানিকক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েই আবার চলতে শুরু করল। তারপর এই রাজপথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরে সরকারী বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে ছুটে চলল। পথের দু ধারের ঘর বাড়ি দেখতে দেখতেই আমরা অনেক দূরে সরকারী বাস স্ট্যাণ্ডে এসে প্রবেশ করলুম।

বাহিরের পথে অপর্যাপ্ত সাইকেল রিক্সা কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু ভিতরে কোন যানবাহন নেই। বাস স্ট্যাণ্ডের প্রাঙ্গণে যানবাহনের প্রবেশ নিষেধ।

আমরা নেমে পড়লুম। রিক্সাওয়ালারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারাই

কুলির কাজ করল। কিন্তু স্বাতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল পাশের একটি অট্টালিকার দিকে। একেবারে সম্প্রতি অতি আধুনিক শৈলীতে এটি নির্মিত হয়েছে। দোতলা বাড়ি, বাইরে থেকে দেখেই ভিতরটা আকর্ষণীয় বলে মনে হল।

জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে এটা ত্রিপুরা পরিবহন সংস্থার অফিস হবে, আর উপরে থাকবে যাত্রী নিবাস ও ভোজনাগার। এখনও এটি চালু হয় নি। হলে আমরাও হয়তো থাকতে পারতুম।

কিন্তু এই বাড়ি দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল ধর্মনগরের দুরবস্থার কথা। বহু কষ্ট স্বীকার করে যে টুরিস্টরা ট্রেনে আসবে আগরতলায়, তারা আমাদের মতো কষ্ট করেই আসবে। রাজ্যের রাজধানীতে ভাল বাসস্থান নিশ্চয়ই আছে। এরকম সুন্দর একটা বাড়িতে যাত্রীদের রেস্টহাউসের প্রয়োজন এখানে ধর্মনগরের চেয়ে অনেক কম। এ রকম একটা রেস্টহাউস সেখানে আছে জানলে যাত্রীরা অনেক নিশ্চিন্ত মনে ট্রেনে আসতে পারতেন। আগরতলায় আসার পথে আমারা ত্রিপুরা সরকারের একটা বাণী দেখে খুশী হয়েছি। নানা জায়গায় লেখা ছিল, 'প্রত্যেক পর্যটক আমাদের সম্মানীয় অতিথি'। একমাত্র এই পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়া পর্যটকদের আর কোন সম্মান আমরা পথে দেখি নি। রাজধানীতে এসে তা দেখতে পাব, এই আশা নিয়ে আমরা রিক্সায় উঠলুম।

রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞাসা করল : কোথায় যাব?

স্বাতি বলল : মীনাক্ষী হোটেলে।

## ৩৩

আমরা হোটেল ওকে-র সামনে এসে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। এই গলির ভিতরেও নানা পণ্যের দোকান। এই সব দোকান পেরিয়ে একটু খোলামেলায় হোটেল মীনাক্ষী। পরিবেশটা একেবারেই গ্রাম্য। সদর রাস্তার এত কাছে যে এই রকম গ্রাম্য পরিবেশ থাকতে পারে, এ শুধু মফঃস্বল শহরেই সম্ভব।

জিনিসপত্র রিক্সায় রেখে আমরা ঘর দেখলুম। দোতলায় দুজনের উপযোগী ঘরের ভাড়া ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা। প্রথমেই যে ঘরটা আমরা দেখলুম, তা আমাদের পছন্দ হয়ে গেল। ত্রিশ টাকার ঘর। অন্যগুলো শুধু আকারে বড় বলে আর দেখলুম না। বেয়ারারা আমাদের জিনিসপত্র ঘরে দিয়ে গেল। কিন্তু রিক্সা আমরা ছেড়ে দিলুম না। বললুম: এখনি একটু ঘুরে আসব।

বড় বিনয়ী ভদ্র স্বভাবের ম্যানেজার। তিনি বললেন: একটু চা খেয়ে যাবেন না?

বললুম: এসে খাব।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের অফিস বন্ধ হয়ে যাবে বলে আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। হোটেল থেকে অনতিদূরে এই অফিস। সদর রাস্তা থেকে ভিতরে ঢুকে একটা পুরনো বাড়ির মধ্যে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি একাই এখন সব কাজ করছেন। যাঁরা আগে এসেছিলেন তাঁরা চলে যেতেই আমি বললুম: সোমবার কলকাতায় ফিরতে চাই।

ভদ্রলোক চার্ট না দেখেই বললেন: সোমবারে হবে না।

স্বাতি বলল: হবে না! শুনেছি এখন বোর্ডিং চলছে।

ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু সোমবারে চুরাশিজনের একটা ট্রুপ কলকাতা হয়ে দিল্লী যাচ্ছে। দিল্লীতে তারা লোকনৃত্য দেখাবে।

স্বাতি বলল : সর্বনাশ !

আমি বললুম : সর্বনাশ নয়, আমরা তাহলে মঙ্গলবারে যাব।

ভদ্রলোক এবারেও তাঁর চার্ট না দেখে বললেন : মঙ্গলবারে হবে।

স্বাতি বলল : তাই দিন।

মঙ্গলবারে আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরছি বলে ভারি পুলক জাগল মনে। টাকা পয়সা দিয়ে দুখানা টিকিট ব্যাগে পুরে স্বাতি বলল : এইবারে টুরিস্ট অফিসে চল।

এই টুরিস্ট অফিসের কথা রিক্সাওয়ালাকে বোঝাতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হল। টুরিস্ট লিটারেচারে কণ্ডাকেটড টুরের কথা লেখা আছে, কিন্তু কোথায় গেলে টিকিট পাওয়া যাবে সে উল্লেখ নেই। একটা টেলিফোন নম্বর আছে, কিন্তু ঠিকানা নেই। রিক্সাওয়ালাও কিছু জানে না দেখে দুঃখ হল। জিজ্ঞাসাবাদ করে গান্ধীঘাটের নিকটে একটা অফিসে এলুম। মোটামুটি ভাবে বড় অফিস এটি, কিন্তু লোক একজনও নেই। কাউণ্টার ফাঁকা, ভিতরে একটা বসবার ঘর আছে, তার চারিদিক ঘিরে কয়েকজন অফিসারের ঘর। কিন্তু এখন কেউ নেই। শনিবার দুপুরে ছুটি হয়ে যায় বলে মনে হল। কিন্তু আমরা ফিরব না বলে দাঁড়িয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে একজন বেয়ারা এসে আমাদের বসতে বলল ভিতরের ঘরে। বেশ গরম এই ঘরে। পাখা চলছে না। কিছুক্ষণ পরে দু-একজন ভদ্রলোক এসে একটা একটা ঘরে ঢুকে পড়লেন, কিন্তু আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেন না কেউ। স্বাতি বলল : কিছু হবে না এখানে। নিজেদের ব্যবস্থা করেই সব কিছু দেখতে হবে।

আমরা যখন উঠে পড়ব ভাবছিলুম, ঠিক তখন একজনকে কাউন্টারে এসে বসতে দেখলুম। আমরা আর দেরি না করে তাঁকে চেপে ধরলুম।

ভদ্রলোক বললেন : রিজার্ভ করে গেছেন ?

না।

তবে হবে না।

কেন ?

সব সীট রিজার্ভ করা আছে।

আমি বললুম: সীট যে রিজার্ভ করতে হয় সে কথা তো কোথাও লেখা নেই! আমরা কলকাতা থেকে এসে কি এই কথা শিখে ফিরে যাব!

স্বাতি বিরক্ত ভাবে বলে উঠল: এখানেও সেই একই কথা লেখা আছে--প্রত্যেক পর্যটক আমাদের সম্মানীয় অতিথি।

এবারে ভদ্রলোক একটু দয়ার চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন!

বললুম: আজই এসেছি, আর দুদিন পরেই চলে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন: দুখানা টিকিট চাই ?

হ্যাঁ।

তিনি আর কোন প্রশ্ন না করে খসখস করে দুজনের টিকিট লিখে বললেন: তিরিশটা টাকা দিন।

বলে স্বাতির হাতেই টিকিট দিলেন।

আমরা টাকার সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদও দিলুম। ভদ্রলোক বললেন: কাল সকাল সাতটায় এখানে আসবেন।

সাতটায় কেন, আটটায় তো বাস ছাড়বে!

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বললেন: তাই নিয়ম। রিপোর্টিং টাইম সেভেন।

আর কোন প্রতিবাদ না করে আমরা ফিরে এলুম। সারা দিন বাসের ধকলে শরীর বেশ ক্লান্ত হয়েছিল। ধর্মনগরের নোংরা বাথরুমে স্নান করতে পারি নি। তাই এখানে ভাল করে স্নান করলুম আগে। জামা কাপড় বদল করে নিজেকে বেশ পরিচ্ছন্ন বোধ হল। তারপরে চা খেলুম।

অপরাহ্নের রোদ তখন পড়ে এসেছে। অন্ধকার নামবে একটু পরেই। পথেঘাটে বাতি জ্বলে উঠবে। স্বাতি বলল: বেরোবার ইচ্ছা আছে ?

বললুম: কোথায় বেরোব ?

স্বাতি বলল: তবে আমি একখানা চিঠি লিখি। কোহিমা থেকে বাবা মাকে খবর দিতে পারি নি। দিয়েছি ইম্ফল থেকে। এবারে ফেরার কথাটা জানিয়ে দিই।

বললুম: এ চিঠি বোধহয় আমরা পৌঁছবার পরে পাবেন।

স্বাতি বলল: কষ্ট করে তাঁরা এয়ারপোর্টে আসেন, এ আমি চাই নে। ট্যাক্সি নিয়ে আমরা নিজেদের বাড়ি যেতে চাই। তারপরে সুবিধামতো দেখা করে আসব।

আমি কোন মন্তব্য প্রকাশ করলুম না।

সকাল বেলায় ঠিক সাতটায় আমরা গান্ধীঘাটের অফিসে পৌঁছে গেলুম। কিন্তু অফিসে কেউ নেই, অফিসের দরজাই খোলা হয় নি। ঘুরে দেখলুম যে ভিতরের প্রাঙ্গণে কোন বাসও দাঁড়িয়ে নেই। অনেক পরে একজন বেয়ারা এসে অফিসের তালা খুলল। তাকে জিজ্ঞাসা করে বাসের খবর পাওয়া গেল না। আরও পরে দু-চারজন যাত্রী এলেন। কিন্তু আটটার আগে বাস এল না। কোন গাইডও না।

আটটার কিছু পরে একখানা মিনি বাস এসে গেটের কাছে দাঁড়াতেই দেখলুম কিছু যাত্রী এই বাসে বসে এসেছেন। আমরাও উঠলুম এই বাসে। আর জানতে পারলুম যে এয়ারপোর্ট কলোনি থেকে কিছু যাত্রীকে আনা হল। আমাদের যাত্রা হল শুরু।

উনিশ জন যাত্রীর এই মিনি বাসে একজন গাইড আছে। মাইকে সে তার কাজ শুরু করল। যাত্রা শুভ হোক। ইত্যাদি।

আমি লক্ষ্য করে দেখলুম যে আমরা দক্ষিণের পথ ধরেছি। যে পথে আমরা আগরতলায় এসে পৌঁছেছি, এ সে পথ নয়। ধর্মনগর এই রাজ্যের উত্তরাংশে, কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কৈলাশহর, আগরতলা রাজ্যের মাঝখানে হলেও পশ্চিমের সীমানা ঘেঁষে। এই তিনটি শহরই বাঙলা দেশের সীমান্তের ধারে। এখন আমরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলেছি।

জানতে পারলুম যে আজ আমরা সারা দিন ধরে তিনটি জায়গা দেখব—সিপাহী জলা, মাতাবাড়ি ও নীরমহল। সিপাহী জলা একটি পিকনিকের জায়গা, মাতাবাড়ি পীঠস্থান, আর রুদ্রসাগর নামে একটি হ্রদের মাঝখানে নীরমহল একটি পুরনো রাজপ্রাসাদ।

টুরিস্ট লিটারেচারে এ ছাড়া আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের উল্লেখ আছে। শহরে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ। শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে চতুর্দশ দেবতার মন্দির। শহরের কোন্ দিকে তার উল্লেখ নেই, চতুর্দশ দেবতারও নাম নেই। কিন্তু মূর্তিগুলি যে অষ্ট ধাতুতে তৈরি তা লেখা আছে। উনকোটি ছাড়াও আর একটি জায়গার উল্লেখ আছে, তার নাম ডুম্বুর প্রপাত। শহর থেকে একশো দশ কিলোমিটার দূরে গুমতি নদীর উৎসে এই প্রপাত। এর বর্ণনা আছে, লোকে যে এই জলপ্রপাতের নিকটে তীর্থমুখে স্নান করে তাও বলা আছে। কিন্তু সেখানে যাবার কী ব্যবস্থা, তার উল্লেখ নেই। এখানে নাকি ডুম্বুর লেক নামে একটি জলাশয় আছে। তার দুশো চল্লিশ কিলোমিটার দূরে জাম্পুই হিল। পরবর্তী কাগজপত্রে নাকি এ দুটির নাম আছে। কিন্তু কোন্‌টা কোন্ দিকে তার উল্লেখ নেই। এই যে আজ আমরা পনের টাকার টিকিট কেটে বেড়াতে বেরিয়েছি, টুরিস্ট লিটারেচারে তা লেখা আছে। কিন্তু কী দেখতে পাব তা গাইডের মুখেই জানতে পেলুম। আগরতলা থেকে এই জায়গাগুলির দূরত্ব লেখা আছে—সিপাহী জলা তিরিশ, মাতাবাড়ি পঞ্চাশ এবং নীরমহলও পঞ্চাশ কিলোমিটার

দূরে। কিন্তু এদের পারস্পরিক দূরত্ব লেখা নেই। একটি মানচিত্রে এই জায়গাগুলো দেখানো থাকলে সকলেরই সুবিধা হত।

আমরা বেশ বেগে চলেছিলুম। আধ ঘণ্টায় সিপাহী জলা পৌঁছবে বলে লেখা ছিল। কিন্তু বাস এসে বিশালগড় নামে এক জায়গায় দাঁড়াল। জলযোগের জন্য বিরতি। বিশালগড়ে এখন বোধহয় কোন গড় নেই, নামটিই শুধু আছে। ছোটখাট শহর একটি। আমরা চা খেয়েই বেরিয়েছিলুম। তাই বাজারটা ঘুরে দেখলুম। আর আশ্চর্য হলুম একজন আদিবাসী রিয়াং মহিলার তামাক খাওয়া দেখে। হাত দুই লম্বা একটা বাঁশের চোঙে মুখ লাগিয়ে তামাক খাচ্ছে, নিচের দিকে কল্‌কে লাগাবার ব্যবস্থা আছে। একটা দোকানের পিছনে ছায়ায় বসে সেই মহিলাটি এক মনে তামাক খাচ্ছিল। স্বাতি একটা ছবি নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

সিপাহী জলায় পৌঁছতে আমাদের বোধহয় ঘণ্টা খানেক সময় লাগল। সদর রাস্তা ছেড়ে একটা বনপথ ধরে আমরা এই জায়গায় এলুম। বাস থেকে নেমেই দেখলুম ফরেস্ট বাংলোর গেট। এখানে ঢুকতে হলে পঞ্চাশ পয়সা দক্ষিণা দিতে হয়। আর এক দিনের ভাড়া উনিশ টাকা পঁচিশ পয়সা। এই ভাড়ায় খেতেও পাওয়া যায়। এর পিছনের দিকে জলাশয়।

গাইডের কাছে জানা গেল যে এই জায়গাটা কোন সিপাহীর ছিল বলেই এর নাম সিপাহী জলা হয়েছে। এখন এই জলাশয়টি কেটে বাড়িয়ে পরিষ্কার করে তাতে প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছে। ফরেস্ট বাংলোর অন্য ধারে গিয়ে কয়েকটি প্যাড্‌ল্ বোট দেখলুম ঘাটে বাঁধা আছে, ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দিয়ে এই সব নৌকোয় উঠতে হয়। দুজনকে পাশাপাশি বসে সাইকেলের মতো প্যাড্‌ল্ চালাতে হয়।

এইবারে নৌকোয় চাপবার সময়ে দেখলুম যে যাত্রীদের মধ্যে

দুটো ভাগ আছে। যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন জলাশয়ের ধারে। পরে দেখেছিলুম যে তাঁরা উদয়পুরে গিয়ে ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা দেবার জন্যেই বেরিয়েছেন, আর এই ভাবে সময় নষ্টের জন্য বিরক্ত হচ্ছেন। আমরা দুজনে একখানা নৌকোয় বসে খানিকটা ঘুরে এলুম। পায়ের চটি আমরা খুলে ফেলেছিলুম, সবাইকেই জুতো মোজা খুলতে হয়েছে দেখলুম। তা না হলে জলে ভিজে যাচ্ছে। আসলে আমরা নৌকোর উপরে বসি নি। দুধারে দুটো ডিঙি নৌকো কাঠ দিয়ে জোড়া আছে, তার উপরে কাঠের বেঞ্চিতে বসে আমরা দু পায়ে প্যাড্‌ল চালাচ্ছি। প্যাড্‌ল্ চলছে জলের মধ্যে, তাই জলে পায়ের নিচের অংশ ভিজে যাচ্ছে।

এই সিপাহী জলায় আরও কিছু দেখবার আছে। বাসে উঠে রবারের বনের ভিতর দিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে আমরা একটা চিড়িয়াখানায় এসে নামলুম। কয়েক রকমের জন্তু জানোয়ার আছে এখানে, কিন্তু আকর্ষণীয় কিছু নয়। পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে এই সব দেখবার জন্যে অনেকটা সময় নষ্ট হল। তারপরে আবার যাত্রা।

এবারে আমরা সোজা উদয়পুরে যাব। বেলা বারোটার আগে আমাদের মন্দিরে পৌঁছতে হবে। দেরি হলে বোধহয় মায়ের দর্শন হবে না। তাই এই বনপথ ছেড়ে আবার সদর রাস্তায় পৌঁছে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে অগ্রসর হলুম।

স্বাতি বলল: আজ আমরা বড় নিঃশব্দে চলেছি।

বললুম: বলার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

কেন! উদয়পুরের কথা বলতে পার।

উদয়পুরের কথা বলতে গেলেই পীঠস্থানের কথা বলতে হয়। উদয়পুর আমাদের একান্ন পীঠের অন্যতম।

পীঠমালার শ্লোকটিও আমার মনে পড়ে গেল। বললুম:

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা-মাতা।
ভৈরবঃ ত্রিপুরেশশ্চ সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ॥

স্বাতি বলল : কী মানে এই শ্লোকের ?

বললুম : ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ পদ পড়েছিল। দেবীর নাম ত্রিপুরা, আর তাঁর ভৈরব ত্রিপুরেশ সকল অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

স্বাতি বলল : বাবা মার কাছে এই পীঠস্থানের নাম তো আমি শুনি নি !

বললুম : চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ তীর্থের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ।

স্বাতি বলল : দার্জিলিঙে রঞ্জিতবাবুর কাছে শুনেছি। কিন্তু সে পীঠস্থান তো এখন বাঙলা দেশে। সেখানে যাওয়া বোধহয় আর সম্ভব নয়।

বললুম : রঞ্জিতবাবুর কাছে যা শুনেছি, তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

হঠাৎ একটা কিংবদন্তীর কথা মনে পড়তেই বললুম : উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী নাকি চন্দ্রনাথ পাহাড়েই ছিলেন।

কী রকম ?

বলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : শুনেছি, ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ রাজা ধন্যমাণিক্য চন্দ্রনাথ শিবকে নিজের রাজ্যে এনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বহু লোকজন নিয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। শিবকে মাটি থেকে তুলতে খুব চেষ্টা করলেন, হাতি লাগিয়েও শিবলিঙ্গ নড়াতে পারলেন না। তারপর রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে চন্দ্রনাথ এখানেই থাকবেন, তাঁর বদলে ত্রিপুরায় যাবেন ত্রিপুরাসুন্দরী। কিন্তু এক রাত্রিতে যতটা সম্ভব ততটাই যাবেন, রাত্রি প্রভাত হলেই তিনি অচলা হবেন। এই স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা ত্রিপুরাসুন্দরীকে নিয়ে দ্রুত বেগে যাত্রা করলেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হল উদয়পুরে। আর উদয়পুরেই প্রতিষ্ঠা হল দেবীর। ধন্যমাণিক্যই এই মন্দির নির্মাণ করলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে—১৫০১ থেকে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে।

সেই মন্দিরই কি আমরা দেখব ?

বললুম : না। বজ্রাঘাতে সে মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরে রাম-মাণিক্য সেই মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন ১৬৮১ সালে। তারপর এই শতাব্দীর রাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলেও এই মন্দিরের সংস্কার হয়েছে।

স্বাতি বলল : তাহলে পুরনো মন্দিরের আর কিছু অবশিষ্ট নেই বল!

বললুম : ধন্যমাণিক্য সম্বন্ধে আর একটা কথা প্রচলিত আছে।

কী কথা?

তিনি এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে। কিন্তু স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি এই মন্দিরে কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর তৈরি একটি মহাদেবের মন্দিরও আছে। আর আছে কসবায় কমলাসাগর নামে একটি বিরাট দীঘি। কমলাদেবী তাঁর রাণীর নাম।

স্বাতি বলল : উদয়পুরে তো এক সময়ে নরবলি হত।

বললুম : শুধু উদয়পুরে নয়, ভারতের অনেক জায়গায় হত! রেভারেণ্ড জেম্স্ লং লিখেছেন যে কলকাতার কালীঘাটে ও আসামের কামাখ্যাতেও নরবলি হত বলে সন্দেহ করা হয়। কিন্তু ত্রিপুরায় যত নরবলি হয়েছে, তত আর কোথাও হয় নি।

এ সব কত দিনের পুরনো কথা?

প্রাচীন কাল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন তন্ত্রমতে শিব শক্তির উপাসক, তাঁদের আমলেই নরবলির প্রথা চালু হয়েছিল।

কিন্তু বলির জন্যে মানুষ আসত কোথা থেকে?

তার ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের সময়ে শত্রুর যে সব সৈন্য বন্দী হত, তাদের বলি দেওয়া হত। শোনা যায় যে বিজয়মাণিক্য নামে এক রাজা একজন আফগান সেনাপতিকে বলি দিয়েছিলেন।

কী বীভৎস!

[illegible] রাজার ব্যবস্থা [illegible]
রাজ্যের একটি সম্প্রদায়ের উপরে ছিল বলির জন্য মানুষ সংগ্রহের ভার। নীরোগ শূদ্র সন্তান চাই, কিন্তু দীক্ষিত ও বিবাহিত হতে হবে। মুইছিপিরা বাঙলার গ্রাম থেকে নানা প্রলোভনে বিভ্রান্ত করে এই রকমের মানুষ ধরে আনত। ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরার প্রথম রাজা, যিনি এই নরবলি অমানুষিক বলে মনে করলেন। নিজের রাজ্য থেকে তুলে দিলেন এই প্রথা। কিন্তু ধর্ম সংস্কারকে তিনিও সম্পূর্ণ-রূপে জয় করতে পারেন নি বলে শোনা যায়। তাই ময়দায় তৈরি মানুষের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তাই বলি দিয়ে নাকি প্রাচীন প্রথার নিয়ম রক্ষা করা হত।

স্বাতি বলল: সত্যিই বীভৎস।

বললুম: রাজমালায় এই নরবলির কথা আছে।—

পূর্বেতে ত্রিপুরা রাজ্যে নরবলি দিত।
সহস্র সহস্র বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত॥
শ্রীধন্যমাণিক্য মানা তাহাকে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল॥

বেলা বারোটার কিছু আগেই আমরা উদয়পুর শহরে পৌঁছে গেলুম। এই শহরেরও একটা ইতিহাস আছে। পুরাকালে যখন মগ রাজাদের রাজধানী ছিল, তখন এর নাম ছিল রাঙ্গামাটি। ত্রিপুরার রাজা জুঝারু ফা মগদের জয় করে এই শহর অধিকার করেন। জুঝারু ফা বাঙলারও কিছু অংশ জয় করে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন। ত্রিপুরার বিশালগড়ও জয় করেছিলেন তিনি। অনেকে তাই মনে করেন যে জুঝারু ফার পূর্বপুরুষ এই রাজ্য জয় করতে না পেরে ধর্মনগরে জুরি নদীর তীরে বসবাস করেছিলেন। আর জুঝারু ফাই ত্রিপুরার প্রথম রাজা। উদয়পুর নাম হয়েছে উদয়-মাণিক্যের আমলে। আর এখন এই শহরের নাম রাধাকিশোরপুর রাজা বীরেন্দ্রকিশোর তাঁর পিতার নামে এই নাম রেখেছিলেন।

রত্নপুর এই শহরেরই একটা অংশ। এইখানে ছিল চতুর্দশ দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও শিবের মন্দির। এখন এই শহর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার প্রধান শহর।

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির শহর থেকে মাইল দুই দূরে। কল্যাণ সাগর নামে একটি বৃহৎ জলাশয়ের ধারে নাতি-উচ্চ টিলার 'উপরে। এই পথে আমরা আরও কয়েকটি জলাশয় ও মন্দির দেখলুম বাস থেকে। জগন্নাথ দীঘির ধারে জগন্নাথ মন্দির ও বিজয় সাগর দীঘির ধারে মহাদেব মন্দির। অমর সাগর নামে আরও একটি জলাশয় দেখলুম। গোবিন্দমাণিক্যের ভাই জগন্নাথ রায় ১৫২৮ সালে জগন্নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরে বলভদ্র সুভদ্রা ও জগন্নাথের নিত্য পূজা হয়। এই মন্দির সংলগ্ন জগন্নাথ দীঘি উদয়পুরের বৃহত্তম জলাশয়। মহাদেব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন গোবিন্দমাণিক্য নিজে।

পরে তিনি আর একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। শহরের ধার দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে গোমতী বা গুমতি নদী। নদীর দক্ষিণ তীরে ও রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে এই মন্দির ভুবনেশ্বরীর। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক যাঁর ভাল করে পড়া আছে, তিনি এই প্রাচীন মন্দিরটি না দেখে ফিরতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের টুরিস্ট বাস এ সব জায়গায় দাঁড়ায় না। উদয়পুর শহর ছাড়িয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল কল্যাণ সাগরের তীরে বড় বড় কয়েকটি গাছের ছায়ায়। যাত্রীরা হুড়মুড় করে সবাই নেমে পড়লেন। যাঁরা পূজা দিতে এসেছেন তাঁরা ছুটলেন দোকানের দিকে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যে।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে বলল: আমরা তো খেয়ে এসেছি।

বললুম: খেয়ে এলে পুজো দেওয়া যায় না এ তো একটা সংস্কার। দেবতা নিজে তো কোন বিধি নিষেধ আরোপ করেন নি!

স্বাতি বলল : তোমার মতো সংস্কার মুক্ত হতে পারলে ভাবনা ছিল না।

বলে সেও পূজার উপকরণ সংগ্রহের জন্য একটা দোকানে গিয়ে দাঁড়াল। আমি গেলুম কল্যাণ সাগরের ঘাটে।

কয়েকজন যাত্রী ঘাটে স্নান করছেন। এঁরা আমাদের সঙ্গে আসেন নি, এসেছেন অন্য বাসে। আগরতলা থেকে এখানে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। যাঁরা পূজা দিতে আসেন তাঁরা সাধারণ বাসেই চলে আসেন সকালের দিকে, এখানে স্নান করে পূজা দেন মায়ের। বলির মানত থাকলে সে ব্যবস্থাও করেন। তারপর ধীরে সুস্থে সব কাজ শেষ করে আগরতলায় ফিরে যান।

টিলার উপরে উঠবার জন্য সিঁড়ি আছে অনেকগুলো। প্রশস্ত সিঁড়ি। বহু যাত্রী একসঙ্গে ওঠা-নামা করতে পারেন। স্বাতি উপরে উঠছে দেখে আমিও তাকে অনুসরণ করে মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলুম।

মন্দির তখন বন্ধ। যাত্রীরা অপেক্ষা করছেন পাশের দরজায়। আর সামনের দরজার কাছে যাবার উপায় নেই, দড়ির বেড়া দিয়ে যাত্রীর পথ রোধ করা আছে। খানিকটা এগিয়ে গিয়েই তার কারণ দেখতে পেলুম। বলি হবে দেবীর চোখের সামনে। অসংখ্য ছাগকে স্নান করিয়ে উৎসর্গ করা হচ্ছে, খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছেন একজন। কিছুক্ষণ পরেই বলি শুরু হল, একটার পর একটা। মুণ্ডটা রেখে ধড়টা সরিয়ে দিতে লাগল একজন। আর যাদের বলি, তারা টেনে নিয়ে যেতে লাগল ধড়টা। নিরীহ ছাগলের আর্তনাদে চারিদিক পূর্ণ হয়ে গেল। আমি পালিয়ে গেলুম সেখান থেকে।

এক জায়গায় এই পীঠস্থানের ভৈরব দেখলুম। কোন যাত্রী নেই এখানে। কেউ এ দিকে আসছেন না। ত্রিপুরেশ শিব এখানে উপেক্ষিত। কলকাতার কালীঘাটেও এই রকম দেখেছি। পীঠের ভৈরব নকুলেশ্বর দর্শনে যান না অনেকেই। কালীর পূজা দিয়েই

সবাই ফিরে যান। কিন্তু বৈদ্যনাথে এই রকম নয়। বৈদ্যনাথ হৃদয় পীঠের ভৈরব, কিন্তু দেবী জয়দুর্গার চেয়ে তাঁর মর্যাদাই যেন বেশি। চন্দ্রনাথেও তাই। সেখানে দেবীর বাহু পীঠ। সতীর দক্ষিণ বাহু পড়েছিল। দেবীর নাম ভবানী, আর ভৈরব চন্দ্রশেখর। আমরা শুধু চন্দ্রনাথ শিবের নামই জানি।

শিবচরিতের মতে ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ পদ পড়েছিল। দেবীর নাম ত্রিপুরা ঠিকই, কিন্তু ভৈরবের নাম নল, ত্রিপুরেশ নয়। পীঠস্থান নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। মহাপীঠ উপপীঠের সংখ্যা অসংখ্য। সব নাম পাওয়া গেলেও তাদের সঠিক অবস্থান জানার উপায় নেই। প্রধান পীঠস্থানগুলিই আমরা মনে রাখতে পেরেছি।

বলি শেষ হবার পরেই যাত্রীরা প্রবেশ করে দেবীর দর্শন পেলেন। আমি কালীকে প্রণাম করলুম বাহির থেকে। চতুর্ভুজা ভয়ঙ্করী কালী শিবের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রমাণ মানুষের মতো মূর্তি। যাঁরা মন্দিরের ভিতরে গিয়েছিলেন, তাঁরা আরও একটি ছোট কালীমূর্তি দেখলেন। সেটি দু ফুট লম্বা একই রকমের মূর্তি। তাঁর নাম শুনলুম ছোটি মা। অনেকে মনে করেন, এই ছোট মূর্তিটিই দেবার আদি মূর্তি। মায়ের নামে এই স্থানের নাম হয়েছে মাতাবাড়ি।

মন্দির থেকে প্রসন্ন মনে বেরিয়ে এসে স্বাতি আমাকে পূজার নির্মাল্য চরণামৃত ও প্রসাদ দিল। বলল: এসো, নিচে নামবার আগে মন্দিরটা ভাল করে দেখে নিই।

বাঙলার নিজস্ব শৈলীর চারচালা ঘরের মতো ছোট মন্দির, তার উপরের শিখরটি কোন পরিচিত মন্দিরের মতো নয়। পঞ্চরত্ন নবরত্ন নয়, একটি শিখরের উপরে যেন আর একটি শিখর, লম্বাটে গম্বুজের উপরে আমলক বা কলস। সামনে একটি মণ্ডপ। মন্দিরে কোন কারুকার্য নেই বলাই উচিত।

যাত্রীরা নেমে যাচ্ছিলেন। বুঝতে পারলুম যে আমাদের সময়

ফুরিয়ে গেছে। আর দেরি করলে টুরিস্ট বাস হয়তো আমাদের ফেলে রেখেই চলে যাবে। তাই আমরাও তাড়াতাড়ি নিচে নেমে বাসে উঠে বসলুম।

বাস ছাড়ল।

এইখানে দেবতা মুড়া নামে আর একটি জায়গার নাম শুনলুম। মুড়া মানে নাকি পাহাড়। দেবতার পাহাড়। উদয়পুর থেকে বারো কিলোমিটার দূরে গভীর অরণ্যের মধ্যে এই দেবতা মুড়া। অনতি-দূরে প্রবাহিত হয়েছে গোমতী নদী। এখানকার পাহাড়ের গায়েও অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ আছে অথচ এ নিয়ে কোন অনুসন্ধান হয় নি জেনে বিস্মিত হলুম। বুঝতে পারলুম যে এ ভাবে উদয়পুর দেখার কোন মূল্য নেই। এখানে থেকে এই অঞ্চলটাকে দেখতে হয় ভাল করে। তবেই এখানে আসার সার্থকতা আছে।

একটা হোটেলে দুপুরের আহার সেরে আমরা আজকের শেষ দ্রষ্টব্য নীরমহলের দিকে অগ্রসর হলুম। হোটেলের বাথরুমে মুখ হাত ধুয়ে আমরা পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়েছি। হেমন্তের শেষে এখন আর গরম নেই, তাই দুপুরের রোদে কষ্ট হচ্ছে না। সূর্যাস্তের অনেক আগেই আমরা রুদ্র সাগরের তীরে পৌঁছে গেলুম। বিশাল আকারের লেক, তার মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপের উপরে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। এই প্রাসাদের নাম নীরমহল।

আমাদের গাইডও বলেছিল যে প্রাসাদের এই নাম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ কথার সমর্থন আমি পাই নি। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় যে একাধিকবার এসেছিলেন, তা আমরা জানি। তাঁর বন্ধুতা ছিল এই মহারাজার পিতামহ রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে। তাঁর রাজত্বকাল ১৩০৭ থেকে ১৩১৯ সাল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম এসেছিলেন আগরতলায় এবং কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মণের অতিথি হয়েছিলেন। রাজা বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসিক ছিলেন

এবং শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিলেন বলে শুনেছি। বাঙলার নানা স্থানে তাঁর দান আছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে আগরতলায় এসে কুঞ্জবন প্রাসাদেও ছিলেন বলে শুনেছি। এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন রাধাকিশোর মাণিক্যের পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য। ১৯০৯ থেকে ১৯২৩ তাঁর রাজত্বকাল। তারপরে তাঁর পুত্র বীর বিক্রমকিশোর রাজা হয়ে এই নীরমহল নির্মাণ করেন উদয়পুরের জগমন্দির ও জগনিবাসের অনুকরণে। কিন্তু আকারে ও সৌন্দর্যে যে এই নীরমহল নিকৃষ্ট তাও শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাজেই এই নাম তিনি দিয়ে থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বীর বিক্রমকিশোর নিজেও কবি ছিলেন। তিনি অনেক গান রচনা করেন ও জয়াবতী নামে একখানি নাটকও লিখেছিলেন। আগরতলার মঞ্চে এই নাটকের অভিনয় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঠিক আগের জন্মদিনে তিনি একটি দরবার ডেকে রবীন্দ্রনাথকে ভারত ভাস্বর উপাধি দিয়েছিলেন। ছ বছর পর মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমাদের গাইড এতক্ষণ কোথায় ছিল তা দেখতে পাই নি; হঠাৎ দেখলুম যে সে একটা বিরাট নৌকো ডেকে এনেছে যাত্রীদের নীরমহল দেখাতে নিয়ে যাবার জন্যে। যাত্রীদের অনেকেই সেই নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। কিন্তু স্বাতি এগিয়ে গেল না। আকাশের রোদ তখনও তীব্র। আর লেকে অনেক দূরে সাদা রেখার মতো দেখা যাচ্ছে নীরমহল। রোদ মাথায় করে এত দূরে যেতে বোধহয় তার আপত্তি ছিল। তাই দেখে আমি একটি ছায়াশীতল স্থানে বসে পড়লুম।

স্বাতি কাছে এসে বলল: তুমি যাবে না?

বললুম: উদয়পুরের জগমন্দির দেখবার পরে নীরমহল কি ভাল লাগবে! যাত্রীরা ফিরে আসার পরে শুনেছিলুম যে সত্যিই

তাই। নীরমহলের এখন ভগ্নদশা। ভিতরের অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমান সরকার কিছু মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছেন। তার জন্যে কিছু কাঠের দরজা তৈরি হয়েছে। সেই দরজার চৌকাঠে বসেই আমরা বিশ্রাম নিয়েছি।

কাছেই একটি চায়ের চালায় আমরা চা খেয়ে নিলুম সূর্যাস্তের পরে। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লবিস নামের একটা তাসের খেলা দেখলুম চারজনের। ভারি মজার খেলা। দেখতে ভাল লাগছিল।

রুদ্রসাগর বা রুদিজলার তীর থেকে আমরা মেলাঘর নামে একটি লোকালয়ে এসে থামলুম। অনেকে চা খেলেন এখানে। আমাদের গাইডও এখানে নেমে গেল। অনুরোধ করে গেল যাত্রীরা যেন ফেরার পথটুকু গান বাজনা করে আনন্দময় করে তোলেন। তার জন্যে যাত্রীদের মধ্য থেকেই নিজের সমবয়সী একজনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে গেল। ভাল গান গাইল একটি মেয়ে। সে একাই সারা পথ জমিয়ে রাখল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পরে আমরা উদয়পুরে পৌঁছলুম। যেখান থেকে যাত্রা করেছিলুম সেখানে এসে লোকে লোকারণ্য দেখলুম। শুনলুম যে লোকনৃত্যের সেই চুরাশিজন শিল্পী এসে পৌঁছে গেছেন। কাল সকালের প্লেনে তাঁরাই দিল্লীর পথে কলকাতা যাত্রা করছেন।

বাহিরের রাস্তায় এসে একটা রিক্সা নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলুম।

## ৩৪

সকালের রোদ প্রখর হবার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। শহরের যা কিছু দ্রষ্টব্য আছে, সবই আজ আমাদের দেখে নিতে হবে, আগামী কালের জন্য কিছু রাখলে চলবে না। আগামী কাল আমরা ফিরব। ফিরব আমাদের পুরনো কলকাতায়।

হোটেলের সামনের গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসেই আমরা কয়েকখানা রিক্সা পেয়ে গেলুম। শহর দেখতে চাই শুনে তারা ঘণ্টার হিসেবে পয়সা দাবী করল। স্বাতি বলল: এতে আমাদেরও সুবিধে। ইচ্ছেমতো ঘুরতে পারব। তাড়া দেবার কেউ থাকবে না।

বললুম: রিক্সায় উঠবার আগে সামনের ঐ বইয়ের দোকানগুলো একবার দেখে নিলে মন্দ হত না—ত্রিপুরার কোন ম্যাপ গাইড বই বা ইতিহাসের বই পেলে বেশ সুবিধা হত।

রিক্সা দাঁড় করিয়ে আমরা রাস্তার ওধারে গিয়ে অনেক খুঁজলুম এক কথায় উত্তর: এ সব বই আমরা রাখি না। এখানে আপনারা স্কুলের বই পাবেন।

চল, সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

বলে স্বাতি রিক্সায় উঠে বসল। আমি তার পাশে বসে বললুম: তাহলে এখন আমরা কোথায় যাব?

রিক্সাওয়ালাই আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিল। বলল: চলুন, আগে আপনাদের বাঙলা দেশের বর্ডার দেখিয়ে আনি।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল: সে কতদূর এখান থেকে?

রিক্সাওয়ালা বলল: বেশি দূরে তো নয়, পশ্চিমে শহর যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানেই বর্ডার, আখাউরা রোডের উপরে।

দার্জিলিঙের রঞ্জিতবাবুর কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন যে দেশ বিভাগের আগে আখাউরা জংশনে নেমে মোটরে

চেপে তাঁরা আগরতলায় এসেছিলেন। সে কতদূর পথ আমরা তা জানতে চাই নি। এইবারে রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলুম: আখাউরা কত দূরে?

রিক্সাওয়ালা বলল: আগরতলা থেকে ছ মাইল, বর্ডার থেকে আরও কম। খানিকটা হেঁটে বাঙলা দেশের বর্ডারে গিয়ে রিক্সা করে আখাউরা যাওয়া যায়।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললুম: সত্যি!

রিক্সাওয়ালা বলল: মেহনৎ করে আমরা পয়সা নিই বাবু, আমরা মিথ্যে কথা বলব কেন! আর মিথ্যে কথা বলবার দরকারই বা কী!

সে তো ঠিক কথা!

রিক্সাওয়ালা বলল: এ দেশে তো কোন দিন রেল ছিল না। কিন্তু রেলের অভাবে কষ্টও ছিল না। লোকে আখাউরায় ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে, গরুর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়িতে আসত আগরতলা। তারপর মোটর বাস এল। এল এই রিক্সা গাড়ি। আর দক্ষিণে কুমিল্লায় ট্রেন থেকে নেমে লোকে উদয়পুরে চলে আসত।

বললুম: তাই নাকি!

তবে আর বলছি কী!

বলেই আমাকে প্রশ্ন করে বসল: আপনারা নিশ্চয়ই প্লেনে এসেছেন!

বললুম: না, ধর্মনগর থেকে আমরা বাসে এসেছি।

রিক্সাওয়ালা বলল: বুঝেছি। ধর্মনগর থেকে আপনারা ঊনকোটি আর জাম্পুই পাহাড় দেখে এলেন!

বললুম: না তো!

তবে কৈলাশহর কমলপুর দেখে এলেন বুঝি!

তাও না।

এইবারে সে পিছন ফিরে আমাদের দিকে তাকাল। ভাবখানা

এই যে তাহলে এত কষ্ট করে ট্রেনে আসবার কী দরকার ছিল! কিন্তু আমরা কোন কৈফিয়ৎ দিলুম না দেখে সে নিজেই বলল: রাতে ধর্মনগরে ছিলেন?

বললুম: হ্যাঁ।

ইস্!

কেন বল তো?

ট্রেন থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ঊনকোটি দেখে কৈলাশহরে গিয়ে রাত কাটাতে পারতেন। তারপর সকালে আগরতলার বাস ধরে কমলপুর হয়ে এখানে চলে আসতেন। কমলপুরের পরে তো সেই একই পথ কুমারঘাট, মনুঘাট—

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আর আমি বললুম: খুব ভুল হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আগে দেখা হলে ঠিক এই ভাবেই আসতুম।

রিক্সাওয়ালা খুশী হয়ে বলল: কৈলাশহরও খুব বড় শহর। আর কমলপুরও। এ সব জায়গায় প্লেনও নামে, খোয়াইতেও।

তবে তো খুবই বড় শহর!

রিক্সাওয়ালা বুঝতে পেরেছে যে আমরা আগরতলায় প্রথম এসেছি, আর তার কথা শুনছি মনোযোগ দিয়ে। তাই বলল: এখানে একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন।

কী কথা?

চৌমুনি, মানে চৌমুহনি। চার রাস্তা মানে চৌমুনি। এই চৌমুনির নামগুলো মনে রাখলে শহর চিনতে আপনাদের সময় লাগবে না।

তাই নাকি!

সে বলল: কামান চৌমুনি, সূর্য চৌমুনি, পোস্ট অফিস চৌমুনি, হসপিটাল চৌমুনি, প্যারাডাইস চৌমুনি, ফায়ার ব্রিগেড চৌমুনি, মঠ চৌমুনি, কর্নেল চৌমুনি, আস্তাবল চৌমুনি—

সর্বনাশ ! এত চৌমুহনি আছে !

এ ছাড়া বটতলা মোটর স্ট্যাণ্ড আর গোলবাজার মনে রাখবেন।

তারপর ?

তারপরে আমাদের রিক্সায় উঠে বলবেন, চল এইখানে।

হেসে বললুম : আগরতলায় আর কোন জায়গা নেই ?

থাকবে না কেন ! সে সব জায়গার নাম বলতে হবে। যেমন প্যালেস, এম. বি. বি. কলেজ, কুঞ্জবন—

স্বাতি বলল : এই সব বড় ঘর-বাড়িগুলো চিনিয়ে দাও না।

রিক্সাওয়ালা খুবই লজ্জিত হয়ে বলল : একেবারে ভুল হয়ে গেছে।

তারপরে বলে যেতে লাগল : এইটে সেক্রেটারিয়েট, এ সব মন্ত্রীদের বাড়ি ; এটা হাসপাতাল—

এক সময়ে আমরা আখাউরা রোডের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলুম। দূর থেকেই বুঝতে পারলুম যে ভারত ও বাঙলা দেশের সীমানা দেখা যাচ্ছে। সীমানা মানে রাজপথের উপরে একটা গেট, ভারতের পতাকা উড়ছে সেখানে।

এই গেটের কাছে পৌঁছে আমরা রিক্সা থেকে নেমে পড়লুম। রক্ষীরা পথের ধারের একটা দোকানের সামনে বসে গল্প করছিল। তাদের সঙ্গে ভাব করে আমরা বাঙলা দেশের মাটিতে পা দিয়ে ওধারের গেটও দেখে এলুম। সত্যিই কতগুলো রিক্সা দাঁড়িয়ে ছিল পথের ধারে। কিন্তু সে পথ এ ধারের মতো ভাল নয়, মেরামতের অভাবে খারাপ হয়ে গেছে অনেক।

দু দেশেই চাষের জমি, দূরে দূরে খুঁটি পুঁতে দু দেশের সীমানা ঠিক করা আছে। আর আমাদের বাঁ পাশের গ্রামটা বাঙলা দেশের শুনে আশ্চর্য হলুম। এই সব মাঠঘাট পেরিয়ে দু দেশের লোক যথেচ্ছ ভাবে যাতায়াত করতে পারে। বিধিনিষেধ শুধু যানবাহন ও আমাদের মতো যাত্রীর জন্যে বলেই মনে হল।

এখান থেকে আমরা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ দেখতে অগ্রসর হলুম। পুরনো পথ ধরে অনেকটা এগোবার পরে আমরা বাস স্ট্যাণ্ডের সেই নতুন বাড়ির সামনে দিয়ে এগিয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন দেখতে পেলুম। দোতলা বাড়ি, আগরতলার সমস্ত সাংস্কৃতিক উৎসব এই বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। রিক্সাওয়ালা বলল : এই জমিটা ছিল শচিন কর্তার।

শচিন কর্তা!

শচিন কর্তার নাম শোনেন নি! গান শোনেন নি তাঁর?

হেসে বললুম : শচিন দেববর্মনের নাম কে শোনে নি! তিনি আমাদের কত প্রিয়!

খুশী হয়ে রিক্সাওয়ালা বলল : জানেন, শচিন কর্তা এদেশের রাজা হতে পারত।

কেমন করে?

তাঁরই তো হক ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ সিংহাসনে বসতে রাজি হয় নি বলেই তো শচিন কর্তা এদেশ ছেড়ে চলে গেল।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললুম : তিনি তো গানের রাজা ছিলেন! দেশের রাজা হলে কি অমন গান গাইতে পারতেন!

রিক্সাওয়ালা বলল : ঠিক বলেছেন।

আর আমি স্বাতিকে বললুম : এর কথা ইতিহাস মানবে কিনা জানি না। তবে এ রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় দুটি পদ আছে—একটি যুবরাজের ও আর একটি বড় ঠাকুরের। রাজপরিবারের অন্য পুরুষেরা হলেন ঠাকুর বা কর্তা। অনেক সময়েই দেখা গেছে রাজার ছেলে যুবরাজ না হয়ে হয়েছেন বড় ঠাকুর। আর যুবরাজ হয়েছেন রাজার ভাই। সাধারণত উল্টোটাই হত। রাজার ছেলে যুবরাজ ও রাজা হতেন, ভাইরা থাকতেন বড় ঠাকুর। রাজ্যের কতগুলো বিদ্রোহের সময়ে এই রকম কিছু ঘটে থাকলে আশ্চর্য হব না।

এইবারে আমরা উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের বিশাল গেটের সামনে এসে নামলুম। ভিতরে প্রবেশ নিষেধ, বাইরে থেকে ছবি তোলাও নিষেধ। সরকারী কোন বিজ্ঞপ্তি নেই। প্রহরীর আদেশ মেনে আমরা গেটের বাহির থেকেই প্রাসাদটি দেখলুম।

গেট থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত মোগল শৈলীর উদ্যান। প্রসাদের মাঝখানের অংশ তিনতলা, তার উপরে গম্বুজ। গম্বুজটিও দোতলা বলে মনে হচ্ছে। দু ধারে আরও দুটি গম্বুজ দেখতে পাচ্ছি। তার পরেও দোতলা বাড়ি ডান দিকে আরও অনেক দূর বিস্তৃত দেখছি। বাঁ দিকেও ঘর বাড়ি আছে, কিন্তু দূর থেকে সেগুলি বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে। সব মিলে এই ধবধবে সাদা বাড়িটি খুবই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে।

১৮৯৭ সালের মারাত্মক ভূমিকম্পে পুরাতন রাজপ্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে যাবার পরে রাধাকিশোর মাণিক্য এই প্রাসাদটি নির্মাণ করান। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য কুঞ্জবনে নির্মাণ করেছিলেন আর একটি প্রাসাদ। রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জবন প্রাসাদে কিছু দিন বাস করেছিলেন বলে শুনেছি।

এখান থেকে আমরা পাশের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দেখে রাজবাড়ির পাশের রাস্তায় কালীবাড়িতে এলুম। দুটো বড় বড় দীঘি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। পূর্বে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন লক্ষ্মীনারায়ণ দীঘি, আর রাজবাড়ির পশ্চিম ধারে জগন্নাথ দীঘি। এরই তীরে জগন্নাথ মন্দিরের সূক্ষ্মাগ্র চূড়াও দেখা যাচ্ছে। কালীবাড়ির পাশেই আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম।

এই পথেই এগিয়ে গিয়ে আমরা আস্তাবল চৌমুহনি পৌঁছলুম। রাজবাড়ির উত্তর দিকের গেট এই ধারে, রাজধানী প্রবেশের গেটও এটি। দক্ষিণ দিকের বড় গেট থেকে শহরের প্রধান রাজপথ আমরা দেখতে পেয়েছিলুম। মনে হল, এই পথের শেষের দিকেই আমরা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের অফিস দেখেছিলুম। আস্তাবল চৌমুহনিতেই

নতুন আকাশবাণী ভবন নির্মিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসও এইখানে। এইখানে রাজার পুরনো আস্তাবলের মাঠ ছিল বলেই বোধহয় চৌমুহনির এই নাম হয়েছে।

স্বাতি রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল : এবারে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ?

সে বলল : কোথায় যাবেন বলুন।

আমি বললুম : চল না, এখানকার কলেজ এলাকাটা দেখে আসি।

তবে এ দিকে এলাম কেন !

বলে রিক্সাওয়ালা তার রিক্সা ঘুরিয়ে নিল। শহরের উত্তরে নয়। শহর থেকে মাইল খানেকের কিছু বেশি পুর্বে একটা টিলার উপরে কলেজ, নাম মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ। টিলায় ওঠবার পথে পৌঁছে রিক্সা থেকে আমাদের নামতে হল। সমতল ভূমিতে পৌঁছে আবার উঠে বসলুম রিক্সায়। একটার পর একটা সুন্দর বাড়ি, পরিচ্ছন্ন পথঘাট, গাছের ছায়ায় শীতল হয়েছে নানা জায়গা, নিচে লেক। কলেজ তৈরির জন্যে এই সুন্দর জায়গাটি বেছে নিয়েছিলেন রাজা বীর বিক্রম মাণিক্য, কিন্তু কলেজ তৈরি করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পরে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা তাঁর স্বামীর নামে এই সব গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছেন। সত্যিই, কলেজের জন্য এটি উপযুক্ত স্থান। এখানে যদি কোন দিন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে, তাহলে পুর্ব ভারতে শিক্ষার আরও প্রসার হবে।

টিলা থেকে নিচে নামবার পথে দেখলুম যে শহর থেকে এখানে বাস আসছে। শিক্ষক ও ছাত্রদের যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আমাদের মাথার উপরে তখন মধ্যাহ্নের সুর্য অগ্নি বর্ষণ করছে। পেটের ক্ষুধাও সেই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমরা তাই আর কোথাও না গিয়ে হোটেলে ফিরে এলুম।

পয়সা পেয়ে রিক্সাওয়ালা খুশী হয়েছিল, বলল: বিকেলে আমি এখানেই অপেক্ষা করব।

কিন্তু আমরা আর কী দেখব তা জানি নে।

বিকেলের চা খেয়ে আমরা হোটেলের ম্যানেজারকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি সব শুনে বললেন: একবার কর্নেল বাড়িটা দেখে আসতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারে ত্রিপুরায় এসে এই বাড়িতে ছিলেন।

স্বাতি খুশী হয়ে বলল: ঠিক বলেছেন।

বাহিরে এসে সকালের রিক্সাওয়ালাকেই পেলুম। সে বলল: সকালেই দেখাতে পারতাম। কর্নেল চৌমুনির কাছেই তো কর্নেল বাড়ি। কিন্তু সেখানে তো কিছু দেখবার নেই!

আমি বললুম: বাড়িটাই দেখব। তারপরে একটা বড় বইএর দোকান দেখে ফিরব।

স্বাতি বলল: ইচ্ছে হলে ত্রিপুরার জিনিস কিছু কিনব।

কর্নেল চৌমুহনি থেকে একটা অনাদৃত পথে আমরা কর্নেল বাড়িতে এলুম। বাঁ দিকের একটি দোতলা বাড়ির পাশে একটি ছোট একতলা বাড়ি। এই বাড়িটিই ছিল কর্নেল মহিমচন্দ্র দেব বর্মনের। মহিম ঠাকুর নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। নিজের কাজে যেমন দক্ষ ছিলেন, তেমনি লেখারও হাত ছিল তাঁর। তাই বন্ধুতা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র বোস ও দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে। কিন্তু এখন এই বাড়ির সামনের ঘরে একটা বেসরকারী দপ্তর হয়েছে এবং যে ঘরে রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন সে ঘরে এখন খাটিয়া পেতে জন কয়েক অবাঙালী বাস করছে নোংরা পরিবেশে। একজন বর্ষীয়সী মহিলা যাচ্ছিলেন এই বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণ দিয়ে। তাঁর কাছেই সব জানলুম। তারপর ভিতরে ঢুকে সব দেখে এলুম। তিনি আর একটি খবর দিলেন। ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে

একখানা বাঙলা বই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা পাওয়া যায় না। স্বাতি বলল, আমরা কলকাতার লাইব্রেরিতে খুঁজে পড়ব।

ফেরার পথে একটা বড় বইএর দোকানে আমরা দুখানা ইংরেজী বই পেলুম—Tripura Through The Ages আর A Look Into Tripura. প্রথমটা ইতিহাসের বই, আর দ্বিতীয়টা একখানা গাইড বই। গাইড বইটা লেখক সই করে একজনকে উপহার দিয়েছিলেন, অন্য কোন কপি না পেয়ে আমরা সেখানাই কিনে নিলুম। ঠিক করলুম যে আজ রাতেই আমরা বই দুখানা পড়ে ফেলব।

রিক্সাওয়ালা এবারে কামান চৌমুহনিতে এসে একটি কামান দেখাল। এটি বাঙলার নবাব হুসেন শাহর কামান। কোন যুদ্ধে জয়লাভ করে ত্রিপুরার এক রাজা এটি নিজের রাজ্যে এনেছিলেন। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এই চৌমুহনি এবং এরই চারিধারে বড় বড় দোকান-পাট। সরকারী সেল্‌স্ এম্পোরিয়ামও এইখানে। প্রিয়দর্শিনী নামে একটি কুটীর শিল্পের দোকানে আমরা ঢুকলুম। তারপরে আরও দু-একটা দোকানে। এখানকার কাঠ বেত ও বাঁশের শৌখিন জিনিসের তুলনা নেই। তাঁতবস্ত্রও ভাল। রিহা নামে মেয়েদের গায়ের চাদর সুন্দর। এক সময়ে নাকি বেনারসের কিংখাবের চেয়েও ভাল রিহা এখানে তৈরি হত। টুকিটাকি কিছু জিনিস স্বাতি উপহারের জন্য কিনে নিল। তারপর আমরা হোটেলেই ফিরে এলুম।

যে রাজপথের উপরে হোটেল থেকে, তার নাম এইচ. জি. বসাক রোড। এই রাস্তা থেকে একটা ছোট গলি পেরিয়ে আমাদের মীনাক্ষী হোটেল। আরও অনেক হোটেল আছে এই শহরে। কিন্তু সে সবের খোঁজ নেবার প্রয়োজন আমাদের হল না। আমাদের হোটেলে খাবার আসে ওকে থেকে, শুধু চা আর ব্রেকফাস্ট তৈরি হয় এখানে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার পথেই রান্নাঘর। চা তৈরি হচ্ছে দেখে দু পেয়ালা চায়ের হুকুম দিয়ে আমরা নিজেদের ঘরে এলুম।

বাহিরে তখন অন্ধকার নেমেছে। বাতি জ্বলে উঠেছে চারি দিকে। আমরাও ঘরে বাতি জ্বেলে বই দুখানা দেখে নিলুম।

একটা নতুন কথা পড়ে মনটা খারপ হয়ে গেল। এই শহর থেকে ছ কিলোমিটার দূরে ছিল পুরনো রাজধানী। এই পুরনো আগরতলায় আছে ভাঙা রাজবাড়ি আর চতুর্দশ দেবতার মন্দির। মন্দিরে দেবদেবীর সম্পূর্ণ মূর্তি নেই, আছে শুধু মুণ্ড। দেবতারা হলেন হরি হর উমা মা বাণী কুমার গণপতি বিধু কা অবধি গঙ্গা সেখি কাম হিমাদ্রি। সবগুলি আমাদের পরিচিত বৈদিক দেবতা নয়, আদিবাসীদেরও কিছু দেবতা আছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কৃষ্ণ মাণিক্য। শোনা যায় যে চতুর্দশ দেবতার আদি মন্দির ছিল প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে। মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ত্রিপুরার রাজা ত্রিলোচন নাকি চতুর্দশ দেবতার পূজা প্রথম করেছিলেন। রাজমালায় এই কথা আছে।

আদিবাসী পুরোহিতরা এই মন্দিরে পূজা করেন, কিন্তু চণ্ডীপাঠ করেন একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ। আর একটি মজার কথা এই যে হরি হর ও উমার নিত্য পূজা হয় এবং অন্য এগারজন দেবতা থাকেন একটি কাঠের বাক্সে। এই মূর্তিগুলি বার করে পূজা করা হয় শ্রাবণ মাসে ধরতি পূজার সময়ে। এক সময়ে বোধহয় নরবলি হত, এখন মাটির মানুষ তৈরি করে দেবতাদের সামনে বলি দেওয়া হয়।

স্বাতি এই মন্দিরের কথা শুনে বলল : দূর তো মাইল পাঁচেকের মতো, কাল সকালে উঠে একবার দেখে আসা যায় না!

বললুম : ট্যাক্সি থাকলে সাহস পেতুম, রিক্সায় কত সময় লাগবে জানি না।

স্বাতি বলল : আগরতলার পথে তো ট্যাক্সি দেখি নি।

বললুম : মোটর স্ট্যাণ্ডে দেখেছি, কিন্তু চেহারা দেখে মনে হয়েছিল যে সে সব ট্যাক্সি মাল বইবার জন্যে

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : এখন মনে হচ্ছে যে সমস্ত খবর না নিয়ে অল্প দিনের জন্যে কোন নতুন জায়গায় আসা উচিত নয়। হাতে প্রচুর সময় থাকলে আপসোস করতে হত না।

বললুম : কিংবা একখানা গাড়ি থাকলে অল্প সময়েই সব কিছু দেখা যেত। এ দুটোর একটাও যখন সম্ভব নয় তখন 'সাধারণ যাত্রীদের ভরসা সুলিখিত টুরিস্ট লিটারেচার বা ভ্রমণের বিশ্বস্ত বই।

পরদিন বিদায় দেবার আগে আমাদের ম্যানেজার বলেছিলেন : আবার আসবেন, আর বেশি সময় হাতে নিয়ে আসবেন। শুনতে পাচ্ছি, নানা জায়গায় সরকারী টুরিস্ট লজ তৈরি হচ্ছে—আগরতলা উনকোটি নীরমহল ডুম্বুর ও দেবতামুড়ায়।

ধর্মনগরে বোধহয় কিছু হবে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়েছেন যে অদূর ভবিষ্যতে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হবে। আমরা সেই দিনের আশায় থাকব।

# ১৫

আজ দুপুর বারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে আমাদের প্লেন ছাড়বে। সকাল এগারটায় পৌঁছতে হবে সিটি অফিসে, আর এয়ারপোর্টে পৌঁছবার সময় দুপুর বারোটা। সকাল বেলায় হোটেলের ম্যানেজার আমাদের বললেন : স্নান করে কিছু খেয়ে যাবেন।

স্বাতি বলল : প্লেনে কি খেতে দেবে না?

ম্যানেজার বললেন : সে তো টিফিনের মতো খাবার, আর মাঝে মাঝেই প্লেনের দেরি হয়।

আমি বললুম : অত সকালে তো আপনাদের রান্না হয় না।

তা ঠিক। কিন্তু আপনারা না খেয়ে যাবেন, সেই বা কেমন করে হয়!

ভদ্রলোক সকাল থেকে ছুটোছুটি করে বেলা দশটায় আমাদের খেতে দিলেন --ভাত ডাল আর মাছ ভাজা। দোকান থেকে দই আর ক্ষীরপুলি নামের মিষ্টি আনিয়েছেন। খুব তৃপ্তিতে সেই খাবার খেলুম।

বিল মেটাবার সময় জিজ্ঞাসা করলুম : আজকের খাবারের দাম ধরেছেন তো!

ভদ্রলোক তাঁর দু হাত কচলে বললেন : ছি ছি, কী বলেন আপনি! ও তো হোটেলের খাবার নয়, আমি আপনাদের খাইয়েছি।

স্বাতির দিকে তাকাতেই সে হেসে বলল : উনি তোমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন।

বিলের উপরে চোখ বুলিয়েই আমি একটা ভুল দেখতে পেলুম। বিলের মোট টাকা থেকে দশ টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই দেখে আমি বললুম : আমরা তো কোন অ্যাড্ভান্স দিই নি!

ভদ্রলোক এবারে সাহসের সঙ্গে বললেন ঃ ওটা মালিকের তরফ থেকে।

কেন

তা তিনিই জানেন।

বলে ভদ্রলোক আমাদের রিক্সায় তুলে দিলেন। আর হাত জোড় করে বললেন ঃ আবার আসবেন, আর বেশি সময় হাতে নিয়ে আসবেন।

তার পরের কথা আমি আগেই বলেছি।

এগারোটার আগেই আমরা এয়ার লাইন্সের অফিসে পৌঁছে গেলুম। অফিস ঘরের পাশেই ওয়েটিং রুম। সেই ঘরে খানিকক্ষণ অপেক্ষার পরেই দেখলুম একখানা বাস যাত্রার উদ্যোগ করছে, যাত্রীরা উঠে পড়ছেন। আমরাও মালপত্র তুলে দিয়ে উঠে পড়লুম।

এখান থেকে দুখানা বাস এয়ারপোর্টে যায়। যাত্রী ভরে গেলেই প্রথম বাসটা ছাড়ে, আর দ্বিতীয় বাস ছাড়ে নির্দিষ্ট সময়ের পরে। আমরা প্রথম বাসেই যাত্রা করলুম।

কুঞ্জবনের পথে এয়ারপোর্টে যেতে হয়। দশ কিলোমিটার পথ। কুঞ্জবন প্যালেসের সামনে দিয়ে আমরা গেলুম। এই প্রাসাদ এখন ত্রিপুরার রাজভবন। পথের ধারে সার্কিট হাউসও দেখতে পেলুম। এখান থেকে শহরে যাতায়াত এক রকম অসম্ভব। এই সব পেরিয়ে আমরা এয়ারপোর্টে এলুম।

সামনের অংশটা নতুন তৈরি হয়েছে বলে মনে হল, কিন্তু সিকিউরিটি চেকিংএর পরে যেখানে অপেক্ষা করতে হল তা পুরনো আমলের। আসবাবপত্রও বেশ পুরনো। কিন্তু বেশিক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হল না। সময়মতো প্লেনে ওঠবার নির্দেশ পাওয়া গেল।

বোয়িং প্লেন। শতাধিক যাত্রী বসতে পারে। কিন্তু আজ অত যাত্রী নেই। অনেক জায়গা খালি রইল।

কুঞ্জবন প্যালেসের সামনে দিয়ে আসবার সময়ে স্বাতি বলেছিল : কবির আমলে তো যাতায়াতের জন্যে প্লেন ছিল না, কত কষ্ট করে কবি এখানে আসতেন!

সত্যিই তাই। কত কষ্ট করে কবি বিশ্ব-ভ্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তার জন্যে কোথাও কোন ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি।

এইবারে প্লেনে পাশাপাশি বসে স্বাতি বলল : রাজর্ষির গল্প কি কবি এখান থেকে পেয়েছিলেন?

বললুম : না। এই গল্পের জন্মের ইতিহাস তিনি নিজেই লিখে রেখে গেছেন।

মনে আছে তোমার?

থাকবে না কেন! কবি রাজনারায়ণ বসুকে দেখতে দেওঘরে যাচ্ছিলেন, রাতে ঘুম হবে না জেনে একটা গল্পের প্লট ভাবছিলেন। স্বপ্নে একটা পাথরের মন্দির দেখলেন। 'ছোট মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পূজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা! বাপকে সে বার বার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন! বাপ কোন মতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল।' কবি জেগে উঠেই বললেন, গল্প পাওয়া গেল।

স্বাতি বলল : এ গল্প তুমি কোথা থেকে বললে?

বললুম : 'রাজর্ষি'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন। আর তাঁর জীবন-স্মৃতিতেও এই স্বপ্নের বিবরণ আছে। 'আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ।' বিসর্জন নাটকে এই হিংসার কথা তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন।—

'পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর! কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!

এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির-আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতি পদে চরণে দলিত শত কীট
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে।
অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন,......'

এইবারে নির্দেশ এল, কোমরে বেল্ট বাঁধতে হবে, প্লেন আকাশে উড়বে।

আমরা তার দরকার বোধ করি না, তবু নিয়ম রক্ষার জন্য তা আলতো ভাবে কোমরে জড়িয়ে নিলুম। প্লেনের ইঞ্জিন অনেকক্ষণ আগেই চালু করা হয়েছিল। রান-ওয়ের এক প্রান্ত থেকে বিদ্যুৎ বেগে যাত্রা করে প্লেন আকাশে উঠে যাবে। নিচে থেকে উপরে,

আরও উপরে, তখন আর নিচের পৃথিবী দেখা যাবে না। অনন্ত আকাশ পথে আগরতলা থেকে কলকাতার দীর্ঘ পথ কয়েক মিনিটে পাড়ি দিয়ে ঝপ করে আবার মাটিতে নামবে। মনটাকে সংহত করে মাটি ছেড়ে ওড়ার মুহূর্তটি আমি অনুভব করলুম।

স্বাতি বলল : অমন আড়ষ্ট হয়ে আছ কেন ?

বললুম : রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছে।—

'আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর
উড়িবার ইতিহাস।
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস॥'

প্লেন মাটি ছেড়ে গাছপালা ছাড়িয়ে মেঘের সমুদ্র পেরিয়ে অনন্ত শূন্যে পৌঁছে স্থির হয়ে গেল। মনে হল, আমরা যেন আর চলছি না। স্থির পৃথিবীটা দেখতে না পেলে চলার কথা আমরা ভুলে যাই। স্বাতি বলল : কবি তোমার মনের কথাও লিখে রেখে গেছেন।

সে কথা শোনবার জন্যে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। স্বাতি বলল :

'পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়॥'

আর—

বল।

'আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য ;
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি করেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে

নূতন চোখে

চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।'

হঠাৎ এ কথা তোমার মনে এল কেন?

বললুম: 'কল্পনা করছি---

অনাগত যুগ থেকে

তীর্থযাত্রী আমি

ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।'

স্বাতি বলল: সত্যিই তাই। তোমার থামলে চলবে না, তোমাকে চলতেই হবে।

হেসে বললুম: এ তো আমাদের পুরনো কথা।—

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।

শেতে নিপদ্যমানস্য চরতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি॥

বসে থাকলে ভাগ্য বসে রয়,

ছুটে চল আনন্দের রথে।

সুখ শয্যায় ভাগ্য বাঁধা নয়,

ভাগ্য আছে চলার পথে পথে॥

**প্রাচী পর্ব সমাপ্ত**

## রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণকাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণকাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্য লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র-পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ-সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্য স্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত-দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা আঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার

অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

**প্রথম গ্রন্থ অন্ধ্র পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াডা ও মঙ্গল-গিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

**তামিল পর্বে** তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিনপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরু-চেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কেরল পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি। যমজ শহর এর্ণাকুলম কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটে সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

**কর্ণাট পর্ব** শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে কর্ণাটক রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির অপ্রগলভ-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমের পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ কোঙ্কণ পর্বেও তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক,

সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে অবন্তী পর্বে।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহু। উৎকল পর্বে পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল শুভার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। মগধ পর্বে শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা এবং সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর কোশল পর্বে বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশা বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস্ বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। এক দিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর স্নায়া বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীর পর্বে এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও অহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্পপরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে গৌড় পর্বের যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাঙলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র, নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে: ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব…

এর পরে হিমালয় পর্ব। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভুটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদ্রীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

কিন্তু রম্যাণি বীক্ষ্যের শেষ হয় নি। অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের পর যেমন খিলপর্ব হরিবংশ, তেমনি রম্যাণি বীক্ষ্যর ঊনবিংশ পর্ব মরুভারত। ভারতবর্ষের বিখ্যাত থর মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল—বিকানের থেকে যোধপুর ও জয়সলমের, তারপর আরব সাগরের তীরে মরুরাজ্য কচ্ছ। উদ্বাস্তু সিন্ধীরা সেখানে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। মরুভারত পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীর কথা নয়, কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

ভারতের পূর্ব প্রান্তের পরিচয় পাওয়া যাবে প্রাচী পর্বে। এক সময়ের অনাদৃত ও স্বল্প-পরিচিত রাজ্যগুলি দেখবার জন্য স্বাতি ও গোপাল এল আসামের গৌহাটি শহরে। অরুণাচল রাজ্যের সংবাদ আহরণ করে এগিয়ে গেল নাগাল্যাণ্ডে—ডিমাপুর থেকে কোহিমায়। সেখান থেকে মণিপুর রাজ্যের ইম্ফল ও মৈরাঙে, কাছাড়ের শিলচর থেকে মিজোরাম রাজ্যের আইজলে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর আগরতলা ও উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরীর দর্শন করে ঘরে ফেরা। এই সব রমণীয় রাজ্যের শুধু বর্ণনা নয়, রাজ্যবাসীদেরও শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার কথা পাওয়া যাবে এই পর্বে।

তারপর?

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক